।। শ্রীহরিঃ ।।

275

মানুষ কর্মে স্বাধীন, নাকি পরাধীন ?

कल्याणप्राप्तिके उपाय (बँगला)

गीताप्रेस गोरखपुर

GITA PRESS, GORAKHPUR [SINCE 1923]

জয়দয়াল গোয়েন্দকা

॥শ্রীহরিঃ॥

মানুষ কর্মে স্বাধীন, নাকি পরাধীন ?

কল্যাণপ্রাপ্তিকে উপায় (বঁগলা)

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব॥

জয়দয়াল গোয়েন্দকা

॥ শ্রীহরিঃ ॥

সম্পাদকের নিবেদন

যথার্থ-সুখ থেকে বিমুখকারী জড়বাদের এই উন্নয়নশীল যুগে, যেখানে ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় চিন্তা-ভাবনার আলোচনা এবং অঙ্গীকার করাকে ব্যর্থ মনে করার দুঃসাহস করা হয়, যেখানে পরলোককে কল্পনা-প্রসূত ভাবা হয়, জ্ঞান বৈরাগ্য-ভর্তিপূর্ণ উপাখ্যানকে অনাবশ্যক এবং দেশ ও জাতির উন্নতিতে অন্তরায় মনে করা হয়, ভৌতিক উন্নতিকেই যেখানে মনুষ্য-জীবনের পরম ধ্যেয় বলে মেনে নেওয়া হয় এবং যেখানে ইন্দ্রিয়-সুখকেই পরম সুখ মনে করা হয় এবং যেক্ষেত্রে প্রায় সমগ্র সাহিত্য ভৌতিক উন্নতির পথ নির্দেশক গ্রন্থে, আমোদ-প্রমোদ জনিত উপন্যাস-গল্প এবং কুরুচি সৃষ্টিকারী রোমান্টিক কবিতা প্রভৃতির বন্যায় প্রবাহিত, সেক্ষেত্রে ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং নিষ্কাম কর্মযোগ সম্বন্ধীয় পুস্তক দ্বারা সকলের তৃপ্তি প্রদান করা খুবই কঠিন ; তবুও গত তিন বছরের অভিজ্ঞতায় আমার এই ধারণা হয়েছে যে নাস্তিকতার এই প্রবল ঝড়েও ঋষি-মুনি-সেবিত পুণ্যভূমি ভারতের সুদৃঢ় মূল আধ্যাত্মিক সঘন ছায়াযুক্ত তরুবরের শিকড় এখনও নড়েনি এবং তা নড়ানো খুবই কঠিন বলে মনে হয়। এই সময়েও ভারতের আধ্যাত্মিক জগতে প্রকৃত জিজ্ঞাসু এবং সাধু-স্বভাবের মুমুক্ষু পুরুষের অস্তিত্ব রয়েছে, অবশ্য তাঁদের সংখ্যা কমে এসেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ আশা করা খুবই যুক্তিযুক্ত যে, সরল ভাষায় লিখিত এই তাত্ত্বিক পুস্তক লোকে সাদরে গ্রহণ করবেন এবং এ থেকে লাভবান হবেন।

আমার দৃষ্টিতে এই গ্রন্থের রচয়িতার স্থান খুবই উঁচু। আধ্যাত্মিক জগতে এইরূপ পুরুষ খুবই কম হয়ে থাকেন। দেবর্ষি নারদ বলেছেন যে—

মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ।

মহাপুরুষের সঙ্গ দুর্লভ, অগম্য এবং অমোঘ। অর্থাৎ 'সত্যিকারের মহাপুরুষ সহজে পাওয়া যায় না, দেখা পেলেও তাঁদের চেনা যায় না, তবুও

তাঁদের সঙ্গ কখনও বৃথা হয় না।' এই কথনানুসারে আমার ধারণা এই যে, লোকে ইঁনাকে (এই গ্রন্থের রচয়িতাকে) ঠিকভাবে চিনতে বা বুঝতে পারেননি। বাস্তবিকপক্ষে চিনতে পারা খুব কঠিনও বটে। একজন সাদাসিধে মানুষ, কথাবার্তায় যাকে অশিক্ষিতের ন্যায় মনে হয় এবং যিনি গৃহস্থ-ধর্মে থেকে ব্যবসায় কর্মে নিযুক্ত রয়েছেন তাঁকে চিহ্নিত করা খুবই কঠিন। আমি দেখেছি যে, নিজেকে শিক্ষিত মনে করে এমন লোকজন যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন কিংবা তাঁর প্রবচন শুনতেন তখন প্রারম্ভেই ইঁনার হিন্দি ভাষা এবং শব্দের উচ্চারণ শুনে ভাবতেন এখানে বিশেষ কিছু নেই। কখনও কখনও লোকেরা বিরক্ত হয়ে উঠে পড়তেন, কিন্তু যারা ধৈর্য ধরে কিছুক্ষণ তাঁর কথা শ্রবণ করতেন তাঁরা তাঁর তাত্ত্বিক বিবেচন শুনে চকিত হতেন। লোকের যাতে এদিকে রুচি জন্মায় তাই তিনি খুবই উৎসাহের সঙ্গে **'কল্যাণ'** মাসিক পত্রিকায় প্রকাশার্থে কৃপাপূর্বক নিবন্ধ লিখিয়ে দিতেন। শুদ্ধ হিন্দির বদলে মারওয়াড়ী মিশ্রিত হিন্দিতে আপনার প্রবন্ধগুলি লেখা হত। আমি যথাসাধ্য ভাব অপরিবর্তিত রেখে লেখাগুলির ভাষা সংশোধন করতাম। এই গ্রন্থে প্রকাশিত লেখাতেও সেরূপ করা হয়েছে। যদিও আমি আপনার নিবন্ধের ভাব রক্ষার জন্য পুরোপুরি চেষ্টা করেছি তবুও নিশ্চয় করে বলতে পারি না যে সবক্ষেত্রেই ভাবের রক্ষা করতে পেরেছি! কেননা কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ ভাবের সম্মুখীন হয়েছি যে, তা ঠিকভাবে বুঝে উঠতে আমার অনেক সময় লেগেছে। কাজেই এই অবস্থায় যদি কোনও ক্ষেত্রে ভাবের যৎকিঞ্চৎ পরিবর্তন হয়ে থাকে তাহলেও এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এমন একজন সৎপুরুষের সঙ্গলাভ এবং তাঁর প্রবন্ধের সম্পাদন করার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি।

গ্রন্থকার সম্বন্ধে আমি যা কিছু লিখেছি, তা শুধুই আমার তুচ্ছ ধারণা ; অমি কাউকে এরূপ বলছি না যে আপনারা আমার কথা অনুযায়ী এরূপ স্বীকার করুন, গ্রন্থকারও তা চান না। আমি যা কিছু নিবেদন করেছি গ্রন্থকারকে জিজ্ঞেস না করেই লিখেছি, যদি তাঁর অনুমতি নেওয়া হত তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস

তিনি কিছুতেই এরূপ লেখার অনুমতি দিতেন না।

সবশেষে পাঠকবর্গের কাছে আমার একান্ত নিবেদন যে, তাঁরা যেন এই গ্রন্থটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন এবং নিজেদের পক্ষে যেটি মূল্যবান মনে করেন তা যেন অবশ্যই গ্রহণ করেন।

বিনীত

হনুমানপ্রসাদ পোদ্দার

(কল্যাণ-সম্পাদক)

গোরক্ষপুর
বিজয়া দশমী
বিক্রম সম্বৎ ১৯৮৬

॥ শ্রীহরিঃ ॥

নিবেদন

শ্রীজয়দয়াল গোয়েন্দকা মহাশয়ের আধ্যাত্মিক নিবন্ধ সমূহের সংগ্রহ 'কল্যাণ প্রাপ্তির উপায়' পুস্তকের বাংলা প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হল। এটি হিন্দী তত্ত্ব চিন্তামণি-র (প্রথম ভাগ) বাংলা অনুবাদ। তত্ত্ব-চিন্তামণি গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, যা এই সুন্দর গ্রন্থের উপযোগিতার পরিচায়ক। যাঁরা এই গ্রন্থ সংগ্রহ করে আমাদের উৎসাহিত করেছেন আমরা তাদের নিকট কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থের উপর অনেক সাধু-মাহাত্মা, অনুভবী-বিদ্বান, বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সম্পাদক এবং পাঠকবর্গের সম্মতি প্রাপ্ত হয়েছে, এর দ্বারা এই অমূল্য গ্রন্থের উপযোগিতা প্রমাণিত হয়।

পূর্বে 'কল্যাণ প্রাপ্তির উপায়' নামে প্রকাশিত বইটি বর্তমানে **'মানুষ কর্মে স্বাধীন, নাকি পরাধীন ?'** নামে প্রকাশিত হল। যান্ত্রিক কারণে পুনর্লিখিত করে নতুনভাবে এটি উপস্থাপিত করেছেন শ্রীমতী গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়।

আশাকরি এই অমূল্য গ্রন্থ-রত্ন আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসুদের পিপাসা দূর করতে সমর্থ হবে।

বিনীত

প্রকাশক

॥ শ্রীহরিঃ ॥

বিনয়

এই পুস্তকটি কয়েকটি নিবন্ধের সংকলন। এই প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে **'কল্যাণ'** পত্রিকার জন্য লেখা হয়েছিল এবং গত তিন বছরে তা কল্যাণ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বড় বড় বিদ্বান এবং মহাত্মাদের সামনে পরমার্থিক বিষয়ে আমার কিছু লেখা বাস্তবিক পক্ষে ভাল দেখায় না, এরূপ বিষয়ে লিখতে গিয়ে তাঁরাও দ্বিধাগ্রস্ত হন আর আমি তো একজন সাধারণ মানুষ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং ভগবানের নামের প্রভাবে আমি যৎকিঞ্চিৎ জানতে পেরেছি, তাঁরই যৎসামান্য ভাব এই সকল প্রবন্ধে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই পুস্তকের দ্বারা যদি কোন পাঠকের হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও ভগবদ্-ভক্তির ভাবনা জাগে এবং মনের গম্ভীর প্রশ্ন-সমূহের মধ্যে দু-একটিরও উত্তর পাওয়া যায় তাহলে তা খুবই আনন্দের কথা!

আমি বিদ্বান নই এবং নিজেকে উপদেশ-আদেশ এবং শিক্ষা প্রদানের অধিকারী বলেও মনে করি না। আমি তো শুধুমাত্র নিজের মনের বিনোদনের জন্য যৎকিঞ্চিৎ সময় ভগবানের চর্চায় লাগাবার প্রয়াস করেছি মাত্র। অন্তর্যামীর প্রেরণায় যা কিছু লেখা হয়েছে তা তাঁরই বস্তু, আমার এতে কোন অধিকারই নেই।

এই গ্রন্থের প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমি বলছি না যে তা সকলেরই স্বীকার করে নেওয়া উচিত কিংবা এর বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। আমি শুধুমাত্র আমার হৃদয়ের সেই ভাবের যৎসামান্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি, যাতে আমার মনে কোন ভ্রান্তি নেই। সকল পাঠকবর্গের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন, তাঁরা যেন দয়া করে এই নিবন্ধগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করে এবং এর ভুল-ত্রুটিগুলি আমাকে জানানোর অনুগ্রহ করেন।

বিনীত

জয়দয়াল গোয়েন্দকা

॥ শ্রীহরিঃ ॥

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

॥ শ্রীহরিঃ ॥

(১) মানুষ কর্মে স্বাধীন, নাকি পরাধীন ?

কেউ কেউ বলেন সংসারে কর্মই প্রধান, 'যে যেমন কর্ম করে তার তেমনই ফল লাভ হয়', অন্যেরা বলেন 'ঈশ্বরই সকলকে বাঁদরের মতো নাচান'। এই দুটি মতে স্পষ্টতই পরস্পর বিরোধিতা দেখা যায়। কর্মই যদি প্রধান হয় এবং মানুষ কর্ম করতে সর্বতোভাবে স্বাধীন হয়, তাহলে ঈশ্বরের বাজীগরের মতো জীবকে নৃত্য করানো প্রমাণিত হয় না এবং ঈশ্বরেরও কোনো গুরুত্ব থাকে না। অপরদিকে ঈশ্বরই যদি সব করান, মানুষ কর্ম করাতে সর্বতোভাবে পরাধীন হয়ে থাকে তাহলে কারো দ্বারা করানো, খারাপ কর্মের ফল সে কেন ভোগ করবে ? যে ঈশ্বর কর্ম করিয়েছেন, ফলভোগের ভাগী তো তিনিই হবেন, কিন্তু তা হয় না। এরূপ প্রশ্ন প্রায়ই উঠে থাকে। তাই এই নিয়ে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে।

আমার মনে হয় জীব প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ও প্রকৃতির অধীন। অন্ততঃ ফলভোগের জন্য তো সর্বতোভাবে পরাধীন। স্ত্রী-পুত্র-অর্থ-কীর্তি ইত্যাদি সংযোগ-বিয়োগ কর্মফলবশতঃ বাধ্য হয়ে ভোগ করতে হয়, এতে কোন সন্দেহ নেই। নতুন কর্ম করাতেও সে পরাধীন, কিন্তু কিছু কিছু অংশে স্বাধীন ; অথবা বলা যায় যে, সুযোগ পেয়ে সে অনধিকার স্বাধীন আচরণ করে থাকে, আর তারজন্যই তাকে সাজা ভোগ করতে হয়।

বাঁদর বাজীগরের অধীন, তার গলায় দড়ি বাঁধা থাকে, মালিকের ইচ্ছামতো আচরণ করা তার কর্তব্য, সে যদি মালিকের ইচ্ছার বিপরীত আচরণ না করে, তাহলে মালিক প্রসন্ন হয়ে ভালো খাবার দেয় এবং খুব ভালোবাসে। যদি কখনও সে প্রভুর ইচ্ছানুযায়ী না চলে—প্রতিকুল ব্যবহার করে, মালিক তখন তাকে মারে, সাজা দেয়। এই সাজা দেওয়ার উদ্দেশ হল যাতে সে প্রভুর আজ্ঞাবহ হয়ে ওঠে। বাজীগর বাঁদরকে মারলেও তার অনিষ্ট কামনা করে না। কারণ সেই অবস্থাতেও সে তাকে খেতে দেয়, পালন-পোষণ করে।

মাতা-পিতার ব্যবহারও সন্তানের প্রতি এমনিই হয়ে থাকে। যদিও বাজীগরের থেকে মাতা-পিতার ব্যবহার উচ্চ শ্রেণীর হয়ে থাকে। বাজীগরের এই যে আচরণ অর্থাৎ তাকে ভুলের সাজা দিয়েও পোষণ করা—তা শুধু স্বার্থের জন্য হয়ে থাকে। মাতা-পিতা নিজ স্বার্থের অতিরিক্ত সন্তানের হিতের কথাও ভাবেন। কারণ সন্তান তাঁদের আত্মা। আর পরমাত্মার স্থান এই দুইয়ের থেকে অনেক ওপরে ; কারণ তিনি অহৈতুক প্রেমী এবং সর্বতোভাবে স্বার্থশূন্য। তিনি যা করেন, সে সবই আমাদের হিতের জন্য করেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা সর্বভাবে তাঁর অধীন, তা সত্ত্বেও তিনি দয়া পরবশ হয়ে আমাদের ইচ্ছানুযায়ী স্বাধীনভাবে সৎকর্ম করার অধিকার দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশানুসারে কর্ম করাই হল আমাদের সেই অধিকার। আমরা যদি তার ব্যতিক্রম করি, তবে পরম পিতা আমাদের হিতের ভাবনায় সেই দোষ দূর করার জন্য কুপথ থেকে সুপথে আনার জন্য দণ্ড দিয়ে থাকেন। তাঁর দণ্ডবিধান কখনও ভীষণ মনে হলেও তা দয়া ও প্রেমে ভরপুর থাকে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ ঈশ্বর মানুষকে তার অধিকার অতিক্রম করতে দেন কেন ? তিনি তো সর্ব-সমর্থ, কয়েক ক্ষণেই অঘটন ঘটাতে পারেন, তাহলে তিনি মানুষকে তার অধিকার বহির্ভূত দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হতে দেন কেন ? এর উত্তর এই দৃষ্টান্ত থেকে জানতে চেষ্টা করুন।

সরকার কোনো ব্যক্তিকে আত্মরক্ষার জন্য বন্দুক রাখার লাইসেন্স দিয়েছে, বন্দুক তাঁর অধিকারে থাকে, তিনি ইচ্ছামতো তা ব্যবহার করতে পারেন। আইন তাঁকে তাঁর মর্যাদার মধ্যেই ব্যবহার করার অধিকার দিয়েছে, চুরি-ডাকাতি-খুন করা বা বে-আইনি কোনো অন্যায় কাজে সেই বন্দুক ব্যবহারের জন্য নয়। তা করলে তাঁর সেই কাজ অন্যায় ও নিয়মবিরুদ্ধ হয়, তাহলে তাঁর লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হয় এবং উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়। অথবা মনে করুন কোনো রাজ্যে কোনো ব্যক্তিকে রাজা অধিকার দিয়েছেন যে তিনি রাজার হয়ে প্রজার সেবা করে রাজ্যের সব কাজ নিয়মানুসারে সুচারুভাবে সম্পন্ন করবেন। তিনি যদি সুচারুভাবে সেই কাজ করেন, তাহলে রাজা প্রসন্ন হয়ে পুরস্কার দিতে পারেন, পদোন্নতি করে দিতে পারেন এবং

ক্রমশঃ শেষে রাজ্যের সম্পূর্ণ অধিকারীও হতে পারেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি নিজ অধিকারের অপব্যবহার করেন, আইন-বিরুদ্ধ কর্ম করেন, তবে তাঁর অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় ও তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়। এসব হলেও বন্দুকের বা নিজ অধিকারের অপব্যবহার করলেও সরকার বা রাজা তাঁকে বাধা দিতে আসেন না। কার্য করা হয়ে গেলে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়। তেমনই পরমাত্মাও আমাদের সৎকর্ম করার অধিকার দিয়ে রেখেছেন, আমরা দুষ্কর্ম করলেও তিনি বাধা দেন না, কাজ করা হলে তিনি তার যথোচিত শাস্তি বিধান করেন।

এখানে পুনরায় প্রশ্ন আসে যে দেশের সরকার বা রাজা সর্বজ্ঞ বা সর্বব্যাপী না হওয়ায় আইন ভঙ্গ করে অধিকারের অপব্যবহারকারীদের বাধা দিতে পারেন না, কিন্তু পরমাত্মা তো সর্বজ্ঞ, ন্যায়কারী, সর্বান্তর্যামী, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, তাঁর কাছে তো কায়-মনো-বাক্যের কোনো ক্রিয়াই লুক্কায়িত নয়। তিনি দুষ্কর্মকারী মানুষের হাত সবলে ধরে কেন তাকে বাধা দেন না ? এর উত্তর হল যে, পরমাত্মার নিয়ম সেরকম নয়, তিনি মানুষকে স্বাধীনভাবে তার জীবন-কালে কাজ করার অধিকার দিয়েছেন। ভগবান সেই সঙ্গে তাঁকে শুভ-অশুভ যাচাই করার বুদ্ধি ও বিবেকও দিয়েছেন, যাতে সেই ব্যক্তি ভালো-মন্দ বিচার করে নিজ কর্তব্য স্থির করতে পারেন এবং এও জানিয়ে দিয়েছেন যে যদি কোনো ব্যক্তি অনধিকার বা শাস্ত্রবিপরীত কার্য করেন, তাহলে তাঁকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বাজীগরের বাঁদরের মতো ঈশ্বর সবাইকে চালিত করেন, সকলেই তাঁর অধীন, কিন্তু ভুল করলে বাঁদর যেমন শাস্তি পায়, তেমনই ঈশ্বরের নির্দেশ যাঁরা মানেন না তাঁদের শাস্তি ভোগ করতে হয়। ভগবান অবশ্যই পরিচালনা করে থাকেন, কিন্তু কাজের সময় প্রভুর ইচ্ছানুযায়ী বা তার বিপরীত ভাবে চলা বাঁদরের অধীকারে থাকে। সরকার বা রাজা অধিকার দিয়েছেন, কিন্তু তার অপব্যবহার করার নির্দেশ তিনি দেননি। ভগবানও মানবজীবন প্রদান করে সৎকর্মের দ্বারা উন্নত হয়ে ক্রমশঃ পরমপদ লাভ করার অধিকার আমাদের প্রদান করেছেন, পাপকাজ করার নির্দেশ তিনি দেননি। একজন ন্যায়পরায়ণ সাধারণ রাজাও

যখন তাঁর আধিকারিককে কোনো দুষ্কার্য করার নির্দেশ দেন না, তখন ভগবান কি এমন কাজ করার নির্দেশ দিতে পারেন ? সুতরাং একথা ঠিক যে মানুষ সর্বতোভাবে ঈশ্বরের অধীন। সঙ্গে এও সত্য যে মানুষ ঈশ্বরপ্রদত্ত অধিকারের সঠিক ব্যবহার করে পরম উন্নতি সাধন করতে পারেন আবার অপব্যবহার করে অধোগতিও প্রাপ্ত করতে পারেন।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে, 'ভগবানের নির্দেশ না থাকা এবং পরিণামে দুঃখের সম্ভাবনা থাকলেও মানুষ ভগবৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাপকাজ করেন কেন ? কী কারণে তাঁরা জেনে-বুঝে পাপে প্রবৃত্ত হন ?' এই প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করলে প্রতীত হয় যে পাপে প্রবৃত্তির কারণ হল অজ্ঞতা। অজ্ঞানে আবৃত হয়েই মানুষ মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে— **'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।'** (গীতা ৫।১৫)।

প্রকৃতির স্বরূপ দুই প্রকার,—বিদ্যাত্মক ও অবিদ্যাত্মক। এই দুটির মধ্যে অবিদ্যাত্মক প্রকৃতির স্বরূপ অজ্ঞান। এই অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন অহঙ্কার, আসক্তি ইত্যাদি দোষের বশ হয়ে মানুষ পাপে প্রবৃত্ত হয়। জগতে অবিদ্যা ইত্যাদি পাঁচ ক্লেশ মহর্ষি পাতঞ্জলিও মেনে নিয়েছেন—

'অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ।' (যোগদর্শন, সাধনপাদ ৩)

'অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ—এই পাঁচটিকে ক্লেশ বলা হয়।' এর মধ্যে পরের চারটি ক্লেশের উৎপত্তি হয় অবিদ্যা থেকেই। জগতের সর্বপ্রকার ক্লেশের কারণই হল এই পাঁচটি। এই অজ্ঞানজনিত পঞ্চ ক্লেশেই মানুষ ভবিষ্যত পরিণাম ভুলে পাপাচরণ করে থাকেন।

এই পাঁচটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হল—'অবিদ্যা' যার দ্বারা অনিত্যতে নিত্য-বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি বুদ্ধি, দুঃখে সুখ বৃদ্ধি, অনাত্মতে আত্ম-বুদ্ধিরূপ বিপরীত জ্ঞান হওয়া। 'অস্মিতা' হল অহঙ্কার বা 'আমি' ভাবকে বলা হয়, যা সমস্ত বন্ধনের কারণ। 'রাগ' হল আসক্তির নাম, এর জন্য মানুষ পাপকাজ করে। মনের বিরুদ্ধ কার্য হলে অন্তরে যে ভাবের প্রতিফলন হয় তার নাম 'দ্বেষ'। রাগ-দ্বেষরূপ বীজ থেকেই মহা-অনর্থকারী বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। মৃত্যুভয়কে বলা হয় 'অভিনিবেশ'।

অর্জুনও ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ।।

(গীতা ৩।৩৬)

'হে শ্রীকৃষ্ণ ! এই পুরুষ তাহলে না চাইতেও বলপূর্বক নিয়োজিতের মতো কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে পাপাচরণ করেন ?' এর উত্তরে ভগবান বলেছেন যে, হে অর্জুন !

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।।

(গীতা ৩।৩৭)

'রজোগুণ থেকে উৎপন্ন এই কামই ক্রোধ, এটিই মহা অশন অর্থাৎ অগ্নির ন্যায় কখনও ভোগে তৃপ্ত হয় না এবং অত্যন্ত পাপী, এই বিষয়ে একেই তুমি শত্রু বলে জেনো।' এই কামরূপ বৈরী (শত্রু) ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতে বাস করে। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়দ্বারাই জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে এটি জীবাত্মাকে মোহগ্রস্ত করে রাখে। তাই মনকে বশ করে এই জ্ঞান-বিজ্ঞান নাশকারী পাপী কামকে বিনাশ করতে হয়। কারণ দুষ্কর্ম অজ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত আসক্তি বা কামনা থেকে হয়। যিনি এর বশীভূত না হয়ে ভগবান প্রদত্ত অধিকার অনুযায়ী আচরণ করেন, তিনি এখানে সর্বতোভাবে সুখী থেকে অন্তকালে পরম সুখরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করেন।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মানুষ কর্ম করাতে পরাধীন হলেও ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাধীনতার জন্য কিছু কিছু অংশে তিনি স্বাধীনও।

~~○~~

(২) কর্মের রহস্য

একজন সজ্জন ব্যক্তি প্রশ্ন করেন 'যখন একথা নিশ্চিত যে আমরা নিজেদের কর্মফলই ভোগ করি, কর্ম অনুসারেই যখন আমাদের সুবুদ্ধি ও

কুবুদ্ধি হয়, তখন আমরা কেন বলি যে মানুষ কিছু করতে পারে না, সব কিছু ঈশ্বরই করেন ! ঈশ্বর তো আমাদের কর্মফল কম করতেও পারেন না, বেশি করতেও পারেন না, তাহলে আমরা কেন ঈশ্বরকে ভজনা করব ?'

মানুষ যে তাঁর নিজ কর্মের ফলই ভোগ করেন এবং তাঁর বুদ্ধি প্রায়শঃ তাঁর কর্মানুসারেই হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। একথাও ঠিক যে কর্ম অনুসারে গঠিত স্বভাবের অনুকূল ঈশ্বরীয় প্রেরণাতেই মানুষ কর্ম করতে সক্ষম হয়ে থাকেন। ঈশ্বরীয় অস্তিত্ব, শক্তি, চেতনা, স্ফূর্তি ও প্রেরণা না থাকলে কোনো কর্ম করা অসম্ভব। এই বিবেচনায় সব কিছু ঈশ্বরই করেন। যুক্তিগ্রাহ্য, সিদ্ধান্ত হল যে '**কর্তুমকর্তুমন্যথাকর্তুম্**' সমর্থ হলেও ঈশ্বর কর্মফলের ন্যূনাধিক করে না। এত কিছু সত্ত্বেও ঈশ্বরকে ভজনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই বিষয়ে চিন্তা করার আগে 'কর্ম কী', 'কেমন ভাবে তার ভোগ হয়', 'কর্মফল ভোগ করায় মানুষ স্বাধীন না পরাধীন' ইত্যাদি বিষয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

শাস্ত্রকারগণ তিন প্রকার কর্মের কথা বলেছেন— (১) সঞ্চিত, (২) প্রারব্ধ, এবং (৩) ক্রিয়মাণ। এখন এই নিয়ে পৃথকভাবে বিচার করুন—

সঞ্চিত

সঞ্চিত কর্ম তাকেই বলা হয় যা অনেক জন্ম আগে থেকে এখন পর্যন্ত সংগৃহীত করা হয়েছে। কায়-মনো-বাক্যে মানুষ যেসব কর্ম করে, তা ততক্ষণ অর্থাৎ কর্ম করাকালীন ক্রিয়ারূপে থাকে এবং শেষ হওয়ামাত্র তখনই তা সঞ্চিত হয়ে যায়। যেমন কোনো এক কৃষক বহুদিন ধরে চাষ করছেন, খেতে যে আনাজ উৎপন্ন হয় তা তিনি একটি কুঠুরিতে জমা করতে থাকেন। এই ভাবে বহু বছর ধরে নানা প্রকার শস্য, তাঁর কুঠুরিতে ভর্তি হয়ে থাকে, খেতে ফসল হলেই সেই নতুন শস্য তাঁর কুঠুরিতে আসতে থাকে। এক্ষেত্রে চাষ করা হল কর্ম করা আর শস্য-আনাজপূর্ণ কুঠুরি হল তাঁর সঞ্চিত ভাণ্ডার। তেমনই কর্ম করা হল ক্রিয়মাণ আর সেটি পূর্ণ হতেই হৃদয়রূপ বৃহৎ ভাণ্ডারে তা জমা হওয়া হল সঞ্চিত হওয়া। মানুষের এই অপার সঞ্চিত কর্ম রাশি থেকে, পাপ-পুণ্যের মধ্যে থেকে কিছু অংশ নিয়ে শরীর গঠিত হয় এবং ভোগদ্বারা বিনাশ হওয়া কর্মের অংশের অর্থাৎ সঞ্চিত থেকে ফলরূপে ভোগ করার জন্য যে অংশ

তার নাম হল প্রারব্ধ কিংবা ভাগ্য। এইভাবে যতক্ষণ সঞ্চিত অংশ অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ প্রারব্ধ বজায় থাকে। যতক্ষণ এই বহু জন্মার্জিত সঞ্চিত কর্মনাশ না হয়, ততক্ষণ জীবের মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। সঞ্চিত থেকে স্ফুরণ, স্ফুরণ থেকে ক্রিয়মাণ, ক্রিয়মাণ থেকে পুনরায় সঞ্চিত এবং সঞ্চিতের অংশ থেকে প্রারব্ধ। জীব এইভাবে কর্মপ্রবাহে নিরন্তর আবর্তিত হয়। সঞ্চিত অনুসারেই বুদ্ধি-বৃত্তি হয় অর্থাৎ সঞ্চিতের জন্যই তাঁর হৃদয়ে অনুকূল কর্মের প্রেরণা হয়ে থাকে। সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক সমস্ত স্ফুরণ বা কর্মপ্রেরণার প্রধান কারণ হল 'সঞ্চিত'। একথা অবশ্যই জেনে রাখা উচিত যে সঞ্চিত কেবলমাত্র প্রেরণা দেয়, সেই অনুযায়ী কর্ম করতে বাধ্য করে না। কর্ম করার জন্য বর্তমান সময়ের কর্মই প্রধান কারণ, যাকে পুরুষার্থ বলা হয়। পুরুষার্থ যদি সঞ্চিতের অনুকূল হয়, তবে তা সঞ্চিত দ্বারা উৎপন্ন কর্মপ্রেরণার সহায়ক হয়ে এমনই কর্ম করায়, প্রতিকূল হলে সেই প্রেরণাকে বাধা দেয়। যেমন কারো অন্তরে খারাপ সঞ্চিতের জন্য চুরি করার ইচ্ছা জাগে, অন্যের অর্থের ওপর লোভ হয় কিন্তু ভালো সৎসঙ্গ, চিন্তা ও সুপরিবেশের প্রভাবে তাঁর সেই ইচ্ছা দমিত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। এইরূপ শুভ সঞ্চিতের জন্য দান করার ইচ্ছা হয়, কিন্তু বর্তমান কুসঙ্গীদের কুপরামর্শে তা দমিত হয়ে যায়। অর্থাৎ কর্ম করায় বর্তমান পুরুষার্থই হল প্রধান কারণ। এই সময়ের (বতর্মানের) সুসঙ্গ এবং সুবিচারজনিত কর্মের নবীন শুভ সঞ্চিত হয়ে পুরাতন সঞ্চিতকে দমিয়ে রাখে যার জন্য পুরাতন সঞ্চিত অনুযায়ী ইচ্ছা অত্যন্ত কম হয়ে থাকে।

কৃষকের কুঠুরীতে বহু বছরের আনাজ ভর্তি আছে, কৃষক এবার নতুন চাষের ফসলও তাতে রেখে দিয়েছেন, এখন শস্য বার করতে গেলে সর্বাগ্রে যা পরে রাখা হয়েছে সেই নতুন ফসলই বার করতে হবে, কারণ সেগুলি সবার আগে রয়েছে। তেমনই সঞ্চিতের বিশাল রাশির মধ্যে সর্বাগ্রে মনে সেই অনুযায়ী স্ফুরণ হবে, যা সদ্য সদ্য সঞ্চিত হয়েছে। মানুষের মনে নানা চিন্তা ভরে আছে, কিন্তু তাঁর স্মৃতিতে সেই চিন্তাই বেশি আছে, যা বর্তমানে বিশেষ ভাবে হয়েছে। এক ব্যক্তি সাধুসেবা করেন, কিন্তু কুসঙ্গে পড়ে তিনি নাটক দেখতে থাকেন, তাই তাঁর নাটকের দৃশ্যই মনে পড়তে থাকে। মানুষের

মনে যেরূপ স্ফুরণ হয়, যদি পুরুষার্থ তার বিপরীত না হয়, তাহলে তিনি প্রায়শঃ সেই অনুযায়ী কাজ করে থাকেন। কর্ম এইভাবেই নতুন করে সঞ্চিত হয়, তার থেকে আবার তেমনই স্ফুরণ হয়, পুনরায় সেই ভাবেই কর্ম করা হয়। নাটক দেখলে তার স্মৃতি জাগে, আবার দেখার ইচ্ছা হয়, সঙ্গ অনুকূল থাকলে আবার দেখা হয় এইভাবে বারবার নাটক দেখা হয়। এইভাবে সেই ব্যক্তি সাধু সেবারূপ সৎকর্ম ছেড়ে ত্যাগ করে এবং ক্রমশঃ সেটির বিস্মরণ হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সৎসঙ্গ, সদুপদেশ, সদ্বিচার ইত্যাদির দ্বারা উৎপন্ন বর্তমান কর্মের দ্বারা পূর্বসঞ্চিতের ইচ্ছা দমিত হয়, তার জন্য বলা হয় যে মানুষ সঞ্চিতের সংগ্রহ, পরিবর্তন এবং তার ক্ষয় বৃদ্ধিতে প্রায়শঃ স্বাধীন।

অন্তঃকরণে কিছু স্ফুরণ প্রারব্ধ (ভাগ্য) থেকেও হয়। যদিও তা নির্ণয় করা কঠিন যে কোন ইচ্ছা সঞ্চিতের আর কোনটি প্রারব্ধের ; কিন্তু সাধারণভাবে বুঝতে হবে যে, যে স্ফুরণ বা বাসনা নতুন পাপ-পুণ্য করার হেতুরূপ হয়, তার কারণ হল সঞ্চিত আর যা শুধু সুখ-দুঃখ ভোগ প্রদান করে, তা হল প্রারব্ধের (ভাগ্যের)। প্রারব্ধ থেকে হওয়া বাসনা থেকে সুখ-দুঃখের ভোগ মানসিকরূপে সূক্ষ্ম শরীরেরও হওয়া সম্ভব। স্থূল শরীরের দ্বারা ক্রিয়ার মাধ্যমেও তা হতে পারে। কিন্তু প্রারব্ধ থেকে উৎপন্ন বাসনা পরিবর্তনের স্বাধীনতা মানুষের নেই।

প্রারব্ধ

পূর্বে বলা হয়েছে যে পাপ-পুণ্যরূপ সঞ্চিতের কিছু অংশ থেকে এক জন্মের জন্য ভোগ করার উদ্দেশ্যে প্রারব্ধের (ভাগ্যের) সৃষ্টি হয়। এই ভোগ দুই ভাবে ভোগ করা যায় ; মানসিক বাসনা দ্বারা এবং স্থূল শরীরের ক্রিয়া দ্বারা। স্বপ্নে বা অন্য সময়ে চিত্তে যে নানাপ্রকার বৃত্তি তরঙ্গ জাগ্রত হয়, তার দ্বারা সুখ ও দুঃখের যে ভোগ হয়, তা হল মানসিক। এক ব্যবসায়ী আনাজ কিনে ভাবলেন যে এবার এই সব্জীতে এতো লাভ হয়েছে, এতে জমি কিনে বাড়ি তৈরি করব, লাভের জন্য কল্পনাও করা হল, মন আনন্দে পূর্ণ হল। পরক্ষণেই মনে হল যে যদি দাম কমে যায়, লোকসান হয়, তাহলে মহাজনের টাকা ফেরত দেবার জন্য ঘর-দোর বিক্রী করতে হবে, মনে চিন্তা আসে,

চোখে-মুখে বিষণ্ণ ভাব ছেয়ে যায়। চিত্তে এভাবে নানাপ্রকার সুখ-দুঃখ উৎপন্নকারী তরঙ্গ ওঠাপড়া করে। ওপরে সব কিছু ঠিক-ঠাক থাকলেও, দুঃখের কারণ দেখা না গেলেও, মানসিক চিন্তার জন্য মানুষকে অত্যন্ত দুঃখী দেখায়, লোকে তাঁর ক্লিষ্ট চোহারা দেখে আশ্চর্য হয়ে ওঠেন। এইরূপ সবরকম বাহ্যিক অভাবে দুঃখের বহু কারণ থাকলেও মানসিক প্রসন্নতায় মানুষ সুখী হয়ে থাকেন। পুত্রশোকে কাতর ব্যক্তির মুখেও চিত্ত-বৃত্তির পরিবর্তন হলে ক্ষণকালের জন্য হাসির রেখা দেখা যায়। এ-ও একরূপ মানসিক ভোগ।

প্রারব্ধ ভোগের অন্য প্রকার হল সুখ-দুঃখরূপ ইষ্ট -অনিষ্ট পদার্থ প্রাপ্তি করা। সুখ-দুঃখরূপ প্রারব্ধ-ভোগ তিন প্রকারে হয়। তাকে বলা হয় অনিচ্ছা, পরেচ্ছা এবং স্বেচ্ছা-প্রারব্ধ।

অনিচ্ছা—রাস্তায় চলার সময় কোনো ব্যক্তির ওপর বাড়ি যদি ভেঙে পড়ে, বাজ পড়ে, গাছ ভেঙে পড়ে বা ঘরে বসে থাকলে ছাদ ভেঙে পড়ে, হঠাৎ বন্দুক থেকে গুলি এসে লাগে ইত্যাদি দুঃখরূপ, আর রাস্তায় চলার সময় হঠাৎ অর্থ পেয়ে যাওয়া, চাষ করার সময় জমি থেকে মূল্যবান কিছু পাওয়া ইত্যাদি সুখরূপ ভোগ, যা প্রাপ্ত করার জন্য মনে কোনো ইচ্ছা ছিল না, এইভাবে দৈবযোগে অনায়াসে প্রাপ্ত সুখ-দুঃখরূপ ভোগ প্রাপ্ত হওয়াকেই নিদ্রিত বলা হয় অনিচ্ছা-প্রারব্ধ।

পরেচ্ছা— নিদ্রিত মানুষের ঘরে চুরি বা ডাকাতি হওয়া, জেনে-শুনে কারো দ্বারা দুঃখ প্রাপ্তি প্রভৃতি হল দুঃখরূপ, আর কুপথে যেতে উদ্যত কাউকে কোনো সদ্‌পুরুষ দ্বারা বাধা দান করা, কুপথ্য করার সময় রোগীকে বৈদ্য বা বন্ধু দ্বারা বাধা দেওয়া, ইচ্ছা না থাকলেও কারো দ্বারা অর্থ লাভ হওয়া ইত্যাদি সুখরূপ ভোগ, যা অন্যের ইচ্ছায় প্রাপ্তি হয়, তাকে বলে পরেচ্ছা-প্রারব্ধ ভোগ। এতে আরও একটি জানার ও বোঝার বিষয় আছে। কোনো এক ব্যক্তিকে কেউ আঘাত করেছে বা কারো ঘরে কেউ চুরি করেছে, সেটা তো সেই ব্যক্তির প্রারব্ধ ভোগ, কিন্তু যে আঘাত করেছে বা যে চুরি করেছে, সেই ব্যক্তি অবশ্যই নতুন কাজ করেছে, যার ফল তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। কারণ কোনো কর্মের ভোগের কারণ আগে থেকে নিশ্চিত হয় না, যদি

হেতু নিশ্চিত হয় আর নিয়ম করা হয় যে অমুক ব্যক্তি অমুকের ঘরে চুরি করবে, অমুককে আঘাত করবে, তাহলে সেই ব্যক্তিকে নির্দোষ বলা হবে। কারণ সে তো ঈশ্বরের বিধানের বশবর্তী হয়েই এই সব কাজ করেছে। কথা যদি তেমনই হয়, তাহলে এইসব ব্যক্তির জন্য শাস্ত্রে দণ্ডবিধান এবং কর্মফল ভোগের ব্যবস্থা কেন থাকে ?

সেইজন্যই মেনে নিতে হয় যে ফলভোগ করার সমস্ত কারণই আগে থেকে নির্ধারিত থাকে না। যে ক্রিয়াতে কোনো অন্যায় বা স্বার্থ থাকে, যা আসক্তিবশতঃ করা হয়, সেই ক্রিয়া নতুন কর্ম। তবে, যদি ঈশ্বর বিশেষ ব্যক্তিকেই কারোকে মারার হেতু করতে চান, তাহলে সেই ফাঁসীর দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ফাঁসী দানকারী ন্যায়কর্মে নিযুক্ত জল্লাদের মতো কারোকে হেতু করতে পারেন। এমনও হতে পারে যে, এই ফাঁসী দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি আগের কোনো জন্মে ফাঁসীপ্রদানকারী ব্যক্তিকে বধ করেছিল অথবা এও হতে পারে যে এই ব্যক্তি শুধু ন্যায়সম্মত কর্তব্যই পালন করছে।

স্বেচ্ছা—ঋতুকালে ভার্যাগমন দ্বারা সুখপ্রাপ্ত হওয়া, তার থেকে পুত্র লাভ হওয়া বা না হওয়া অথবা হয়েই মৃত্যু হওয়া, ন্যায়যুক্ত ব্যবসায়ে কষ্ট স্বীকার করা, তার থেকে লাভ হওয়া বা না হওয়া বা হয়েও নষ্ট হয়ে যাওয়া, এসব হল স্বেচ্ছা-প্রারব্ধ। এইসব কর্ম করার জন্য যে প্রেরণাত্মক বাসনা হয়, তার কারণ হল প্রারব্ধ। তারপর ক্রিয়া হয়। ক্রিয়া সিদ্ধ হওয়া না হওয়া হল সুকৃত-দুষ্কৃতের ফল।

স্বেচ্ছা—প্রারব্ধের ভোগের কারণ বোঝা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। অতি সূক্ষ্ম বিচার ও নানা তর্কের আশ্রয় নিলেও নিশ্চিতভাবে বলা নিতান্ত কঠিন যে, অমুক ফলভোগ আমার পূর্বজন্মের অমুক কর্মের ফল, যা তাঁর প্রেরণাতে প্রাপ্ত অথবা এই জন্মের কোনো কর্ম হাতে হাতে সঞ্চিত থেকে প্রারব্ধ হয়ে এর কারণ হয়েছে !

কোনো ব্যক্তি পুত্রলাভের জন্য পুত্রেষ্টি বা ধনলাভের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। পরে তিনি পুত্র বা ধন প্রাপ্ত হন। এই পুত্র বা ধন প্রাপ্তি যজ্ঞের কারণে না কি পূর্বজন্মের কর্মের কারণে, তা যথার্থ নির্ণয় করা কঠিন। সম্ভবতঃ তিনি

পুত্র বা ধন পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফলরূপেই পেয়েছেন এবং বর্তমান যজ্ঞের ফল পরে পাবেন অথবা ক্রিয়াবৈগুণ্যে তার ফল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এক ব্যক্তি রোগনিরাময়ের জন্য ঔষধ সেবন করেন, তাঁর রোগদূর হয়, তাতে এই কথা বোঝা কঠিন যে, সেটি ঔষধের গুণ নাকি তার ভোগ সমাপ্ত হওয়ায় 'কাকতালীয়ের' মতো এরূপ হয়েছে।[১] তবুও এটি বুঝতে হবে যে, যা হয়েছে, সবই স্বেচ্ছাকৃত কর্মের প্রারব্ধের ফল। কর্মের ফল এখন হবে কি পরে তার কিছু নির্দিষ্ট করা নেই, সর্বতোভাবে ঈশ্বরের অধীন, এতে জীব পূর্ণরূপে পরাধীন। এই জীবনে পাপকর্মকারী লোকেদের ধন-পুত্র-সম্মানে সুখী দেখা যায় (যদিও তাঁদের কতজন মানসিকভাবে অত্যন্ত দুঃখী, তা আমরা জানি না) এবং পুণ্যকর্মকারী মানুষ সাংসারিক বস্তুর অভাবে দুঃখী বলে দেখা যায়। (তার মধ্যেও কতজন মানসিকভাবে সুখী) যাতে মানুষের মনে পাপ-পুণ্যের ফলেতে সন্দেহ দেখা দেয়। এখানে জেনে রাখতে হবে যে বর্তমানের পাপ-পুণ্য কর্মের ফল পরে পাওয়া যায়। এখন পূর্বজন্মকৃত কর্মের ভালো-মন্দের ফল প্রাপ্তি হচ্ছে।

বলা হয় যে কর্ম অধিক শক্তিশালী, তার ফল শীঘ্র পাওয়া যায়, আর যা সাধারণ, তার বিলম্বে হয়। কিন্তু এই নিয়মও সর্বত্র খাটে না। সুতরাং একথাই বলতে হয় যে ত্রিকালদর্শী জগৎনিয়ন্তা পরমাত্মা ব্যতীত, তর্ক-যুক্তির সাহায্যে মানুষ স্বেচ্ছা-প্রারব্ধ নির্ণয় করতে পারেন না। কর্ম ও ফল সংযমকারী যোগী, ঈশ্বরের কৃপায় তাঁর নিজ যোগশক্তির সাহায্যে কিছু জানতে সক্ষম হতে পারেন।

ক্রিয়মাণ

নিজ ইচ্ছায় যে ভালো-মন্দ কাজ করা হয়, তাকে বলা হয় ক্রিয়মাণ। ক্রিয়মাণ কর্মের প্রধান কারণ সঞ্চিত, কখনও কখনও নিজের বা পরের

---

[১]পূর্বকৃত পাপের জন্যও অসুখ হয় অথবা কুপথ্য গ্রহণেও হতে পারে। কুপথ্য সেবনের অসুখ প্রায়শঃ ঔষধ গ্রহণেই নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কর্মজনিত রোগ, ভোগসমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ভালো হয় না। কিন্তু এটি স্থির করা কঠিন যে কোন অসুখ কর্মজনিত এবং কোনটি কুপথ্যগ্রহণজনিত। তাই সব অসুখেই ঔষধ সেবন করা অবশ্য কর্তব্য।

প্রারব্ধও কারণ হয়ে ওঠে। ক্রিয়মাণ কর্মে মানুষ ঈশ্বরের নিয়মে আবদ্ধ হলেও ক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রায়শঃই স্বাধীন। নিয়ম পালন করা বা না করায় তাঁর অধিকার থাকে। এর জন্য তাঁকে ফলভোগ করতে বাধ্য হতে হয়।

যদি কেউ বলেন যে আমরা যেসব ভালোমন্দ কাজ করি, সেসবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় বা প্রারব্ধের জন্য হয়ে থাকে, তবে একথা ভুল। পাপ-পুণ্যকাজ করানোতে ঈশ্বর বা প্রারব্ধকে হেতু বলে মেনে নিলে প্রধানতঃ চারটি দোষ হয়, যা নির্বিকার, নিরপেক্ষ, সমদর্শী, দয়ালু, ন্যায়পরায়ণ ও উদাসীন ঈশ্বরের জন্য সর্বতোভাবে অনুপযুক্ত। যেমন—

১) ঈশ্বর বা প্রারব্ধই যদি ভালো-মন্দ কর্ম করিয়ে থাকেন তাহলে বিধি-নিষেধ জানানো শাস্ত্রের প্রয়োজন কীসের ? **'সত্যং বদ, ধর্মং চর'** (তৈ. ১।১১।১), **'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব'** (তৈ. ১।১১।২) এবং **'সুরা ন পিবেৎ, পরদারান্নাভিগচ্ছেৎ'** ইত্যাদি বিধি-নিষেধযুক্ত বাক্য উল্লঙ্ঘন করে ইচ্ছামতো যথেচ্ছাচারকারী পাপপরায়ণ ব্যক্তি অনায়াসে বলতে পারেন যে আমি তো প্রারব্ধের নিয়ন্তা ঈশ্বরের প্রেরণায় এমন কাজ করছি। অতএব ঈশ্বরের ওপর শাস্ত্র-হননের দোষ বর্তায়।

২) ঈশ্বরই যখন সব কর্ম করান, তাহলে সেই কর্মের সুখ-দুঃখের ফল আমাদের কেন ভোগ করতে হবে ? যে ঈশ্বর কর্ম নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁরই ফলভোগের দায়িত্ব নিতে হবে। তা না করে ঈশ্বর তাঁর দোষ অন্যের ওপর ন্যস্ত করায় দোষী সাব্যস্ত হন।

৩) ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু হওয়াতে দোষ হয় ; কারণ কোনো ন্যায়কারী পাপের দণ্ডবিধানে পুনরায় পাপ করার ব্যবস্থা দিতে পারেন না। যদি তিনি পাপকাজ করাবার ব্যবস্থা করেন, তাহলে পাপীদের জন্য দণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা করা অন্যায় বলে প্রমাণিত হয়। আর যদি ঈশ্বরই পাপ কাজ করান—পাপের কারণ হন এবং দণ্ডও দেন তাহলে তিনি অন্যায়কারী ও নির্দয়ী হয়ে ওঠেন।

৪) ঈশ্বরই যদি পাপীদের জন্য পুনরায় পাপ করার বিধান দেন, তাহলে তো জীবের কখনও পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায়ই থাকে না।

পাপের ফল পাপ, তার ফল পুনরায় পাপ, এইভাবে জীব পাপেই প্রবৃত্ত থাকতে বাধ্য হয়, যাতে প্রথমতঃ অনবস্থার দোষ এবং দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বর জীবেদের পাপবন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে চান, এই দোষও আসে।

সুতরাং একথা মনে করা উচিত নয় যে, পাপ-পুণ্য ঈশ্বরই করান। পাপ-কর্মের জন্য কখনও ঈশ্বরের প্রেরণা থাকে না, পুণ্যের জন্য— সৎকর্মের জন্য ঈশ্বরের নির্দেশ থাকে, কিন্তু তা পালন করা, না করা বা বিপরীত করা আমাদের নিজেদের অধিকারে থাকে। সরকারী আধিকারিকরা নিয়মানুসারে প্রজারক্ষণের অধিকারী, কিন্তু অধিকারারূঢ় হয়ে ক্ষমতার সদুপযোগ বা দুরুপযোগ করা তাঁর অধিকারভুক্ত, যদিও তিনি কানুনের দ্বারা আবদ্ধ এবং কানুন ভঙ্গ করলে দণ্ডের পাত্রও হন ; তদনুরূপ অবস্থা মানুষের অধিকার সম্বন্ধেও বলা যায়।[১]

ঈশ্বর সাধারণভাবে সৎপথের নিত্য প্রেরক হওয়ায় জীব কল্যাণের সহায়ক। নিরন্তর বিষয় চিন্তাই পাপকর্মের প্রধান হেতু, এর দ্বারাই রজোগুণ সম্ভূত কামের উৎপত্তি হয়। সেই কাম থেকেই ক্রোধ ইত্যাদি দোষ উৎপন্ন হয়ে জীবের অধোগতির কারণ হয়। ভগবান বলেছেন—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎসঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

(গীতা ২।৬২-৬৩)

'বিষয় চিন্তাকারী পুরুষের বিষয়ে আসক্তি জন্মায়, আসক্তি থেকে ঐ বিষয়ে কামনা উৎপন্ন হয়, কামনায় বিঘ্ন হলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, ক্রোধ থেকে মূঢ়তা জন্মায়, তাতে স্মরণশক্তি ভ্রমিত হয়, স্মৃতি ভ্রমিত হলে বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানশক্তির বিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ হলে এই ব্যক্তি নিজ শ্রেয়ের সাধন থেকে পতিত হন।'

---

[১]এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা 'মানুষ কর্মে স্বাধীন, নাকি পরাধীন' শীর্ষক লেখায় বলা হয়েছে, সেটি দেখতে হবে।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পাপকর্মাদি করার জন্য বিষয়চিন্তাজনিত অনুরাগ—আসক্তি হল প্রধান কারণ, ঈশ্বর বা প্রারব্ধ নয়। চিন্তন বা স্ফুরণ, ক্রিয়মাণের—নবীন কর্মের—নবীন সঞ্চিতের অনুসারে প্রথমে হয়। সুতরাং পাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য নতুন শুভ কর্ম করার প্রয়োজন থাকে, নতুন শুভকর্মের দ্বারা শুভ সঞ্চিত হয়ে শুভচিন্তা হবে, যাতে শুভকর্ম হওয়াতে এবং অশুভকর্মে বাধা দিতে সাহায্য পাওয়া যায়। সেইজন্যই অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান পুরুষার্থ দ্বারা পাপকর্মের কারণ রাগরূপ রজোগুণ থেকে উৎপন্ন কাম বিনাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অর্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেন—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥

(গীতা ৩।৩৬)

'হে কৃষ্ণ ! তাহলে এই ব্যক্তি যেন বলপূর্বক নিয়োজিতের মতো না চাইতেও কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে পাপাচরণ করে থাকেন।'

তার উত্তরে ভগবান বলেন—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥

(গীতা ৩।৩৭)

'হে অর্জুন ! রজোগুণ থেকে উৎপন্ন এই কামই হল ক্রোধ, এটিই মহা অশন অর্থাৎ অগ্নির মতো ভোগে কখনো তৃপ্ত হয় না এবং পাপী, এই বিষয়ে একেই তুমি শত্রু বলে জানবে।'

এরপর ভগবান ধোঁয়া দ্বারা অগ্নি, ময়লা দ্বারা দর্পণের ন্যায় জ্ঞানকে আবৃতকারী এই দুষ্পূরণীয় অগ্নিসদৃশ কামের নিবাস স্থান মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়তে জানিয়ে ইন্দ্রিয় বশ করে জ্ঞানবিজ্ঞান নাশক পাপী কামকে বিনাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। জীব যদি কাম জয় করতে সক্ষম না হত, তাহলে ভগবান এইরূপ নির্দেশ দিতেন না। সুতরাং ভগবানের নির্দেশানুসারে শুভকর্ম, শুভ সঙ্গ করলে ক্রিয়মাণ শুদ্ধ হয়ে যায়। এই ক্রিয়মাণই সঞ্চিত এবং

প্রারব্ধের কারণ হয়ে থাকে। তাই মানুষের ক্রিয়মাণ শুদ্ধ করার চেষ্টা করা উচিত, কারণ এটি করতে মানুষ স্বতন্ত্র বা স্বাধীন।

ত্রিবিধ কর্মের ভোগ ব্যতীত নাশ হয় কি, নাকি হয় না ?

এখন এটি বোঝার প্রয়োজন আছে যে উপরোক্ত তিন প্রকারের কর্মফল ভোগ দ্বারাই বিনাশ হয় নাকি তাদের বিনাশের অন্য কোনো উপায় আছে ? এর মধ্যে প্রারব্ধ কর্মের নাশ তো ভোগের দ্বারাই হয়। আপ্তপুরুষের বাক্য যেমন ব্যর্থ হয় না, তেমন প্রারব্ধকর্ম ভোগ না করলে নাশ হয় না। ভোগ পূর্বোক্ত অনিচ্ছা, পরেচ্ছা এবং স্বেচ্ছায়ও হতে পারে এবং প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাও হতে পারে। সেবা এবং দণ্ডভোগ — দুটিই হল এ থেকে রেহাই পাওয়ার উপায়। সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্মের নাশ নিষ্কামভাবে করা যজ্ঞ, দান, তপ, সেবা ইত্যাদি সৎকর্মের দ্বারা এবং প্রাণায়াম, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন (সৎসঙ্গ, ভজন, ধ্যান) ইত্যাদি পরমেশ্বরের উপাসনার সাহায্যে হতে পারে। এর দ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যাতে সঞ্চিতের বোঝা শুষ্ক ঘাসে অগ্নি লেগে ভস্ম হয়ে যাওয়ায় মতো বিনাশপ্রাপ্ত হয়[১] এবং কোনো স্বার্থ না থাকায় জাগতিক পদার্থের কোনো কামনা এবং কর্ম করার আসক্তি তথা অহংবুদ্ধি না থাকায় সকাম নতুন কর্ম করা হয় না।

উত্তম কর্ম থেকে মুক্তি লাভ করা অত্যন্তই সহজ, সে তো ভগবানকে অর্পণ করা মাত্রই ত্যক্ত হয়। যেমন, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কিছু অর্থ ধার দিয়েছে। তার সেই ব্যক্তির থেকে টাকা নিতে হবে, যদি সে এই নেওয়ার চিন্তা মন থেকে ত্যাগ করে তাহলে সে এথেকে মুক্ত হতে পারে। 'টাকা ছেড়ে দিয়েছি' এরূপ ত্যাগ দ্বারা সে রেহাই পায়। কিন্তু যার টাকা দেওয়ার আছে, সে এভাবে বললে রেহাই পেতে পারে না। তেমনই যে পাপের দণ্ড আমাদের ভোগ করতে হবে, তার থেকে মুক্তি পেতে 'আমি এটি ভোগ করতে চাই না'

---

[১]যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎকুরুতে তথা॥
(গীতা ৪।৩৭)

বললে হয় না। তাকে হয় তা ভোগ করতে হয় অথবা নিষ্কাম কর্ম বা নিষ্কাম উপাসনা করতে হয়।

পাপ কর্মের এবং সকাম পুণ্য কর্মের পরস্পর হিসাব হয় না, একটি অপরকে কাটে না। দুটির ফলই পৃথকভাবে ভোগ করতে হয়। রামলাল শ্যামলালের কাছে টাকা পান, শ্যামলাল টাকা ফেরৎ না করে তাকে বারবার ঘোরাতে থাকে। তাই একদিন রাগ করে রামলাল শ্যামলালকে দু'ঘা জুতা মারেন। শ্যামলাল আদালতে নালিশ করেন। রামলাল আদালতে বলেন 'শ্যামলাল আমার থেকে এক হাজার টাকা নিয়েছে, আমি তাই ওকে দুবার জুতার আঘাত করেছি। তারজন্য কিছু টাকা কেটে বাকি টাকা আমাকে দেওয়া হোক।' একথা শুনে ম্যাজিষ্ট্রেট হেসে ওঠেন। তিনি বলেন—'এই দেওয়ানি মামলা তার থেকে আলাদা। তুমি টাকা না পেলে দেওয়ানি আদালতে নালিশ করে ওকে জেলে পাঠাতে পারো, কিন্তু জুতো মারার জন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।' এইরূপই পাপ-পুণ্যের ফল পৃথক ভাবে পাওয়া যায়। সকাম পুণ্যের দ্বারা পাপের এবং পাপের জন্য সকাম পুণ্যের কোনো কাটাকাটি হয় না।

কর্মের ফল কে প্রদান করে ?

কিছু মানুষ মনে করেন যে শুভাশুভ কর্মের ফল কর্ম অনুসারে স্বতঃই প্রাপ্তি হয়, তাতে কোনো ঈশ্বর নিয়ামক হয়ে নেই অথবা ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজন নেই। এরূপ মনে করা ভুল। এরূপ মেনে নিলে অনেক অসংগতি আসে এবং এটি যুক্তিসঙ্গতও নয়। শুভাশুভ কর্মের বিভাগ করে সেই অনুযায়ী ফলের ব্যবস্থাকারী নিয়ামকের অভাবে কর্মভোগ হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। কারণ কর্ম জড় হওয়ায় তা কখনোই নিয়ামক হতে পারে না, তা কেবল কারণ হতে পারে। পাপকর্মকারী পুরুষ নিজে পাপের ফল ভোগ করতে চান না। এ কথা নির্বিবাদ এবং লোকপ্রসিদ্ধ। কোনো ব্যক্তি চুরি করেছেন বা ডাকাতি করেছেন। সেই চুরি বা ডাকাতি কর্ম জড় হওয়ায় সেই কর্মের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারে না এবং তিনি নিজেও সেই কর্মের ফলভোগ চান না। তাই এরজন্য কোনো শাসক বা রাজা তাঁর শাস্তির ব্যবস্থা করেন। এইরূপ কর্মের

নিয়ম, বিভাগ এবং ব্যবস্থার জন্য কোনো নিয়ামক অথবা ব্যবস্থাপককে ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা থাকে। এতে যেন কেউ মনে না করেন যে রাজা ও ঈশ্বর এক সমান। রাজা সর্বান্তর্যামী, সর্বভাবে নিরপেক্ষ স্বভাবসম্পন্ন, স্বার্থহীন, নিভ্রান্ত না হওয়ায় প্রমাদ, পক্ষপাতিত্ব, অনভিজ্ঞতা বা স্বার্থবশতঃ অনুচিত ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু পরমাত্মা সমদর্শী, সর্বান্তর্যামী, সুহৃদ্, নিরপেক্ষ, দয়ালু এবং ন্যায়কারী হওয়ায় তাঁর দ্বারা কোনো ভুল হতে পারে না। রাজা স্বার্থবশতঃ ন্যায় করে থাকেন, ঈশ্বর দয়াবশতঃ জীবের উপকারের জন্য ন্যায় করেন। যদি বলা হয় ঈশ্বরের কোনো স্বার্থ নেই, তবে তিনি এই ঝামেলায় কেন থাকেন ? এর উত্তর হল যে তাঁর কাছে এটা কোনো ঝামেলাই নয়। সুহৃদ ব্যক্তি যেমন পক্ষপাত-রহিত হয়ে অন্যের ঝামেলা মিটিয়ে দেন, তার পরিবর্তে মান-মর্যাদা-প্রতিষ্ঠা কিছুই চান না, তাতে তাঁর মহত্ত্ব জগতে প্রসিদ্ধ হয়। তেমনই ঈশ্বর সমগ্র জগতের হিতের জন্য নিঃস্বার্থভাবে তাঁর সুহৃদতার কারণেই ন্যায় করে থাকেন।

ঈশ্বর নিয়ামক না হলে তো কর্মের ভোগই হত না। এতে আরও একটি যুক্তি বিচারযোগ্য। এক ব্যক্তি এমন পাপকাজ করেছেন, যাতে তাঁর কুকুর জন্ম হওয়া উচিত ছিল। তাঁর কর্ম জড় হওয়ায় তাঁকে সেই জন্মে পৌঁছাতেই পারত না (কারণ বিবেকী পুরুষের সাহায্য ব্যতীত মোটর গাড়ি ইত্যাদি জড় জিনিষ নিজে নিজে কারোকে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যেতে পারে না) এবং সে নিজে পাপভোগ করার জন্য যেতে চায় না। যেতে চাইলেও যেতে পারে না, কারণ তারমধ্যে সেই শক্তি নেই। যখন আমরা সতর্ক থেকেও সর্বতোভাবে অপরিচিত কোনো স্থানে যেতে পারি না তখন বিবেক-বোধ ছাড়া জন্ম-পরিবর্তন করা অসম্ভব।

যদি বলা হয় যে, সেই সময় অজ্ঞতার পর্দা দূর হয়ে যায়, তা-ও যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ মৃত্যুকালে দুঃখ ও মোহের আধিক্যে জীবের দশা আরও ভ্রান্ত হয়ে যায়, যোগী বা জ্ঞানীর মতো অবস্থা হয় না। যদি অজ্ঞতার পর্দা সরে গিয়ে তাঁর জীবন্মুক্তির কথা মানা হয়, তবুও এটি যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ ভোগ, প্রায়শ্চিত্ত বা উপাসনা ইত্যাদি ব্যতীত পাপের বিনাশ হয়ে কোনো ব্যক্তির জীবন্মুক্ত হওয়া অসম্ভব। সাধারণ সাংসারিক জ্ঞানে জন্মগ্রহণ করা সম্ভবও নয়

এবং প্রত্যক্ষ দুঃখরূপ হওয়ায় সাধারণ ব্যক্তির তা কাম্য নয়। এতে তার সামর্থ্যও থাকে না, তাই এটি প্রমাণিত হয় যে কর্মানুসারে ফলভোগ করাবার জন্যই জগৎপ্রভু বা নিয়ন্ত্রণকর্তার প্রয়োজন আছে এবং ঈশ্বরই হলেন সেই নিয়ন্ত্রণকর্তা।

ঈশ্বর আরাধনার প্রয়োজনীয়তা কীসের জন্য ?

একথা যদি মেনে নেওয়া হয় যে, ঈশ্বরই শুভাশুভ কর্ম অনুসারে ফল প্রদান করেন এবং তা কম বা বেশি করতে পারেন না, তাহলে তাঁকে আরাধনা করার প্রয়োজন কী ? এখন এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে হবে। প্রথমতঃ ঈশ্বরভজন এক সর্বোত্তম উপাসনারূপ কর্ম, পরম সাধন। এটি করলে সেই অনুসারে বুদ্ধির স্ফুরণ হয় এবং এই স্ফুরণের সাহায্যে বারংবার ঈশ্বর-ভজন-স্মরণ হয়ে থাকে, যার ফলে অন্তর শুদ্ধ হয়ে জ্ঞানের দিব্য প্রকাশ স্ফুরিত হয়। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সঞ্চিত কর্মরাশি দগ্ধ হয়ে পুনর্জন্মের কারণ নষ্ট করে দেয়। তাই জন্য ঈশ্বর আরাধনা পরম আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ এই কথা ভেবে ঈশ্বর ভজন অবশ্যই করা উচিত যে এটি হল আমাদের জীবনের পরম কর্তব্য। সন্তান মাতা-পিতার সেবা নিজ কর্তব্য মনে করে করেন। তাহলে যিনি মাতা-পিতারও পরম পিতা, পরম সুহৃদ, যিনি আমাদের সর্বপ্রকার সুবিধা দিয়েছেন, যিনি সর্বদা আমাদের ওপর অকৃপণ কৃপা-বর্ষণ করেন, যে কল্যাণময় ঈশ্বরের থেকে আমরা নিত্য কল্যাণের আদেশ পাই, যিনি আমাদের কল্যাণের জ্যোতি, অন্ধের যষ্ঠী, ডুবন্ত মানুষের একমাত্র সম্বল এবং পথভ্রষ্ট নাবিকের একমাত্র ধ্রুবতারা, তাঁকে স্মরণ করা আমাদের প্রথম, প্রধান এবং অন্তিম কর্তব্য।

ঈশ্বরকে স্মরণ না করা অত্যন্ত কৃতঘ্নতা। আমরা যখন মাতা, পিতা, গুরুর উপকারেরও দাম দিতে পারি না, তখন পরম সুহৃদ ঈশ্বরের উপকারের দাম কীভাবে মেটাতে পারি ? এরূপ অবস্থায় তাঁকে ভুলে যাওয়া অত্যন্ত কৃতঘ্নতা—হীন, নীচতম কর্ম।

ঈশ্বর সব কিছু করতে সক্ষম '**কর্তুমকর্তুমন্যথাকর্তুম্**' সমর্থ, কিন্তু তিনি তা করেন না। নিজের নিয়মাদি নিজেই রক্ষা করেন এবং আমাদের পাপের

ক্ষমা এবং পুণ্যের ফল পাবার জন্য তাঁর ভজন করা উচিত। তাঁর ভজনের প্রভাবে পাপ স্বতঃই নষ্ট হয়ে যায়, যেমন সূর্যোদয় হলেই অন্ধকার দূর হয়ে যায়।

জবহিঁ নাম মনমেঁ ধর্য়ো, ভয়ো পাপকো নাস।
জৈসে চিনগী আগকী, পরী পুরানে ঘাস॥

কিন্তু ভগবানের পূজার্চনাকারীর এই চিন্তা রাখা ঠিক নয় যে এই ভজনে পাপনাশ হবে। ভগবৎ ভজনের তাৎপর্য জানেন এমন ভক্তও ঈশ্বর-ভজনের বিনিময়ে অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রাথর্না করেন না। যে ঈশ্বরভজন দ্বারা মায়ারূপ সংসার নিজেই নষ্ট হয়, সেই রহস্য জানা ব্যক্তি কি কখনও তুচ্ছ জাগতিক দুঃখ নিবৃত্তির জন্য ভজন ব্যবহার করতে পারেন ? করলে তিনি অত্যন্ত ভুল করেন। রাজাকে মিত্র পেয়ে তাঁর থেকে দশ টাকার নালিশ থেকে মুক্তিলাভের প্রার্থনা করার মত অত্যন্ত হীন কাজ। তাই ভজনকে কোনো জাগতিক কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়, তাকে কর্তব্য মনে করে সর্বদা ঈশ্বর ভজন করতে থাকা উচিত। কারণ ভজনের আদি-মধ্য ও অন্তে শুধু কল্যাণই পূর্ণ থাকে।

~~O~~

(৩) প্রকৃত সুখ এবং তা প্রাপ্তির উপায়

জাগতিক সুখ থেকে ক্ষতি

আজকাল শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রায় সকলেই জাগতিক ভোগবিলাসই প্রকৃত সুখ মনে করে শুধুমাত্র বৈষয়িক উন্নতির চেষ্টাতেই ব্যাপৃত হয়, লোকে এই পরম সত্যকে ভুলে গেছেন যে এই বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগ জনিত পার্থিব সুখ বিনাশশীল, ক্ষণিক এবং পরিণামে সর্বদা দুঃখেরই রূপ হয়।

এখন আমাদের অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষিত বিদ্বান বন্ধু, যাঁরা নিজেদের অত্যন্ত বিচারশীল, তর্কনিপুণ ও বুদ্ধিমান বলে মনে করেন, ইংরেজদের সঙ্গে থেকে তাদের বিলাসপ্রিয়তা ও ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা দেখে পাশ্চাত্য-সভ্যতার

মায়াতে মোহগ্রস্ত হয়ে থাকেন এবং বেদ-শাস্ত্রে উদ্ধৃত ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব না বুঝে প্রাচীন সভ্যতার আদর্শ অবহেলা করে থাকেন। তাঁদের মন থেকে বিশ্বাস প্রায় চলেই গেছে যে, আমাদের প্রাচীন ত্রিকালজ্ঞ মুনি-ঋষিগণের বিচারশীলতা, তর্কপটুত্ব, বুদ্ধিমত্তা আমাদের থেকে অনেক বেশি ছিল। তাঁরা আমাদের উন্নতির জন্য যে, পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, তাই ছিল আমাদের প্রকৃত সুখপ্রাপ্তির আদর্শ পথ। বর্তমানের এরূপ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রকৃত সত্য বুঝিয়ে নিজেদের প্রাচীন আদর্শের দিকে আকর্ষণ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং তাতেই সকলের মঙ্গল।

প্রিয় বন্ধুগণ ! চিন্তা করে দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশ, ধর্ম, ধন, সুখ, আমাদের জাতি ও আয়ুর বিনাশকারী। এই সভ্যতার সংস্পর্শে এসেই এখন আমাদের দেশ তার চিরকালীন ধর্ম-পথ থেকে বিচলিত হয়ে অধোগতির দিকে চলেছে। সেইজন্যই আজ আমাদের মতো ধর্মপ্রাণ জাতিকে অনার্যোচিত কাপুরুষতা ও ভোগপরায়ণতার পথে অগ্রসর হতে দেখা যাচ্ছে। যে সভ্যতা এইভাবে আমাদের জাগতিক সুখেরও বিনাশ করছে, তার থেকে প্রকৃত সুখের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

নিজ পরিধান, ভাষা, আহার্য, আচার-আচরণ ত্যাগ করলে জাতি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যে জাতি এগুলি রক্ষা করে, নিজ আদর্শ-চ্যুত হয় না, তার অস্তিত্ব লোপ হওয়া অত্যন্ত কঠিন। তাই আমাদের প্রাচীন মুনি ঋষিদের আচরিত আচার-আচরণ, বেশ-ভূষা ও স্বভাব-সভ্যতার অনুকরণ করা উচিত। কোনো অবস্থাতেই স্বধর্ম-ত্যাগ করা উচিত নয়।

ভগবান গীতায় বলেছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥

(গীতা ৩।৩৫)

'ভালোভাবে আচরিত অন্যের ধর্ম থেকে গুণরহিত হলেও নিজ ধর্ম অতি উত্তম। নিজ ধর্মে মৃত্যুও কল্যাণকারক আর পরধর্ম ভয়প্রদানকারী।'

মুসলিম শাসনকালে হিন্দুরা যখন তাঁদের ওঠা বসা ও স্বভাব-সভ্যতা নকল করতে শুরু করেন, তখন থেকেই হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম হ্রাস পেতে থাকে। ক্রমশঃ আট কোটি হিন্দু মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেন। যাঁরা গো-ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ের রক্ষক ছিলেন, তাঁরাই ঐসবের বিরোধী হয়ে উঠলেন। এসবই মুসলিম সভ্যতা ও তার আচার-আচরণ অনুকরণের কুপরিণাম।

তারপর এল বৃটিশ শাসন। এখন স্বরাজ্য হয়েছে। ইংরেজ চলে গেছে, কিন্তু ইংরাজীয়ানা একইভাবে বজায় আছে। সেইজন্যই আমাদের জাতিতে এখন ইংরাজী বেশ-ভূষা, খাওয়া-দাওয়া ও আচার-বিচার অত্যন্ত বেশিভাবে ঢুকে পড়েছে। সেই সঙ্গে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতি হ্রাস হয়ে অন্যধর্মগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। এইসব দুর্দশা আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি। এতে কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নেই। অন্যের অনুকরণে নিজ জাতীয়-ভাব ত্যাগ করার এই পরিণাম হয়ে থাকে।

সুতরাং সকলেরই নিশ্চিতভাবে একথা বোঝা উচিত যে পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং তার অন্ধ অনুকরণ করা আমাদের পক্ষে কোনোভাবেই মঙ্গলপ্রদ নয়। এর দ্বারা আমাদের ধর্মময় ভাব নষ্ট হয় এবং শুধুমাত্র জাগতিক উন্নতির পিছনে ছুটে প্রকৃত লাভ থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

প্রকৃত সুখ

চিন্তা করলে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে মানব-জন্মে কোনো অত্যন্ত উত্তমলাভ প্রাপ্ত করা উচিত। খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি জাগতিক ভোগজনিত সুখ তো পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গের মতো যোনিতেও পাওয়া সম্ভব। কিন্তু মানবজন্ম লাভ করেও তা যদি ঐভাবে সুখপ্রাপ্তির জন্য চলে যায়, তাহলে মানব-জীবন পেয়ে কী লাভ ? মনুষ্য জন্মের পরম ধ্যেয় সেই অনুপমেয় ও প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত করা, যার তুল্য অন্য কোনো সুখ নেই। সেই সুখ হল 'পরমাত্মার প্রাপ্তি'।

সাধনায় ব্যাপৃত হন না কেন ?

তা সত্ত্বেও অধিকাংশ ব্যক্তি শুধুমাত্র স্ত্রী-পুত্র-বিষয়-সম্পত্তির সুখকেই

পরমসুখ মনে করে, তাতেই মোহিত হয়ে থাকে। প্রকৃত সুখের জন্য (যত্নশীল) কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি পাওয়াই দুষ্কর। ভগবান বলেছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

(গীতা ৭।৩)

'হাজার হাজার ব্যক্তির মধ্যে কোনো একজন আমাকে প্রাপ্ত করার জন্য চেষ্টা করেন এবং সেই চেষ্টা করা বহুসংখ্যক যোগীদের মধ্যে কোনো একজন পুরুষই আমার পরায়ণ হয়ে আমাকে জানতে পারেন অর্থাৎ যথার্থ মর্ম অবগত হন।'

ভগবানের কথানুসারে এখনও যে স্বল্পসংখ্যক সজ্জনব্যক্তি এই প্রকৃত সুখলাভ করতে চান, তার মধ্যেও অল্প কজনই শেষ পর্যন্ত যেতে সক্ষম হন। বেশির ভাগ সাধকই অল্প সাধনা করে ক্ষান্ত হন। তাঁরা বেশি উন্নতি করতে পারেন না। আমার বুদ্ধিতে তার নিম্নলিখিত কারণ হতে পারে—

১) জগতে এই সিদ্ধান্তের প্রচারকের অভাব ; কারণ এর প্রচারক ত্যাগী, বিদ্বান, সদাচারী, পরিশ্রমী এবং প্রকৃত মহাপুরুষই হতে পারেন।

২) সাধকগণ সামান্য উন্নতিতেই নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করে বেশি সাধনা করার প্রয়োজন বলে মনে করেন না।

৩) কিছু সাধক অল্প সাধনা করেই বিরক্ত হয়ে যান। সাধনাদ্বারা কোনো উন্নতি হচ্ছে না মনে করে তাঁরা 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' হয়ে ওঠেন।

৪) প্রকৃত সুখে লোকের শ্রদ্ধা অনেক কম থাকে, কারণ বিষয় সুখের মতো এই সাধনার শুরুতেই সুখ দেখা যায় না। তাই এতে তৎপরতার অভাব থাকে।

৫) কিছু ব্যক্তি এই সুখ সম্পাদন করা তাদের সামর্থ্যের বাইরে মনে করে নিরাশ হয়ে যায়।

এছাড়া আরও অনেক কারণ বলা যায়, কিন্তু এরমধ্যে প্রকৃত কারণই হল অজ্ঞান এবং অকর্মণ্যতা। অতএব মানুষকে সাবধানে উৎসাহের সঙ্গে কর্তব্য-পরায়ণ হয়ে থাকা উচিত।

প্রকৃত সুখ-প্রাপ্তির উপায়

শ্রুতি বলেন—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

(কঠোপনিষদ্ ১।৩।১৪)

'ওঠো (সাধনের জন্য যত্নশীল হও), অজ্ঞান-নিদ্রা থেকে জাগো এবং শ্রেষ্ঠ বিদ্বান যে পথকে ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্লঙ্ঘ্য এবং দুর্গম বলে থাকেন, মহাপুরুষগণের কাছে গিয়ে তা জেনে নাও।'

সুতরাং এই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার রূপ পরম কল্যাণ এবং পরম সুখপ্রাপ্তির সাধনায় বিন্দুমাত্র বিলম্ব করা উচিত নয়। মানব-জীবনের এই হল পরম কর্তব্য, এই হল সব থেকে বড় ও প্রকৃত সুখ। এই সুখের মহিমা বলতে গিয়ে ভগবান বলেছেন—

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥

(গীতা ৬।২১)

'ইন্দ্রিয়াদির অতীত কেবল শুদ্ধ ও সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা গ্রহণযোগ্য যে অনন্ত আনন্দ, তাকে যে অবস্থায় অনুভব করা হয় এবং যে অবস্থায় স্থিত হয়ে এই যোগী ভগবৎ-স্বরূপ থেকে সরে যান না।'

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

(গীতা ৬।২২)

'পরমেশ্বর প্রাপ্তিরূপ যে লাভ প্রাপ্ত হলে যোগী আর অন্য কিছুকে বেশি লাভ বলে মনে করেন না এবং ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ যে অবস্থায় স্থিত থাকা যোগী অত্যন্ত ভয়ানক দুঃখেও বিচলিত হন না।'

তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্বিণ্ণচেতসা॥

(গীতা ৬।২৩)

‘এবং যা দুঃখরূপ জগতের সংযোগরহিত এবং তারই নাম যোগ, তা জানা উচিত। সেই যোগ, অস্থির না হওয়া চিত্ত দ্বারা অর্থাৎ তৎপরতাপূর্বক চিত্তে সুনিশ্চিতভাবে করা কর্তব্য।’

যদিও এই প্রকৃত সুখলাভের উপায় কিছুটা কঠিন, কিন্তু অসাধ্য নয়। শ্রীপরমাত্মার শরণ গ্রহণ করলে কঠিন হলেও তা সর্বতোভাবে সরল, সুখসাধ্য এবং অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। গীতায় ভগবান স্বয়ং প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলেছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥

(৯। ৩২-৩৩)

‘হে অর্জুন ! নারী, বৈশ্য এবং শূদ্র ও পাপযোনিসম্ভূত যে কেউ হোক, তারাও আমার শরণ নিয়ে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। তাহলে পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ এবং রাজর্ষি ভক্তগণ যে পরমগতি লাভ করবেন তা আর কথা কী ? অতএব তুমি সুখহীন, ক্ষণভঙ্গুর মানবদেহ ধারণ করে নিরন্তর আমাকেই ভজনা করো।।’

সুতরাং সাধকদের উচিত পরমাত্মার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তাঁর শরণ গ্রহণ করে নিজ উন্নতির প্রতিবন্ধক কারণসমূহ নিম্নলিখিত উপায়ে দূর করার জন্য চেষ্টা করা।

১) সাধকের ধারণায় এই জগতে যিনি সর্বাপেক্ষা উত্তম সদাচারী, জ্ঞানী মহাত্মা বলে প্রতিভাত হন, তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর নির্দেশানুসারে তৎপরতার সঙ্গে সাধনায় ব্যাপৃত হওয়া। তাঁর কথায় পূর্ণ বিশ্বাস রেখে, তাঁর কাছে গিয়ে ‘কিংকর্তব্যবিমূঢ়’ হয়ে না থাকা, নিজের বুদ্ধিকে প্রাধান্য না দেওয়া, তাঁর কথিত সাধন ঠিকমতো অনুধাবন করতে না পারলে বিনম্রভাবে সঠিক পথ জেনে তা অনুসরণ করে সাধনে ব্যাপৃত হওয়া। যদি কিছু সময় পর্যন্ত সুখের উপলব্ধি না হয়, তাহলে পরিণামে পরম হিতলাভ হবে এই বিশ্বাস রেখে তাঁর আদেশ পালন করতে কখনও বিমুখ হওয়া উচিত নয়।

শ্রীভগবান বলেছেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

(গীতা ৪।৩৪)

'তাঁদের বিনীতভাবে প্রণাম, সেবা করে অকপটভাবে সরলতার সঙ্গে প্রশ্ন করে সেই জ্ঞান জেনে নাও। সেই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ তোমাকে সেই জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন।'

২) সাধকের কখনও একথা ভাবা উচিত নয় যে আমায় কোনো এক সময়ে এই সাধন ছেড়ে দিতে হবে। তাঁর বুঝতে হবে যে এই সাধনই আমার পরম ধন, পরম কর্তব্য, পরম অমৃত, পরম সুখ এবং আমার প্রাণের পরম আধার। যাঁরা মনে করেন যে পরমাত্মার জ্ঞান হওয়ার পর আমাদের সাধনের আর কী প্রয়োজন, তাঁরা ভুল করেন। যে সাধন দ্বারা অন্তঃকরণে পরম শান্তি লাভ হয়েছে, তা কীভাবে ছেড়ে থাকা সম্ভব ? পরমাত্মাপ্রাপ্ত হওয়ার পর সেই মহাপুরুষের স্থিতি দেখে দুরাচারী মানুষদেরও সাধনে প্রবৃত্তি হয়, যা দেখে সাধনহীন ব্যক্তিরাও সাধনে লেগে যায়, তাহলে তাঁর সম্বন্ধে আর বলার কী আছে! তা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি অল্প উন্নতিতেই নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করেন, তিনি অত্যন্ত ভুল করেন। এই ভুলের জন্যই সাধনে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এই ভুলই সাধকের অধঃপতন করায়। সুতরাং এ থেকে সর্বদা দূরে থাকা উচিত।

৩) সাধকের এই বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা উচিত যে কর্তব্যপরায়ণ, ভগবৎ-শরণাগত ব্যক্তির পক্ষে কোনো কার্যই দুঃসাধ্য নয়। তিনি অতি বড় কাজও সহজেই করতে পারেন। বাস্তবে এই শক্তি প্রতিটি মানুষেরই আছে। নিজের শক্তির অভাব মেনে নেওয়ার অর্থ নিজেকেই ছোট করা। উৎসাহী ব্যক্তির জন্য কষ্টসাধ্য কার্যও সুখসাধ্য হয়ে ওঠে।

৪) প্রত্যেক সাধকেরই নিজের পরীক্ষা নিজেরই করা উচিত। সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে নিজের লুকানো দোষও প্রত্যক্ষ করা যায়। সাধকের দেখা উচিত যে আমার মন আমার অধীন, শুদ্ধ, একাগ্র এবং বিষয়-বিরক্ত হয়েছে কি না! কারণ যতক্ষণ মন ও ইন্দ্রিয়ের ওপর পূর্ণ অধিকার না হয়, ততক্ষণ পরমাত্মা প্রাপ্তি অনেক দূরে। ভগবান বলেন—

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥

(গীতা ৬।৩৬)

'যারা সংযতচিত্ত নয় তাদের দ্বারা এই যোগ দুষ্প্রাপ্য। বশীভূত চিত্ত ব্যক্তি সাধনার দ্বারা এই যোগ সহজেই প্রাপ্ত হতে পারেন। এই হল আমার মত।'

সুতরাং সাধকের সর্বপ্রথম মনকে নিজের অধীন, শুদ্ধ এবং একাগ্র করা উচিত[১]। তারজন্য শাস্ত্রে প্রধানতঃ দুটি উপায়ের কথা বলা হয়েছে।

(১) অভ্যাস এবং (২) বৈরাগ্য।

শ্রীভগবান বলেছেন—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥

(গীতা ৬।৩৫)

'হে মহাবাহো ! মন নিঃসন্দেহে চঞ্চল এবং তাকে বশ করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু হে কুন্তীপুত্র অর্জুন ! অভ্যাস অর্থাৎ তাকে শান্ত করার জন্য বারংবার চেষ্টা এবং বৈরাগ্যের দ্বারা তা বশীভূত হয়।'

পাতঞ্জলযোগদর্শনেও এইরূপ বলা হয়েছে—

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।

(যোগ ১।১২)

'অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের সাহায্যে এই (চিত্তবৃত্তি) নিরোধন করা যায়।'

অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা যথাক্রমে উক্ত গ্রন্থেই দেখতে হবে, কিন্তু ভগবান অভ্যাসের স্বরূপ মুখ্যতঃ এইরূপ বলেছেন—

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥

(গীতা ৬।২৬)

'এই অস্থির ও চঞ্চল মন যে যে কারণে জাগতিক পদার্থ সমূহে বিচরণ

---

[১]মনকে বশ করার উপায় নামক গ্রন্থে মনকে শান্ত করার অনেক উপায় জানানো হয়েছে।

করে, তার থেকে বারংবার সরিয়ে এনে তাকে পরমাত্মাতে স্থির করবে।'

বৈরাগ্যের বিষয়ে ভগবান বলেছেন—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥

(গীতা ৫।২২)

'ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগে যেসব ভোগ উৎপন্ন হয়, যদিও তা বিষয়ী লোকের কাছে সুখরূপে প্রতিভাত হয়, তবু তা নিঃসন্দেহে দুঃখেরই হেতু। তার আদি-অন্ত আছে অর্থাৎ অনিত্য। সেইজন্য হে অর্জুন ! বুদ্ধিমান বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি তাতে রত হন না।'

এইরূপ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে শুদ্ধ, নিজ অধীন একাগ্র ও বৈরাগ্যসম্পন্ন করে ভগবৎ-স্বরূপে নিরন্তর অচল-স্থির হয়ে ধ্যানের সাধন করা কর্তব্য।

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥

(গীতা ৬।২৪-২৫)

'সংকল্পজাত সমস্ত কামনা নিঃশেষে ত্যাগ করে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়-সমূহকে সমস্ত বিষয় থেকে ভালোভাবে বশীভূত করে ক্রমশঃ অভ্যাসের দ্বারা উপরতিতে স্থিত হবে (এবং) ধৈর্যসহ বুদ্ধিদ্বারা মনকে পরমাত্মায় স্থিত করে পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই চিন্তা করবে না।'

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের প্রভাবে মন শুদ্ধ, স্বাধীন, একাগ্র ও উপরত হয়ে গেলে মনকে পরমাত্মা চিন্তায় স্থাপন করা অত্যন্ত সুগম হয়, উপরোক্ত দুটি উপায় পূর্ণতঃ কার্যকর না করেও মানুষ যদি শুধুমাত্র পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করে তাঁর নাম-জপ ও স্বরূপ-চিন্তায় তৎপর হয়ে ওঠেন, তাহলে এইপ্রকার ধ্যানের দ্বারাই সবকিছু হওয়া সম্ভব। সাধকের মন শীঘ্রই শুদ্ধ, একাগ্র ও তাঁর অধীন হয়ে যায়, এতে কোনোই সন্দেহ নেই।

মহর্ষি পতঞ্জলিও অতি সত্ত্বর সমাধিস্থ হওয়ার উপায় জানিয়ে বলেছেন—

'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা' (যোগদর্শন ১।২৩)

অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে নিরোধ তো করা যাবেই, যে সাধক এই উপায়গুলি যত কার্যকর করেন, তত শীঘ্রই তাঁর মন নিরুদ্ধ হয়। উপরন্তু ঈশ্বরপ্রণিধানের দ্বারা মন অতি শীঘ্র সমাধিস্থ হতে পারে।

এর দ্বারা মেনে নেওয়া যায় যে জপ, তপ, ব্রত, দান, লোকসেবা ; সৎসঙ্গ ও শাস্ত্রমনন ইত্যাদি সমস্ত সাধন এই ধ্যানের জন্যই বলা ও করা হয়।

সুতরাং প্রকৃত সুখপ্রাপ্তির সাক্ষাৎ সরল এবং সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় হল পরমাত্মার স্বরূপই সর্বদা চিন্তা করা। শাস্ত্রকারগণ একেই ধ্যান, স্মরণ ও নিদিধ্যাসন ইত্যাদি নামে উল্লেখ করেছেন। কর্মযোগ ও সাংখ্যযোগ ইত্যাদি সকল সাধনে পরমাত্মার ধ্যানই প্রধান।

সাধন কালে অধিকারী-ভেদে ধ্যানের সাধনায়ও অনেক পার্থক্য থাকে। সকল মানুষের একপ্রকার সাধনায় রুচি হয় না। একটি গন্তব্যে যাওয়ার জন্য অনেক পথ থাকে। তেমনই ফলরূপে একই পরমবস্তু প্রাপ্তি হলেও সাধন-প্রকারে পার্থক্য থাকে। কেউ একত্বভাবে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার নিরাকার রূপের ধ্যান করেন, কেউ আবার প্রভু-সেবকভাবে সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের চিন্তা করেন। কেউ ভগবানের বিশ্বরূপের তো কেউ চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণুরূপের, কেউ মুরলীমনোহর শ্রীকৃষ্ণরূপের তো কেউ আবার মর্যাদা-পুরুষোত্তম শ্রীরামরূপের আবার কেউ শ্রীশিবরূপের ধ্যান করে থাকেন।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥

(গীতা ৯।১৫)

অতএব যে সাধকের পরমাত্মার যেরূপে অধিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা, তিনি সর্বদা তাঁরই ধ্যান করতে থাকবেন। সবেরই পরিণাম এক। পরিণামের জন্য কোনোরূপ সন্দেহ করার প্রয়োজন নেই।

সাধক প্রায়শঃ দুই শ্রেণীর হন। এক, অভেদরূপে অর্থাৎ একত্বভাবে পরমাত্মার উপাসনাকারী, দুই, প্রভু-সেবক-ভাবে ভক্তিকারী। এঁদের মধ্যে

অভেদরূপে উপাসনাকারীদের জন্য কেবলমাত্র এক সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপেই সর্বদা একত্ব-ভাবে অবস্থান করাই ধ্যানের সর্বোত্তম সাধন। কিন্তু অন্য, প্রভু-সেবক-ভাবে উপাসনাকারী ভক্তদের জন্য শাস্ত্রে ধ্যানের বহুপ্রকার বলা হয়েছে।

ধ্যানের পদ্ধতি ঠিক মতো না জানায় ধ্যান ঠিকমতো হয় না, সাধক পরমাত্মার ধ্যান করতে চান, কিন্তু তাঁর ধ্যান হয়ে যায় জগতের। এই কথা প্রায়ই দেখা ও শোনা যায়। তাই পরমাত্মাতে মন স্থাপন করার যে নিয়ম থাকে, তা জানা খুবই প্রয়োজন। শাস্ত্রকারগণ বহু প্রকারের ধ্যানের বিধি নিয়ম জানাবার চেষ্টা করেছেন। তার মধ্যে কিছু পথপ্রদর্শন এখানে করা হচ্ছে।

এমনিতে তো পরমাত্মার চিন্তা সর্বক্ষণ উঠতে, বসতে, চলতে-ফিরতে, খেতে-শুতে, কথা বলতে এবং সর্বপ্রকার কাজ করার সময় করা উচিত, কিন্তু সাধক বিশেষ সময়ে যখন ধ্যানের জন্য বসেন, সেই সময় কোনোভাবেই তাঁর অন্তরে সাংসারিক চিন্তা-সঙ্কল্প উঠতে দিতে নেই এবং নির্জন ও শুদ্ধ স্থানে বসে ধ্যানের সাধনা শুরু করে দিতে হবে।

গীতায় বলা হয়েছে—

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥

(৬।১১-১২)

‘পবিত্রস্থানে যা অতি উচ্চ বা নিচু না হয়, এমনভাবে কুশ, মৃগচর্ম, বস্ত্র দিয়ে নিজের আসন স্থাপন করে সেই আসনে বসে মন ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত করে অন্তঃকরণের শুদ্ধির জন্য যোগের অভ্যাস করবেন।’

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥

(গীতা ৩।৩৭)

‘শরীর, মস্তক, গ্রীবাকে সমান ও নিশ্চলভাবে স্থির করে নিজ নাসিকার

অগ্রভাগে দৃষ্টি রেখে[১] অন্য কোনো দিকে না তাকিয়ে পরমেশ্বরের ধ্যান করবেন।'

ধ্যানকারী সাধকের এই কথা বিশেষভাবে জেনে রাখা উচিত যে যতক্ষণ নিজের শরীর ও সংসারের জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ ধ্যানের সঙ্গে নাম-জপের অভ্যাস করতে থাকা উচিত। নাম-জপের সাহায্য না থাকলে অনেক সময় পর্যন্ত নামীর স্বরূপে মন বসে না। নিদ্রা, আলস্য ও নানারূপ সাংসারিক চিন্তা বিঘ্ন রূপে মনে এসে যায়। নামীকে স্মরণ করার প্রধান আধারই হল নাম। নাম নামীর রূপকে কখনও ভুলতে দেয় না। নামের দ্বারা ধ্যানে পূর্ণ সাহায্য পাওয়া যায়। সুতরাং ধ্যান করার সময় যতক্ষণ ধ্যেয়তে সম্পূর্ণরূপে মন লীন না হয়, ততক্ষণ নাম-জপ করে যাওয়া উচিত। এ হল ধ্যানের বিষয়ে সাধারণ কথা। এবার ধ্যানের কিছু নিয়ম জানানো হচ্ছে।

অভেদোপাসনার অনুসারে ধ্যানের নিয়ম

একত্বভাবে পরমাত্মার উপাসনাকারী সাধকের উচিত তিনি উপরোক্তভাবে আসনে বসে মনের সমস্ত সঙ্কল্প ত্যাগ করে যেন এইভাবে চিন্তা করেন—

১) এক আনন্দঘন জ্ঞানস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মাই পরিপূর্ণ। তাছাড়া আর কিছুই নেই, সেই ব্রহ্মের জ্ঞানও ব্রহ্মেরই। তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, তাঁর কখনও অভাব হয় না। তাই তাঁকে সত্য, সনাতন ও নিত্য বলা হয়, তিনি অসীম, অপার এবং অনন্ত। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, দ্রষ্টা, দর্শন ইত্যাদি সে সবই ঐ ব্রহ্মে আরোপিত এবং ব্রহ্মেরই স্বরূপ। বাস্তবে এক পূর্ণ ব্রহ্মা পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোনো বস্তু নেই। এই সমগ্র জগৎ স্বপ্নসদৃশ সেই পরমাত্মাতে কল্পিত।

---

[১]এখানে নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি রাখার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু যাদের চোখবন্ধ করে ধ্যান করার অভ্যাস, তাঁরা চোখ বন্ধ করেও ধ্যান করতে পারেন, তাতে কোনো ক্ষতি নেই।

'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' (তৈত্তিরীয়. ২।২১)

'ব্রহ্ম সত্য, চেতন এবং অনন্ত' শ্রুতির এই অনুসারে তিনি আনন্দঘন, সত্যস্বরূপ, বোধস্বরূপ পরমাত্মা, 'বোধ' তাঁর ভিন্ন কোনো গুণ বা তাঁর কোনো উপাধি বা শক্তিবিশেষ নয়। এইরূপ 'সৎ'ও তাঁর থেকে ভিন্ন গুণ নয়। তিনি সর্বদা আছেন এবং সর্বদাই থাকবেন, তাই লোক ও বেদে তাঁকে 'সৎ' বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই পরমাত্মা সৎ ও অসৎ দুইয়েরই অতীত।'

'ন সত্তন্নাসদুচ্যতে' (গীতা ১৩।১২)

এইভাবে অন্তরে ব্রহ্মের অচিন্ত্য স্বরূপের দৃঢ় চিন্তা করে জপের স্থানে বারংবার নিম্নলিখিতভাবে পরমাত্মার বিশেষণাদি মনে মনে চিন্তা ও উচ্চারণ করবেন। বাস্তবে ব্রহ্মা নাম রূপের অতীত, কিন্তু তাঁর আনন্দ-স্বরূপের স্ফুরণের জন্য এই বিশেষণের কল্পনা করা হয়। সুতরাং সাধক চিত্তের সমস্ত বৃত্তি আনন্দরূপ ব্রহ্মে তল্লীন করে 'পূর্ণ আনন্দ', 'অপার আনন্দ', 'শান্ত আনন্দ', 'ঘন আনন্দ', 'বোধস্বরূপ আনন্দ', 'জ্ঞানস্বরূপ আনন্দ', 'পরম আনন্দ', 'নিত্য আনন্দ', 'সৎ আনন্দ', 'চেতন আনন্দ', 'আনন্দ-ই-আনন্দ' এই ভাবে ব্রহ্মের বিশেষণগুলি চিন্তা করতে করতে এই ভাবনাকে উত্তরোত্তর দৃঢ় করতে থাকবেন যে এক 'আনন্দ' ব্যতীত আর কিছুই নেই। সেই সঙ্গে তিনি নিজের মনকে অত্যন্ত তৎপরতাপূর্বক সেই আনন্দময় ব্রহ্মে তন্ময় করে তাঁর সমস্ত বিশেষণসমূহ সেই আনন্দময় পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করবেন। এই ভাবে মনন করতে করতে যখন মনের সমস্ত সংকল্প সেই পরমাত্মাতে বিলীন হয়ে যায়, তখন এক বোধস্বরূপ, আনন্দঘন পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোনো অস্তিত্বের সঙ্কল্প মনে থাকে না এবং তাঁর অবস্থান সেই আনন্দময় অচিন্ত্য পরমাত্মাতে নিশ্চলভাবে হয়ে যায়। এইভাবে নিত্য নিয়ম করে ধ্যানের অভ্যাস করতে থাকলে সাধন পরিপক্ব হলে সাধকের জ্ঞানে তাঁর নিজের এবং এই জগতের অস্তিত্ব ব্রহ্ম থেকে আর ভিন্ন থাকে না, যখন জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সব কিছুই এক বিজ্ঞানানন্দঘন ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে ওঠে, তখন তিনি কৃতার্থ হয়ে যান। তখন সাধক, সাধনা এবং সাধ্য সবই অভিন্ন, সবই এক

আনন্দস্বরূপ হয়ে ওঠে, তখন তাঁর সেই স্থিতি চিরদিনের মতো সেইরূপই হয়ে যায়। চলতে-ফিরতে, উঠতে, বসতে, এবং অন্য সব কাজ যথাবিহিত ও যথাসময়ে হলেও তাঁর স্থিতিতে বিন্দুমাত্র অন্যথা হয় না। ভগবান বলেছেন—

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥

(গীতা ৬।৩১)

'যে ব্যক্তি একীভাবে স্থিত সমস্ত প্রাণীতে আত্মরূপে অবস্থিত আমাকে, সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেবকে ভজনা করেন, সেই যোগী সর্বপ্রকারে প্রবৃত্ত হলেও আমাতেই অবস্থান করেন ; কারণ তাঁর অনুভূতিতে আমি ব্যতীত অন্য কিছু নেই।'

প্রকৃতপক্ষে তিনি কোনো সময় জগৎকে বা নিজেকে ব্রহ্ম থেকে পৃথক বলে মনে করেন না। সেইজন্য তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না। তিনি চিরকালের মতো মুক্তিলাভ করেন।

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥

(গীতা ৬।১৭)

'যাঁদের মন ও বুদ্ধি তাঁতেই নিবিষ্ট, যাঁরা সেই সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতেই নিরন্তর একীভাবে অবস্থিত, সেই তৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ জ্ঞানের দ্বারা পাপরহিত হয়ে অপুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পরমগতি প্রাপ্ত হন।' এই হল উপরোক্ত ধ্যানের ফল।

অভেদোপাসনায় ধ্যানের অন্য যুক্তি

যচ্ছেদ্বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিয়চ্ছেৎ তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥

(কঠ. ১।৩।১৩)

'বুদ্ধিমান ব্যক্তির বাক্যাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মনের দ্বারা নিরোধ করা উচিত, মনকে বুদ্ধিতে নিরোধ করবে, বুদ্ধিকে মহৎতত্ত্বে অর্থাৎ সমষ্টি-

বুদ্ধিতে নিরোধ করবে এবং সেই সমষ্টি বুদ্ধি শান্তাত্মা পরমাত্মাতে নিরোধ করবে।'

একান্ত স্থানে বসে দশ ইন্দ্রিয়াদির বিষয়সমূহকে গ্রহণ না করে অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় রোধ করে মনের সাহায্যে শুধু পরমাত্মার স্বরূপ বারংবার মনন করতে থাকাই হল 'বাক্যাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়কে মনে নিরোধ' করা। এরপর মনন করা পরমাত্মার স্বরূপের বিষয়ে যত বিকল্প আছে, সেসব ছেড়ে এক নিশ্চয়ে স্থিত হয়ে চিত্তের শান্ত হওয়া অর্থাৎ অন্তঃকরণে কোনোপ্রকার চঞ্চলাত্মক বৃত্তির কিছুমাত্র অস্তিত্ব না থেকে একমাত্র বিজ্ঞানের প্রকাশিত হওয়া হল 'মনকে বুদ্ধিতে নিরোধ' করা। ধ্যানের এইরূপ অবস্থানে ধ্যাতার নিজের এবং ধ্যেয় বস্তু পরমাত্মার বোধ থাকে, কিন্তু তারপর যখন সেই সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণব্রহ্মের স্বরূপ নিশ্চিতকারী বুদ্ধি-বৃত্তির পৃথক অস্তিত্বও সমষ্টি জ্ঞানে তন্ময় হয়ে যায়, যখন ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধ্যেয়র সমস্ত পার্থক্য দূর হয়ে কেবল এক জ্ঞানস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপবোধমাত্র থাকে ; এই অবস্থাকে 'বুদ্ধির সমষ্টি -বুদ্ধিতে নিরোধ' করা বলা হয়।

এর পর আরও এক অনির্বচনীয় স্থিতি হয়, যাতে ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধ্যেয়কে ছাড়া সংস্কারমাত্রেরও অবশেষ থাকে না। কেবল এক শুদ্ধ, বোধস্বরূপ সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাই থাকেন, তিনি ছাড়া অন্য কোনো পৃথক অস্তিত্ব কোনো ভাবেই থাকে না। এই হল নাম সমষ্টি -বুদ্ধিকে শান্তাত্মাতে নিরোধ করা।

একেই নির্বীজ সমাধি, শুদ্ধব্রহ্মপ্রাপ্তি বা কৈবল্য-পদ প্রাপ্তি বলা হয়। এই হল অন্তিম স্থিতি। বাক্য দ্বারা এই অবস্থার বর্ণনা করা যায় না, মন পারে না এর মনন করতে ; কারণ এ হল মন-বুদ্ধির অতীত বিষয়, এই হল মোক্ষ।

এই স্থিতি লাভ করে পুরুষ কৃতকৃত্য হয়ে যায়। তারজন্য আর কোনো কর্তব্যই বাকী থাকে না। গীতায় ভগবান বলেছেন—

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥

(গীতা ৩।১৭)

'যে ব্যক্তি আত্মাতে প্রীতিসম্পন্ন, আত্মাতেই তৃপ্ত ও আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁর জন্য কোনো কর্তব্য থাকে না।'

অভেদোপাসনা অনুসারে পরমাত্মার ধ্যান করার আরও বহু উপায় আছে, কিন্তু লেখার আকার বৃদ্ধি পাবে, সেইজন্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সবেরই বক্তব্য প্রায় একই। অভেদভাবে উপাসনাকারীদের পক্ষে গীতার এই শ্লোকটি সর্বদা স্মরণে রাখা অত্যন্ত লাভপ্রদ—

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥

(গীতা ১৩।১৫)

'সেই পরমাত্মা চরাচর সর্বভূতের ভেতরে ও বাইরে এবং স্থাবর ও জঙ্গমরূপে বিরাজিত। তিনি সূক্ষ্ম হওয়ায় অবিজ্ঞেয়[১], অতি নিকটে[২] এবং অত্যন্ত দূরেও[৩] তিনিই অবস্থিত।

সুতরাং যাঁর অভেদ উপাসনায় রুচি থাকে, সেই সাধকের উপরোক্ত প্রকার সাধনে অতি শীঘ্র তৎপর হওয়া উচিত।

বিশ্বরূপ পরমাত্মার ধ্যানের বিধি

একান্ত স্থানে চোখবন্ধ করে বসলেও যদি সাধকের হৃদয় থেকে এই মায়াময় জগতের কল্পনা দূর না হয়, তাহলে এইরূপ চিন্তা করা উচিত।

পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং দ্যৌ—এই তিনলোকে যা কিছু দেখাশোনা ও মনন করা যায়, সেসবই সাক্ষাৎ শ্রীপরমাত্মার স্বরূপ। সেই সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাই তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা বিশ্বরূপে প্রকাশমান। গীতায় যেমন বলা হয়েছে—

---

[১]সূর্যকিরণে অবস্থিত জলরাশির কথা যেমন সাধারণ ব্যক্তি জানতে পারে না, তেমনি সর্বব্যাপী পরমাত্মাও সূক্ষ্ম হওয়ায় তিনি সাধারণ মানুষের গোচরে আসেন না।

[২]পরমাত্মা সর্বত্র পরিপূর্ণ ও সকলের আত্মা হওয়ায় তিনি অতি নিকটে অবস্থিত আছেন।

[৩]শ্রদ্ধাহীন, অজ্ঞান ব্যক্তিদের অজ্ঞতার জন্য তাদের থেকে তিনি অতি দূরে।

সর্বতঃপাণিপাদং তৎসর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

(গীতা ১৩।১৩)

'তাঁর সর্বদিকে হস্ত ও পদ, চক্ষু ও মস্তক, মুখ ও কান। কারণ তিনি সমগ্র জগৎকে ব্যাপ্ত করে বিরাজিত আছেন।'[১]

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

(গীতা ১০।৪২)

'অথবা হে অর্জুন ! তোমার এতো জানার কী প্রয়োজন ? আমি এই সমগ্র জগৎকে (নিজ যোগশক্তির) একাংশে ধারণ করে আছি। তাই আমাকে তত্ত্বতঃ জানা উচিত।'

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎস্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥

(গীতা ১০।৩৯)

'হে অর্জুন ! সর্বভূতের উৎপত্তির কারণও আমি ; কারণ স্থাবর-জঙ্গম এমন কোনো প্রাণী নেই যা আমাকে ছাড়া অস্তিত্বলাভ করেছে, তাই সবকিছু আমারই স্বরূপ।'

এইভাবে বারংবার মনন করে সম্পূর্ণ জগৎ তত্ত্বতঃ শ্রীপরমাত্মার স্বরূপ জেনে পরমাত্মাকে নিশ্চিতরূপে মনে স্থির করা উচিত। তাহলে মনের চঞ্চলতার সহজেই বিনাশ হয়। পরে মন যেখানেই যায় সেখানেই তিনি পরমাত্মাকে দর্শন করেন। পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। যেমন জল থেকে তৈরি নানাপ্রকার বরফের খেলনা যিনি তত্ত্বতঃ জলস্বরূপ বলেই জেনে নেন, সেই খেলনাগুলি আবার জল হয়ে যাওয়াতে যেমন

---

[৪]যেমন আকাশ, বায়ু-অগ্নি-জল ও পৃথিবীর কারণরূপ হওয়ায় সেগুলি পরিব্যাপ্ত করে আছে, তেমনই পরমাত্মা সকলের কারণরূপ হওয়ায় সমস্ত চরাচর জগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছেন।

কোনো ভ্রম থাকে না, তেমনই তার সব খেলনাই জলস্বরূপ বলে প্রতীত হয়। উপরোক্তভাবে ধ্যানকারী সাধকেরও সমগ্র বিশ্ব পরমাত্মস্বরূপ বলেই প্রতীত হয়। তার ভাবনাতে জগৎরূপ কোনো বস্তুরই অস্তিত্ব থাকে না, মন শান্ত ও সংশয়রহিত হয়ে যায়। চঞ্চল চিত্ত পরমাত্মাতে ন্যস্ত করার এ এক সহজ উপায়।

শ্রীবিষ্ণুর চতুর্ভুজরূপ ধ্যান করার বিধি

একান্ত স্থানে পূর্বোক্ত প্রকারে আসনে বসে চোখ বন্ধ করবেন এবং আনন্দে মগ্ন হয়ে নিজের সেই পরম প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ধ্যানের সাধন আরম্ভ করবেন।

মন্দিরে ভগবৎ-মূর্তি দর্শন করে, ভগবৎচিত্র দর্শন করে, সাধু-মহাত্মা দ্বারা শুনে বা সৌভাগ্যবশতঃ স্বপ্নে প্রভুকে দর্শন করে, ভগবানের যেমন সাকাররূপ বুদ্ধিতে মানা হয় অর্থাৎ ভগবানের সাকার-রূপ, যা সাধকের মনে ধরে, তাঁর চিন্তা করে ধ্যান করা উচিত। সাধারণতঃ ভগবানের মূর্তির ধ্যানের চিন্তা এইভাবে করা যায়—

১) মাটি থেকে প্রায় সওয়া হাত উচ্চে আকাশে নিজের সামনেই ভগবান বিরাজমান। ভগবানের অতীব সুন্দর চরণারবিন্দ পদ্মরাশির মতো চমকিত হয়ে অনন্ত সূর্যের মতো প্রকাশিত হচ্ছে। চমকিত নখযুক্ত নরম অঙ্গুলি এবং তার ওপর রত্নালঙ্কার জড়িত নূপুর শোভা পাচ্ছে। ভগবানের চরণকমলের মতোই তাঁর জানু, জঙ্ঘা ইত্যাদি অঙ্গও পদ্মরাশির মতো তাঁর পীতাম্বরের মধ্যে থেকে ঝলক দিচ্ছে। আহা ! কী সুন্দর সুদীর্ঘ বাহুসকল। ঊর্ধ্বের দুই বাহুতে শঙ্খ, চক্র এবং নিম্নের দুই বাহুতে গদা ও পদ্ম বিরাজমান। চতুর্বাহু নানা অলঙ্কারে সুশোভিত। আহা ! অতি বিশাল, পরম সুন্দর তাঁর বক্ষস্থল, যার মধ্যে শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী ও ভৃগুলতা চিহ্ন অঙ্কিত। নীলপদ্মের ন্যায় সুন্দর বর্ণবিশিষ্ট ভগবানের গ্রীবা অত্যন্ত সুন্দর। তিনি রত্নমণ্ডিত হার, কৌস্তভমণি ও বহু প্রকার মুক্তা, স্বর্ণের ন্যায় নানা সুন্দর দিব্য গন্ধ-পুষ্প ও বৈজয়ন্তীমালা সুশোভিত। সুন্দর চিবুক, লাল-লাল ঠোঁট এবং মনোহর টিকালো নাক, যার অগ্রভাগে

দিব্য মোতি শোভিত। ভগবানের দুই নয়ন কমলপত্রের মতো বিশাল এবং নীলকমলের ন্যায় প্রস্ফুটিত। কানে রত্নবিজড়িত সুন্দর মকরাকৃতি কুণ্ডল ও ললাটে শ্রীযুক্ত তিলক এবং মস্তকে মনোহর মণিমুক্তাময় কিরীট-মুকুট শোভমান। আহা ! ভগবানের অতুলনীয় মনোহর মুখারবিন্দ পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় রূপ ধারণ করে মনোহরণ করছে। মুখমণ্ডলের চারপাশে সূর্যের মতো কিরণ দেদীপ্যমান। তার প্রভাবে ভগবানের মুকুট ও অলঙ্কারের রত্নগুলি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ঝলকাচ্ছে। আহা ! আজ আমি ধন্য ! ধন্য ! এই মৃদুহাস্যময় পরমানন্দমূর্তি শ্রীহরি ভগবানের ধ্যান করতে পেরে, ধন্য !

এইরূপ চিন্তা করতে করতে যখন ভগবৎস্বরূপ ভালোভাবে স্থির হয়ে যায়, তখন প্রেমে বিভোর হয়ে সাধকের ভগবানের সেই মনমোহন রূপে চিত্তকে স্থির করা উচিত। ধ্যানের অভ্যাস করতে সাধকের যখন নিজের ও জগতের এবং ধ্যানেরও জ্ঞান থাকে না, শুধুমাত্র সেই ভগবানেরই জ্ঞান থাকে, তখন সাধকের ভগবানের স্বরূপে সমাধি লাভ হয়। এরূপ হলে সাধক তখনই ভগবানের প্রকৃত তত্ত্ব জেনে যান এবং ভগবান তখন তাঁর প্রেমপরবশ হয়ে সাক্ষাৎ সাকাররূপে প্রকটিত হয়ে নিজদর্শন দান করে কৃতার্থ করে থাকেন।

শ্রীভগবান তাই বলেছেন—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥

(গীতা ১১।৫৪)

'হে শ্রেষ্ঠ ! তপস্বী অর্জুন ! অনন্য ভক্তিদ্বারা এইরূপ চতুর্ভুজ স্বরূপসম্পন্ন আমাকে প্রত্যক্ষ দর্শনের জন্য এবং তত্ত্বতঃ জানার ও প্রবেশ করার জন্য অর্থাৎ অভেদভাবে প্রাপ্ত হবার জন্যও আমি শক্য অর্থাৎ আমাকে পাওয়া সম্ভব।'

এইভাবে ভগবানের দর্শন লাভ হলে সেই ভক্ত কৃতকৃত্য হয়ে ওঠেন। তাঁর সমস্ত অবগুণ নষ্ট হয়ে যায় এবং তিনি পূর্ণ মহাত্মা হয়ে ওঠেন। তাঁর আর

পুনর্জন্ম হয় না।

গীতায় বলা হয়েছে—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥

(গীতা ৮।১৫)

'পরম সিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত করে দুঃখরূপ ক্ষণভঙ্গুর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় না।'

দ্বিতীয় বিধি

২) নিজ হৃদয়াকাশে শেষনাগের শয্যায় শায়িত ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে চিন্তা করতে করতে নিম্নলিখিত ভাবে মনে মনে তাঁর স্বরূপ ও গুণাদি চিন্তা করে তাঁকে বারংবার প্রণাম করা উচিত।

যাঁর রূপ অত্যন্ত শান্ত, যিনি শেষনাগের শয্যায় শয়ন করে আছেন, যাঁর নাভিতে কমল, যিনি দেবগণেরও ঈশ্বর এবং সমগ্র জগতের আধার, যিনি আকাশের ন্যায় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, নীল মেঘের মতো যাঁর মনোহর নীল বর্ণ, অতি সুন্দর যাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যোগীগণ যাঁকে ধ্যানের দ্বারা প্রাপ্ত করেন, যিনি সমস্ত লোকের প্রভু, যিনি জন্ম-মৃত্যুরূপ ভয় নাশকারী, সেই শ্রীলক্ষ্মীপতি কমলনয়ন ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে আমি মাথানত করে প্রণাম করি।[১]

---

[১]বন্দৌ বিষ্ণু বিশ্বাধার !

লোকপতি, সুরপতি, রমাপতি, সুভগ শান্তাকার।
কমল-লোচন, কলুষ-হর, কল্যাণ-পদ-দাতার॥
নীল-নীরদ-বর্ণ, নীরজ-নাভ, নভ-অনুহার।
ভৃগুলতা-কৌস্তুভ-সুশোভিত হৃদয় মুক্তাহার॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-কমলযুত ভুজ বিভূষিত চার।
পীত-পট-পরিধান পাবন অঙ্গ-অঙ্গ উদার॥
শেষ-শয্যা-শায়িত যোগী-ধ্যান-গম্য, অপার।
দুঃখময় ভব-ভয়-হরণ, অশরণ-শরণ অবিকার॥

'পত্রপুষ্প'

অসংখ্য সূর্যসম যাঁর দীপ্তি, অনন্ত চন্দ্রের মতো যাঁর শীতলতা, কোটি কোটি অগ্নির মতো যাঁর তেজ, অসংখ্য মরুদ্‌গণের সমান যাঁর পরাক্রম, অনন্ত ইন্দ্রের মতো যাঁর ঐশ্বর্য, কোটি কোটি কামদেবের সমান যাঁর সৌন্দর্য, অসংখ্য পৃথিবীর মতো যাঁর ক্ষমা, কোটি কোটি সমুদ্রসম তাঁর গাম্ভীর্য, যাঁর কোনোভাবেই কোনো উপমা দেওয়া যায় না, বেদ ও শাস্ত্রাদিতে যাঁর স্বরূপ শুধু কল্পনা করা হয়, তাঁর পার কখনো কেউ পায়নি, সেই অনুপমেয় ভগবান শ্রীহরিকে আমি বারবার প্রণাম জানাই।

যে সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিষ্ণু মৃদু-মৃদু হাস্য করছেন, যাঁর সমস্ত অঙ্গের রোমে ঘর্ম চমকাচ্ছে ও শোভা দিচ্ছে, সেই পতিতপাবন ভগবান শ্রীহরিকে আমি বারবার প্রণাম করি। এইভাবে অভ্যাস করতে করতে যখন চিত্ত শান্ত, নির্মল ও প্রসন্ন হয়ে ওঠে, তখন নিজের মনকে সেই শেষশায়ী ভগবান নারায়ণদেবের ধ্যানে অচল করে রাখা উচিত।

পরমাত্মার সাকার ও নিরাকার স্বরূপের ধ্যান করার আরও বহুপ্রকার সাধনা আছে, এখানে শুধু কয়েকটির দিগ্‌দর্শন করানো হয়েছে। এই বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান শ্রীপরমাত্মা ও মহাত্মাগণের শরণ নিয়ে সাধনে তৎপর হলে অনুভূত হয় সাকারের ধ্যানে এখানে শুধু শ্রীবিষ্ণুর দুই প্রকার ধ্যানের কথা বলা হয়েছে। সাধকগণ এইভাবে নিজ নিজ শ্রদ্ধা ও প্রীতি অনুসারে শ্রীরাম, কৃষ্ণ, শিব আদি অন্যান্য স্বরূপের ধ্যানও করতে পারেন। সবকিছুর ফলই এক।

নির্জন স্থান থেকে ওঠার পরেও কাজের সময় চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে সর্বসময় নিজ ইষ্টদেবের নাম-জপ ও স্বরূপ চিন্তা করার চেষ্টা করা উচিত। জীবনের অমূল্য সময়ের একপলও শ্রীভগবানের স্মরণ রহিত থাকা উচিত নয়। জীবনে সদা-সর্বদা যেরূপ অভ্যাস হয়ে থাকে, শেষকালেও সেই স্মৃতি থাকে এবং অন্তকালের স্মৃতি অনুসারেই তার গতি হয়। তাই ভগবান গীতায় বলেছেন—

তস্মাৎ সর্বেষু কালেসু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥

(৮।৭)

'অতএব (হে অর্জুন ! তুমি) সর্বসময় নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো এবং যুদ্ধও করো। এইভাবে আমাতে অর্পিত মন-বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হলে (তুমি) নিঃসন্দেহে আমাকেই প্রাপ্ত হবে।'

এইভাবে সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের ধ্যানের দ্বারা সাধকের হৃদয় পবিত্র ও নির্মল হয়ে ওঠে। সম্পূর্ণ চিন্তা বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে অন্তরে এক বিশুদ্ধ শান্তি বিরাজ করে। চিত্ত একাগ্র ও নিজের অধীন হয়। সাধনার বৃদ্ধিতে যেমনই অন্তঃকরণের নির্মলভাব ও একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়, তেমনই প্রকৃত আনন্দও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। সাধক যখন প্রকৃত সুখ সামান্যভাবেও অনুভব করেন তখন সেই সুখের কাছে ত্রিলোকের রাজ্যসুখও অত্যন্ত তুচ্ছ ও নগণ্য বলে মনে হয়। এই অবস্থায় সাধারণ ভোগজনিত মিথ্যা সুখের কেউ আশাও করে না। ভোগবিলাস তো সেই সাধকের কাছে বিনাশশীল, ক্ষণিক এবং প্রত্যক্ষ দুঃখজনক বলে প্রতীত হয়। এই প্রকার সাধনের দ্বারা সাধকের বৃত্তিসমূহ অতি শীঘ্রই সংসার বিমুখ হয়ে শ্রীভগবানের স্বরূপে অটল ও স্থির হয়ে যায়। সাধক সেই প্রকৃত ও অপার আনন্দ চিরকালের জন্য প্রাপ্ত করে তৃপ্তি লাভ করেন। তাঁর দুঃখসমূহের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়ে যায়। মনুষ্য-জীবনের এই হল চরম লক্ষ্য।

প্রিয় পাঠকগণ ! আমাদের এই বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস রাখা উচিত যে, মানবজীবনের পরম কর্তব্য হল সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণব্রহ্ম সর্বশক্তিমান আনন্দকন্দ ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করা। এ হল ইহলোক ও পরলোকের সর্বাপেক্ষা মহান, নিত্য ও সত্যসুখ। এছাড়া অন্যান্য যতপ্রকার জাগতিক সুখ প্রতীত হয়, সেসব বাস্তবে সুখ নয়। কেবল মোহের জন্য তাতে সুখের মিথ্যা আভাসমাত্র হয়, বাস্তবে সেসবই দুঃখ। যোগদর্শনে বলা হয়েছে—**'পরিণামতাপসংস্কার-দুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ'** (২।১৫)।

'জগতের সমস্ত বিষয়জনিত সুখ পরিণাম, তাপ, সংস্কার ও জাগতিক দুঃখতে মিশ্রিত তথা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণের বৃত্তিসমূহের পরস্পর বিরোধী হওয়ায় বিবেকবান পুরুষদের জন্য তা দুঃখময়ই হয়ে থাকে।'

সুতরাং বিষয়জনিত এই ক্ষণিক, বিনাশশীল ও কৃত্রিম সুখ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে আমাদের অত্যন্ত শীঘ্র তৎপর হয়ে সেই প্রকৃত সুখস্বরূপ পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্য সাধনায় উৎসাহ ও দৃঢ়তা সহকারে মনোনিবেশ করতে হয়।

~~০~~

(৪) শরণাগতি

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

(গীতা ১৮।৬২)

মানবজীবনের পরম লক্ষ্য হল আত্যন্তিক আনন্দ-প্রাপ্তি। পরমাত্মাতেই পাওয়া যায় আত্যন্তিক আনন্দ, অতএব পরমাত্মা প্রাপ্তিই হল মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শাস্ত্রকার ও মহাত্মাগণ অধিকারী অনুসারে নানা উপায় এবং সাধনের কথা বলেছেন, কিন্তু বিচার করলে দেখা যায় সেই সমস্ত সাধনের মধ্যে পরমাত্মার শরণাগতির ন্যায় সহজ, সরল ও সুখসাধ্য সাধন আর অন্য কিছু নেই। তাই প্রায় সকল শাস্ত্রেই এর প্রশংসা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তো উপদেশের আরম্ভ ও শেষ দুটিই শরণাগতি করা হয়েছে। প্রথমে অর্জুন **'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'** (গীতা ২।৭) 'আমি আপনার শিষ্য, শরণাগত, আমাকে যথার্থ উপদেশ দিন' একথা বলেছেন, তখন ভগবান উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন এবং শেষকালে উপদেশের উপসংহার করে বলেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণ ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্যামি মা শুচঃ॥

(গীতা ১৮।৬৬)

'সমস্ত ধর্ম অর্থাৎ সম্পূর্ণ কর্মের আশ্রয় ত্যাগ করে কেবল এক

সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেব পরমাত্মা আমাতেই অনন্য শরণ লাভ করো। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব, তুমি চিন্তা কোরো না।

এর পূর্বের কথা প্রসঙ্গেও ভগবান শরণাগতিকে যতো গুরুত্ব দিয়েছেন, অন্য সাধনকে ততো গুরুত্ব দেননি। জাতি বা আচরণে যে কেউ যতোই নীচ বা পাপী হোক না কেন, ভগবানের শরণ নিলেই সে অনায়াসে পরমগতি লাভ করবে।

ভগবান বলেছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥

(গীতা ৯।৩২)

'হে অর্জুন ! স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র এবং পাপযোনিসম্পন্ন ব্যক্তি—যে কেউ হোক, আমার শরণ গ্রহণ করলে সে পরমগতি লাভ করে।'

শ্রুতিতে বলা হয়েছে—

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥
এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

(কঠ. ১।২।১৬-১৭)

'এই অক্ষরই ব্রহ্মস্বরূপ, এই অক্ষরই পররূপ, এই অক্ষরকে জেনেই যে পুরুষ যেমন ইচ্ছা করেন, তিনি তেমনই প্রাপ্ত হন। এই অক্ষরের আশ্রয় (শরণ) শ্রেষ্ঠ। এই আশ্রয় সর্বোৎকৃষ্ট, এই আশ্রয়কে জেনে (তিনি) ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়ে থাকেন।'

মহর্ষি পতঞ্জলি অন্যান্য সব উপায়ের থেকে এটি সহজ বলে জানিয়েছেন—

'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা।' (যোগদর্শন ১।২৩)

ঈশ্বরের শরণাগতির দ্বারা সমাধি প্রাপ্তি হয়। পতঞ্জলি পরে এর ফল জানিয়েছেন—

'ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।' (যোগদর্শন ১।২৯)

সেই ঈশ্বরপ্রণিধানে পরমাত্মা প্রাপ্তি এবং (সাধনে আগত) সমস্ত বিঘ্নের অবসান হয়ে যায়।

ভগবান শ্রীরাম ঘোষণা করেছেন—

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম॥

(বাল্মীকি রামায়ণ ৬।১৮।৩৩)

এ হল প্রমাণসমূহের দিগ্‌দর্শন। শাস্ত্রাদিতে শরণাগতির মহিমার অসংখ্য প্রমাণ বর্তমান। কিন্তু বিচারণীয় বিষয় হল এই যে শরণাগতি বাস্তবে কাকে বলা হয়। কেবল মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলেই যে 'হে ভগবান ! আমি আপার শরণাগত' বলা শরণাগতি নয়। সাধারণতঃ শরণ নেওয়ার অর্থ হল কায়-মনো-বাক্যে সর্বতোভাবে ভগবানে নিজেকে অর্পণ করা। কিন্তু এই অর্পণও শুধু **'শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু'** বলে দিলেই সিদ্ধ হয় না। যদি এর দ্বারাই অর্পণ সিদ্ধ হতো তাহলে আজ পর্যন্ত কত ব্যক্তি যে ভগবানের শরণাগত হয়ে পরমগতি লাভ করতেন, তার কোনো সংখ্যা নেই, তাই এখন বুঝতে হবে যে অর্পণ কাকে বলে।

শরণ, আশ্রয়, অনন্যভক্তি, অব্যাভিচারিণী ভক্তি, অবলম্বন, নির্ভরতা ও আত্মসমর্পণ ইত্যাদি শব্দ প্রায় একই অর্থবোধক।

এক পরমাত্মা ব্যতীত কারোকে কোনো কালেও সহায়ক না জেনে লজ্জা-ভয়, মান-মর্যাদা ও আসক্তি ত্যাগ করে শরীর ও সংসার থেকে অহং-মমত্ব রহিত হয়ে শুধু একমাত্র পরমাত্মাকেই নিজের পরম আশ্রয়, পরম গতি ও সর্বস্ব জেনে, অনন্য ভাবে, অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি-প্রেমপূর্বক নিরন্তর ভগবানের নাম, গুণ, প্রভাব ও স্বরূপ চিন্তা করতে থাকা এবং ভগবানকে স্মরণ-ভজন করতে করতে তাঁর আদেশানুসারে সমস্ত কর্তব্য কর্ম নিঃস্বার্থভাবে কেবল ভগবানের জন্যই আচরণ করতে থাকা, এই হল 'সর্বপ্রকারে পরমাত্মার অনন্য শরণাগত' হওয়া।

এই শরণাগতিতে প্রধানতঃ চারটি বিষয় সাধকদের বুঝতে হবে।

১) সব কিছু পরমাত্মার মনে করে তাঁকে অর্পণ করা।

২) তাঁর প্রত্যেক বিধানে পরম সন্তুষ্ট থাকা।

৩) তাঁর আদেশানুসারে তাঁর জন্য সমস্ত কর্তব্য কর্ম করা।

৪) নিত্য-নিরন্তর স্বাভাবিকভাবে অবিচ্ছিন্নরূপে তাকে স্মরণ রাখা।

এই চারটির ওপর যৎকিঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

সর্বস্ব অর্পণ

সবকিছু পরমাত্মাকে অর্পণ করে দেওয়ার অর্থ ঘর-দ্বার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া বা কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করে কর্মহীন হয়ে থাকা নয়। সাংসারিক বস্তুতে আমরা ভ্রমবশতঃ যে মমতা আরোপ করেছি বা তাতে যে নিজস্বভাব আরোপ করেছি, তা রদ করা। এই হল তাঁরই বস্তু তাঁকে অর্পণ করা। সকল বস্তু তো তাঁরই, কিন্তু ভ্রমক্রমে আমরা নিজের মনে করি এবং সেটি কাছ ছাড়া হলে আমরা দুঃখ পাই।

এক ধনী ব্যক্তির বিশাল কারবার ছিল এবং সবার উপরে তিনি একজনকে নিযুক্ত করেছিলেন। ধনী ব্যক্তিটি তাঁকে বিশ্বাসী ও কর্তব্যপরায়ণ মনে করে সম্পত্তির দেখাশোনা ও যাবতীয় সমস্ত ভার তাঁকে সমর্পণ করেন। এখন সেই ব্যক্তির দায়িত্ব হল যে তিনি মালিকের কোনো বস্তুর ওপর নিজের কোনো অধিকার না রেখে, কোনো মমতা বা অহংকার না রেখে মালিকের আদেশ এবং তাঁর নির্দিষ্ট করা নিয়মানুসারে সমস্ত কাজ অত্যন্ত দক্ষতা, সতর্কতা এবং বিশ্বাসের সঙ্গে করতে থাকা। কোটি-কোটি অর্থের লেন-দেন করবেন, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি মালিকের ন্যায় ঠিকমতো সামলে রাখবেন, মালিকের নামে হস্তাক্ষর করবেন, কিন্তু কোনো কিছু নিজের মনে করবেন না। মূলধন মালিকের, ব্যবসার লাভ মালিকের এবং ক্ষতির দায়িত্বও মালিকের।

ঐ কর্মচারী যদি কখনও ভুল, প্রমাদ বা বেইমানী করে মালিকের অর্থ নিজের মনে করে নিজের কাজে ব্যয় করে, মালিকের সম্পত্তি ও লাভের অংশ অধিকার করে নেয়, তাহলে তাকে চোর, বেইমান ও অপরাধী বলে জানতে হবে। আদালতে বিচার করতে হলে সেইসব তার কাছ থেকে কেড়ে তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয় এবং তার নাম এতো কলঙ্কিত হয়ে যায় যে তাকে

সকলেই অবিশ্বাসী মনে করে, যাতে সে চিরকালের মতো দুঃখী হয়ে যায়। তেমনই মালিকের কাজের দায়িত্ব সামলে যদি কাজে গাফিলতি করে, চুরি করে, মালিকের নিয়ম ভঙ্গ করলে সে-ও অপরাধী হয়, তাই কর্মচারীর জন্য এই দুটিই নিষিদ্ধ।

তেমনই এই সমগ্র জগৎ সেই পরমেশ্বরের, তিনিই সমস্ত পদার্থের উৎপন্নকারী, তিনিই নিয়ন্ত্রণকর্তা, তিনিই আধার এবং তিনিই প্রভু, তিনিই আমাদের কর্মবশতঃ যেরূপ পরিস্থিতি পাওয়া উচিত, সেইভাবে উৎপন্ন করে তাঁর নিজের কিছু বস্তুর দেখাশোনা ও সেবার ভার দিয়েছেন এবং আমাদের জন্য কর্তব্যের বিধিও জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা ভ্রমবশতঃ পরমাত্মার বস্তুগুলি নিজের বলে মনে করে নিয়েছি, তাই আমাদের দুর্গতি হয়ে থাকে। আমরা যদি আমাদের এই ভ্রম দূর করে মনে করি যে, যা কিছু আছে, তা সবই পরমাত্মার, আমরা তাঁর সেবকমাত্র, তাঁর সেবা করাই আমাদের ধর্ম, তাহলে পরমাত্মা আমাদের বিশ্বাসভাজন মনে করে আমাদের ওপর প্রসন্ন হন এবং আমরা তাঁর কৃপা ও পুরস্কারের যোগ্য হয়ে উঠি। মায়াবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াই সব থেকে বড় পুরস্কার। যা কিছু আছে, তা সবই পরমাত্মার, এই ধারণা হলে মমত্ববোধ অপসারিত হয় এবং যা কিছু আছে, তা পরমাত্মারই, এর ফলে অহং-অভিমান দূর হয়ে যায়—অর্থাৎ পরমাত্মাই একমাত্র জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ, এটির জ্ঞান হলে তাতে মমতা ও অহংকার (আমি ও আমার ভাব) বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 'আমি-আমার' ভাবই হল বন্ধন। ভগবানের শরণাগত ভক্ত 'আমি-আমার' ভাবের বন্ধন মুক্ত হয়ে পরমাত্মাকে বলেন যে, শুধু তুমিই আছ এবং সব কিছু তোমারই।

এই হল অর্পণ। এই অর্পণের সিদ্ধি হলে সাধক বন্ধনমুক্ত হয়ে যান, তাঁর আর কোনো চিন্তা থাকে না। যে চিন্তা করে, নিজেকে আবদ্ধ বলে মনে করে মুক্তি কামনা করে, সে বাস্তবে পরমাত্মার তত্ত্ব জেনে তাঁর শরণ গ্রহণ করেনি। শরণাগত সাধকের চিত্ত থেকে নিজ উদ্ধারের চিন্তা দূরে চলে যায়। বাস্তবে এই হল ব্যাপার। শরণ গ্রহণের পরও যদি শরণাগতকে চিন্তা করতে হয় তবে সেই শরণ কেমন ? যিনি যাঁর শরণ নেন, তখন তাঁর চিন্তা প্রভুরই হয়ে থাকে।

জো জাকো শরণো লিয়ো, তাকহঁ তাকী লাজ।
উলটৈ জল মছলী চলে, বহ্যো জাত গজরাজ॥

কপোত শিবিরাজের শরণাপন্ন হলে শরণাগতবৎসল রাজা যখন নিজ দেহের মাংস দিয়ে তাকে রক্ষা করতে পারেন, তখন সেই পরমেশ্বর যিনি অনাথের নাথ, দয়ার অনন্ত, অথৈ সাগর, জগতের ইতিহাসে শরণাগত-বৎসলতার অতি বৃহৎ ঘটনা যাঁর কাছে সমুদ্রের তুলনায় জলের এক বিন্দুর ন্যায়ও নয়, তাঁর শরণ গ্রহণ করলে কি তিনি আমাদের রক্ষা করবেন না ? তাতেও যদি আমাদের মনে উদ্ধারের চিন্তা থাকে এবং আমরা নিজেদের শরণাগত বলে মনে করি তাহলে এ আমাদের নীচতা, আমরা শরণাগতির বিষয় কিছুই বুঝতে পারিনি। বাস্তবে শরণাগত ভক্তের উদ্ধার হওয়া বা না হওয়া কীসের চিন্তা ? ভক্ত তো নিজেকে মন ও বুদ্ধিসহ তাঁর চরণে সমর্পণ করে সর্বতোভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে যান, তিনি উদ্ধারের জন্য চিন্তা কেন করবেন ? শরণাগতির বিষয় জানা ভক্তের উদ্ধারের চিন্তা করা তো দূরের কথা, তিনি সেকথা ভাবতেই পছন্দ করেন না। ভগবান নিজে যদি কখনও তাঁর উদ্ধারের কথা বলেন তাহলে ভক্ত তাতে নিজের শরণাগতিতে ত্রুটি জেনে লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হয়ে নিজেকে ধিক্কার দেন। তিনি মনে করেন যে যদি আমার মনে কখনও মুক্তির ইচ্ছা লুকিয়ে না থাকত, তাহলে এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ আজ উঠতই না। মুক্তি তো ভগবানের প্রেমের এক অংশমাত্র, সেই প্রেমধন ছেড়ে অংশের ইচ্ছা করা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। মুক্তির ইচ্ছাকে কলঙ্ক জেনে এবং নিজ দুর্বলতা ও নীচাশয়তা অনুভব করে ভগবানের ওপর নিজের অবিশ্বাসের কথা জেনে পরমাত্মার কাছে তিনি একান্তে গিয়ে কেঁদে ওঠেন—

'হে প্রভো ! যতক্ষণ আমার হৃদয়ে মুক্তি ইচ্ছা রয়েছে ততক্ষণ আমি আপনার কীসের দাস ? আমি তো মুক্তিরই গোলাম ! আপনাকে ছেড়ে অন্যের আশা করছি, মুক্তির জন্য আপনাকে ভক্তি করছি এবং তা সত্ত্বেও নিজেকে নিষ্কাম শরণাগত প্রেমিক ভক্ত বলে মনে করছি। নাথ ! এ আমার দম্ভ আচরণ। প্রভু ! দয়া করে আমার এই দম্ভ নাশ করুন। আমার হৃদয় থেকে মুক্তিরূপ স্বার্থ কামনার মূলোচ্ছেদ করে আপনার অনন্য প্রেম ভিক্ষা দিন। আপনার ন্যায়

অনুপমেয় দয়াময়ের থেকে কিছু ভিক্ষা করা ছেলেমানুষি, কিন্তু আতুর কি করে না ?

এইভাবে শরণাগত ভক্ত সব কিছু ভগবানে সমর্পণ করে সর্বভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকেন।

ভগবানের প্রতিটি বিধানে সন্তোষ লাভ

এই অবস্থায় যা কিছু হয় তিনি তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। প্রারব্ধবশতঃ অনিচ্ছা বা পরেচ্ছায় যা কিছু লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখ প্রাপ্তি হয়, তিনি সেসবই পরমাত্মার দয়াপূর্ণ বিধান জেনে সর্বদা সমভাবে সন্তুষ্ট, নির্বিকার ও শান্ত থাকেন। গীতায় বলা হয়েছে—

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥

(৪।২২)

নিজে নিজেই যা কিছু পাওয়া যায়, তাতে সন্তুষ্ট থাকা, হর্ষ-শোকদ্বন্দ্বের অতীত এবং ঈর্ষারহিত, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমত্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি কর্ম করেও তাতে আবদ্ধ হন না।

বাস্তবিকপক্ষে শরণাগত ভক্ত এই তত্ত্ব জানেন যে দৈবযোগে যা কিছু পাওয়া যায়, তা ঈশ্বরের ন্যায়সঙ্গত বিধান এবং সেটি তাঁর দয়াপূর্ণ আদেশেই হয়। তাই ভক্ত সেটিকে পরম সুহৃদের দান মনে করে আনন্দে মাথা নত করে গ্রহণ করেন। যেমন কোনো প্রেমিক সজ্জন ব্যক্তি তাঁর কোনো প্রেমিক ন্যায়পরায়ণ সুহৃদ বন্ধুর করা ন্যায়কর্ম তাঁর ইচ্ছার প্রতিকূলে দেওয়া হলেও তিনি সেই সুহৃদ বন্ধুর ন্যায়পরায়ণতা, বিবেকবুদ্ধি, বিচারভাবনা, বন্ধুত্ব, পক্ষপাতহীনতা ও প্রেমের ওপর বিশ্বাস রেখে আনন্দের সঙ্গে তা স্বীকার করে থাকেন, তেমনই শরণাগত ভক্তও ভগবানের অতি কঠোর বিধানও সহর্ষে সাদরে মেনে নেন ; কারণ তিনি জানেন যে আমার সুহৃদ, করুণাময় ভগবান যা কিছু বিধান করেন তাতে তাঁর দয়া-প্রেম-ন্যায় ও আমার মঙ্গলকামনাই পূর্ণভাবে থাকে। তিনি ভগবানের কোনো বিধানে কখনও ভুলেও মন খারাপ করেন না।

ভগবান কখনও কখনও তাঁর শরণাগত ভক্তের কঠিন পরীক্ষাও নিয়ে থাকেন, তিনি সবই জানেন, ত্রিকালে কোনো কিছুই তাঁর অজানা নয়, তবুও ভক্তের হৃদয় থেকে মান, অহঙ্কার, দুর্বলতা ইত্যাদি কলুষ হরণ করে তাঁকে নির্মল ও পরিপক্ক করে তাঁর পরম হিতের উদ্দেশ্যে তিনি পরীক্ষার লীলা করেন।

পরমাত্মার প্রেমিক যে সজ্জন ব্যক্তি শরণাগতির তত্ত্ব বুঝে যান, তাঁর কোনো বিষয়ই নিজ মনের প্রতিকূল বলে মনে হয় না। বাজীগরের কোনো কাজই তাঁর সহায়কের মনের প্রতিকূল বা দুঃখদায়ক হয় না। সে নিজ প্রভুর ইচ্ছার অধীন হয়ে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁর প্রতিটি ক্রিয়াই মেনে নেয়। তেমনই ভক্তও ভগবানের প্রত্যেক লীলায় প্রসন্ন থাকেন। তিনি জানেন এ সবই আমার প্রভুর মায়া। অদ্ভুত লীলাময়ের এসব নানাপ্রকার খেলা। আমার ওপর তাঁর অসীম দয়া তাই তিনি তাঁর লীলায় আমাকে সঙ্গে নিয়েছেন—এ আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য যে আমি সেই লীলাময়ের লীলার পাত্র হতে পেরেছি, এইভেবে তিনি তাঁর প্রত্যেক লীলাতে, তাঁর প্রত্যেক খেলায় তাঁর চাতুরী এবং সবকিছুর পেছনে তাঁর দিব্যদর্শন করে পদে পদে প্রসন্ন হয়ে থাকেন। এ হল সিদ্ধ শরণাগত ভক্তের কথা, কিন্তু শরণাগতির সাধকও প্রত্যেক সুখ-দুঃখেই তাঁর দয়াপূর্ণ বিধান জেনে প্রসন্ন থাকেন। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে সুখপ্রাপ্তিতে তো প্রসন্ন হওয়া স্বাভাবিক এবং যুক্তিসংগত, কিন্তু দুঃখে সুখের ন্যায় প্রসন্ন থাকা কীভাবে সম্ভব ? তার উত্তর হল যে পরমাত্মার তত্ত্ব যিনি অবগত তাঁর কাছে সুখপ্রাপ্তিতে প্রসন্ন হওয়া ও শান্তিলাভও বিকার হয়ে থাকে। তিনি পাপ-পুণ্যবশতঃ প্রাপ্ত হওয়া অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়জনিত সুখ-দুঃখ দুইয়েরই অতীত। কিন্তু সাধনকালেও প্রসন্নতা হওয়াই উচিত। যেমন কঠিন অসুখের সময় বুদ্ধিমান রোগী ভালো চিকিৎসক প্রদত্ত অত্যন্ত কটু উপযোগী ঔষধ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে ও চিকিৎসকের উপকার মনে রাখে, তেমনই নিঃস্বার্থ বৈদ্যরূপ পরম সুহৃদ পরমাত্মার বিধান করা কষ্টগুলি সহর্ষে মেনে নিয়ে তাঁর কৃপা ও সদাশয়তার জন্য ঋণী হয়ে সুখী হওয়া উচিত। ভগবানের প্রিয় প্রেমিক শরণাগত ভক্ত মহাদুঃখরূপ ফলকে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ভোগ

করতে করতে পদে পদে তাঁর দয়া স্মরণ করে পরম প্রসন্ন হন। তিনি মনে করেন, দয়ালু চিকিৎসক যেমন পেকে যাওয়া ফোড়া কেটে তার রস বার করে দিয়ে রোগীকে সুস্থ করেন, তেমনই ভগবান ভক্তের হিতের জন্য কখনও কখনও এই ভাবে কাটাছেঁড়া করে তাকে নীরোগ করে দেন। এতে তাঁর দয়াই বিদ্যমান থাকে। এই কথা ভেবে ভক্ত ভগবানের প্রত্যেক বিধানে পরম সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি দুঃখে উদ্বিগ্ন হন না এবং সুখের স্পৃহা করেন না **'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ'** (গীতা ২।৫৬)।

ভগবানের আদেশানুসারে কর্মের পালন করা

সুখের আকাঙ্ক্ষা না থাকায় ভক্ত আসক্তি ও কামনাবশতঃ কোনো নিষিদ্ধ কর্ম করতে পারেন না। তাঁর প্রতিটি কার্য ঈশ্বরের আদেশানুসারে হয়ে থাকে। তাঁর কোনো কাজই পরমাত্মার ইচ্ছার বিরুদ্ধ হয় না ; কারণ পরমাত্মার ইচ্ছাতেই তিনি তাঁর ইচ্ছা মিলিয়ে দেন, তাঁর নিজের কোনো পৃথক ইচ্ছা থাকে না। যখন একজন সাধারণ শ্রদ্ধাশীল সেবকও তাঁর প্রভুর প্রতিকূল কোনো কার্য করতে চান না, কখনও ভ্রমক্রমে কোনো ভুল, বিপরীত কার্য করে ফেললে তিনি লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হয়ে অনুতাপ করে থাকেন, তখন নিষ্কাম প্রেমভাবে শরণ গ্রহণ করা শ্রদ্ধাসম্পন্ন ঈশ্বরভক্ত পরমাত্মার প্রতিকূল কোনো কর্ম কী করে করতে পারেন ? যেমন সাধ্বী, সতী, পতিব্রতা নারী তাঁর পরম প্রিয় পতির ভ্রূকুটির দিকে তাকিয়ে সদা-সর্বদা পতির অনুকূলে তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেন, তেমনই ঈশ্বরপ্রেমিক শরণাগত ভক্ত ভগবৎ-ইচ্ছাই অনুসরণ করেন এবং সবকিছু তাঁরই মনে করে তাঁর জন্যই কর্ম করে থাকেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, ঈশ্বর যখন প্রত্যক্ষরূপে দেখা দেন না তখন ঈশ্বরের আদেশ ও ইচ্ছার কথা কীভাবে জানা যায় ? তার উত্তর হল যে প্রথমতঃ শাস্ত্রের নির্দেশই একপ্রকার ঈশ্বরের আদেশ। কারণ ত্রিকালজ্ঞ ভক্ত ঋষিগণ ভগবানের অভিপ্রায় বুঝে প্রায়শঃ শাস্ত্র তৈরি করেছেন। দ্বিতীয়তঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ন্যায় গ্রন্থাদিতে ভগবদ্ আজ্ঞা প্রত্যক্ষভাবে রয়েছে। এতদ্ব্যতীত ভগবান সর্বব্যাপী ও সর্বান্তর্যামী হওয়ায় সকলের হৃদয়ে প্রত্যক্ষরূপে বিদ্যমান। মানুষ যদি স্বার্থত্যাগ করে সরল জিজ্ঞাসু হয়ে হৃদয়-

স্থিত ঈশ্বরকে প্রশ্ন করে, তবে সাধারণতঃ তার যথার্থ উত্তর পাওয়া যায়। মিথ্যা, চুরি বা হিংসা কার্য করাতে কারোর হৃদয়ই সত্যভাবে নির্দেশ দেয় না। এই হল ভগবানের ইচ্ছার সঙ্কেত।

অন্তঃকরণে অজ্ঞানের বিশেষ আবরণ থাকায় যে প্রশ্নের উত্তরে আশঙ্কাযুক্ত জবাব পাওয়া যায়, যা স্থির করতে আমাদের বুদ্ধি সক্ষম হয় না, সেই বিষয়ে স্বার্থরহিত সদাচারী ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে জিজ্ঞাসা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। যে বিষয়ে নিজ মনে কোনো প্রশ্ন থাকে না, সেই বিষয় সম্পর্কেও উত্তম ব্যক্তির কাছ থেকে পরামর্শ করে নেওয়া লাভপ্রদ হয়। কারণ মানুষ যতক্ষণ পরমাত্মাকে তত্ত্বতঃ জানতে না পারেন ততক্ষণ ভ্রমবশতঃ কোথাও কোথাও অসত্য সত্যরূপে প্রতীত হতে পারে, তাই স্থির করা বিষয়ও সৎপুরুষের পরামর্শে ঠিক করে নেওয়া উচিত। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে পরমাত্মার সঙ্কেত ঠিকভাবে বোঝা যায়। তখন সাধক যা কিছু করেন, তা সবই প্রায়শঃ ঈশ্বরের অনুকূলেই করে থাকেন।

এটি লক্ষ্য করা যায় যে প্রভুর ইচ্ছানুযায়ী চলা প্রভুভক্ত সেবক, যিনি সর্বদা প্রভুর ইশারা অনুসারে কাজ করেন, তিনি সামান্য ইঙ্গিতেই প্রভুর ইচ্ছা বুঝে যান। যখন সাধারণ মানুষের মধ্যেই এরূপ হয়ে থাকে, তখন ঈশ্বরের শরণাগত ভক্ত তাঁর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও প্রেমের শক্তিদ্বারা যে ঈশ্বরের তাৎপর্য বুঝতে পারবেন, এতে আশ্চর্যের কী আছে ?

ঈশ্বরের ইচ্ছা বোঝার আর একটি ব্যাপার আছে। এটি বুঝে নেওয়া উচিত যে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বসুহৃদ, দয়ারসাগর, সকলের আত্মা এবং সকলের হিতে রত। সুতরাং কোনো জীবের, কোনো প্রকারে, কোনো কালে অহিত বা অনিষ্ট করায় তাঁর সম্মতি থাকতে পারে না। তাই যে কার্যে যথার্থভাবে অন্যের হিত হতে পারে, সেটিই ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুকূল কাজ, আর যাতে জীবের অনিষ্ট হয়, সেসব তাঁর ইচ্ছার প্রতিকূল কাজ মনে করতে হবে।

কিছু ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ শাস্ত্র বা ধর্মের নামে অন্যের অহিত, অনিষ্ট বা হিংসা ইত্যাদিকে ধর্ম বলে মেনে নেন, কিন্তু এরূপ মানা উচিত নয়। হিংসা বা অহিত কর্ম কখনও ঈশ্বরের অভিপ্রেত হতে পারে না। অবশ্য কারো হিতের

জন্য মাতা-পিতা বা গুরু দ্বারা স্নেহভাবে নিজ সন্তান বা শিষ্যকে যেমন শাসন করা হয় তা কিন্তু যথার্থ অর্থে যাতনা বা হিংসা বলে গণ্য হয় না।

সুতরাং ভক্ত তাঁর প্রতিটি কার্যই ভগবদ্ ইচ্ছার অনুকূলেই করেন, ফলে তিনি কখনও পাপ বা নিষিদ্ধ কর্ম করতেই পারেন না। তাঁর প্রত্যেক কাজ স্বাভাবিকভাবে সরল, সাত্ত্বিক ও লোকহিতকারী হয় ; কারণ তাঁর জগতে কোনো স্বার্থ বা কোনো বস্তুতে আসক্তি থাকে না এবং কোনো কালে, কোনো কিছুতে ভয়ও থাকে না।

শরণাগত ভক্তের তো কথাই নেই, যাঁরা শুধুমাত্র ভগবানের যথার্থ অস্তিত্ব মেনে নিয়েছেন ভয় ও পাপ তাঁদেরও থাকে না। রাজা বা রাজকর্মচারী নির্জন স্থানে বা অন্ধকার রাত্রে সর্বত্র উপস্থিত থাকেন না কিন্তু রাজ্যে আইনের অস্তিত্ব থাকায় লোক প্রায়শঃই নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করতে পারে না। রাজকর্মচারী যেখানে থাকেন, সেখানে আইন ভঙ্গ করা অত্যন্ত কঠিন। রাজার অস্তিত্বের যখন এরূপ প্রতাপ, তখন সর্বশক্তিমান পরমাত্মা যিনি সব কিছু দেখেন সেখানে পাপ হবে কীকরে ? ঈশ্বর সর্বব্যাপী হওয়ায় সর্বত্র তাঁর বিরাজ করা প্রমাণিত। তাহলে ভয় কীসের ? কারণ যখন একজন রাজকর্মচারী সঙ্গে থাকলেই চোরের ভয় থাকে না, তখন রাজরাজেশ্বর ভগবান যাঁর সঙ্গে থাকেন, তাঁর ভয়ের সম্ভাবনা কীসের ? যিনি নিজেকে ভক্ত বলে পরিচয় দিয়ে পাপে আবদ্ধ থাকেন ও কথায় কথায় মৃত্যুভয় করেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের অস্তিত্বই মানেন না। যিনি ঈশ্বরকে মানেন তিনি সর্বদা নিষ্পাপ ও নির্ভয়ে থাকেন।

নিরন্তর ভগবৎ চিন্তন

শরণাগত সাধকের মনে যদি কোনো ভয় থেকে থাকে, তা হল যে তাঁর চিত্ত থেকে যেন কখনও প্রিয়তম পরমাত্মা বিস্মৃত না হয়ে যান। বাস্তবে তিনি কখনোই পরমাত্মাকে বিস্মৃত হতে পারেন না ; কারণ পরমাত্মাকে বিস্মৃত হওয়া তাঁর পক্ষে এক মুহূর্তের জন্যও সম্ভব নয় **'তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা'** (নারদভক্তিসূত্র)। সমস্ত কর্ম পরমাত্মাকে সমর্পণ করে প্রতিমুহূর্ত তাঁকে স্মরণে রাখা এবং মুহূর্তমাত্রের বিস্মৃতিতে মণিহীন সর্প বা জল ছাড়া মাছের মতো ব্যাকুল হয়ে ছট্‌ফট্ করা তাঁর স্বভাব হয়ে যায়। তাঁর

কাছে একমাত্র পরমাত্মাই তাঁর পরম জীবন, পরম ধন, পরম আশ্রয়, পরম গতি ও পরম লক্ষ্য থেকে যান, প্রতিক্ষণ তাঁর নাম-গুণ চিন্তা করা, তাঁর প্রেমে তন্ময় থাকা, বাহ্যজ্ঞান ভুলে উন্মত্ত হয়ে যাওয়া, পরম আনন্দে প্রেমে মগ্ন থাকা, এই সবই তাঁর জীবন-চর্যা হয়ে ওঠে।

ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নিবৃতাঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩।৩২)

সেই ভক্তগণ সেই অচ্যুতকে চিন্তা করে কখনও কাঁদেন, কখনও হাসেন, কখনও আনন্দিত হন, কখনও অলৌকিক কথা বলতে থাকেন, কখনও নৃত্য করেন, কখনও গান করেন, কখনও সেই অজ প্রভুর লীলাসমূহ অনুকরণ করেন আবার কখনও পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়ে শান্ত হয়ে চুপ করে থাকেন।

এইভাবে পরমাত্মার শরণের তত্ত্ব জেনে এইসব ভক্ত ভগবানের তদ্রূপ প্রাপ্ত হন—

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎ পরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥

(গীতা ৫।১৭)

'তদ্রূপ যাঁর বুদ্ধি এবং তদ্রূপ যাঁর মন এবং যিনি সেই সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতেই নিরন্তর একীভাবে অবস্থান করেন, সেই পরমেশ্বরপরায়ণ পুরুষ জ্ঞানের সাহায্যে পাপরহিত হয়ে পরমগতি লাভ করেন।' এরূপ পুরুষের জন্যই ভগবান বলেছেন যে আমি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় এবং সে-ও আমার অত্যন্ত প্রিয় '**প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ**' (গীতা ৭।১৭)। আমি তার কাছে অদৃশ্য হই না, সে-ও আমার থেকে অদৃশ্য হয় না। '**তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি**' (গীতা ৬।৩০)।

এরূপ পুরুষের শরীরের দ্বারা যা কিছু ক্রিয়া হয়, সেগুলি ক্রিয়া বলে মনে করা হয় না। আনন্দ মগ্ন ভগবানের শরণাগত সেই ভক্ত লীলাময় ভগবানের আনন্দময় লীলারই অনুকরণ করেন, তাই তাঁর কর্মও লীলামাত্রই হয়। ভগবান বলেছেন—

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥

(গীতা ৬।৩১)

'যে পুরুষ অভিন্নভাবে স্থিত হয়ে সর্বভূতে আত্মারূপে আমাকে—সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেবকে ভজনা করেন, সেই যোগী সর্বপ্রকার ব্যবহার করলেও আমাতেই অবস্থান করেন, কেননা তাঁর অনুভবে আমি ব্যতীত অন্য কিছুই নেই।'

তাই তিনি সকলের সঙ্গে নিজ আত্মার ন্যায়ই ব্যবহার করেন, তাঁর দ্বারা কখনও কারও অনিষ্ট হতে পারে না। এরূপ অভিন্নদর্শী পরমাত্মা পরায়ণ তদ্রূপ ভক্তদের মধ্যে কেউ হয়তো স্বামী শুকদেবের মতো লোক উদ্ধারের জন্য উদাসীনের মতো বিচরণ করেন, কেউ আবার অর্জুনের ন্যায় ভগবৎ-নির্দেশানুসারে আচরণ করে কর্তব্য কর্মপালনে ব্যাপৃত থাকেন, কেউ কেউ প্রাতঃস্মরণীয়া ভক্তিমতী গোপিনীদের মতো অদ্ভুত প্রেমলীলায় মত্ত থাকেন, আবার কেউ জড়ভরতের ন্যায় জড় ও উন্মত্তবৎ হয়ে থাকেন।

এরূপ শরণাগত ভক্ত নিজে তো উদ্ধাররূপ হয়েই থাকেন এবং জগতেরও উদ্ধার করেন। এইসব মহাপুরুষদের দর্শন, স্পর্শ, ভাষণ ও চিন্তা দ্বারাই মানুষ পবিত্র হয়ে ওঠে। তাঁরা যে স্থানে যান, সেইস্থানের আবহাওয়া শুদ্ধ হয়ে ওঠে, সেই স্থান পবিত্র তীর্থ হয়ে ওঠে। এরূপ পুরুষের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করা সার্থক ও ধন্য, এরূপ মহাপুরুষদের জন্যই বলা হয়েছে—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপারসংবিৎসুখসাগরেঽস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥

(স্কন্দপুরাণ.মাহে.খং.কৌ.খং. ৫৫।১৪০)

~~○~~

(৫) ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভের জন্য নাম-জপই সর্বোপরি সাধনা

নামের মহিমা বাস্তবিক সেই পুরুষ জানেন, যাঁর মন নিত্য নিরন্তর শ্রীভগবানের নামে সংলগ্ন থাকে। নামের প্রিয় ও মধুর স্মৃতিতে যাঁর ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চ ও অশ্রুপাত হয়। যিনি জলছাড়া মাছের মতো ক্ষণকালের নাম-বিহনে বিকল হয়ে ওঠেন, যে মহাপুরুষ নিমেষের জন্যও ভগবানের নাম ছাড়তে পারেন না এবং যিনি নিষ্কামভাবে নিরন্তর প্রেমপূর্বক জপ করতে করতে একাত্ম হয়ে গেছেন, সেইরূপ মহাত্মা ব্যক্তি এই বিষয় পূর্ণভাবে বর্ণনা করার অধিকারী এবং তাঁর লেখার সাহায্যেই জগতের বিশেষ লাভ হতে পারে।

যদিও আমি এক সাধারণ ব্যক্তি, সেই অপরিমিত গুণনিধান ভগবানের নামের অবর্ণনীয় মহিমা বর্ণনা করার সামর্থ্য আমার নেই, তবুও নিজ কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে আমি কিছু নিবেদন করার সাহস করেছি। সুতরাং এই লেখায় যদি কিছু ত্রুটি থাকে, তারজন্য ক্ষমা করবেন।

মহিমার দিক্‌দর্শন

ভগবদ্ নামের অপার মহিমা, সকল যুগেই এর মহিমা বিস্তারলাভ করেছে। শাস্ত্রাদি ও সাধু-মহাত্মাগণ সকল যুগের পক্ষেই মুক্তকণ্ঠে নাম-মহিমা কীর্তন করেছেন, কিন্তু কলিযুগের জন্য এর মতো মুক্তির অন্য কোনো উপায় বলা হয়নি। যেমন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

(নারদপুরাণ ১।৪১।১৫)

'কলিযুগে শুধুমাত্র শ্রীহরিণামই কল্যাণের পরম সাধন, এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ই নেই।'

কৃতে যদ্ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ॥
(ভাগবত ১২।৩।৫২)

'সত্যযুগে ভগবান বিষ্ণুর ধ্যান করলে, ত্রেতায় যজ্ঞ করলে, দ্বাপরে ভগবানের সেবা-পূজা করলে যে ফল-লাভ হয়, কলিযুগে শুধুমাত্র শ্রীহরির নাম-সঙ্কীর্তন করলে সেই ফল প্রাপ্তি হয়।'

কলিজুগ কেবল নাম অধরা। সুমিরি সুমিরি ভব উতরহু পারা।
কলিজুগ সম জুগ আন নহিঁ জৌঁ নর কর বিস্বাস।
গাই রাম গুন গন বিমল ভব তর বিনহিঁ প্রয়াস॥
রাম নাম মনিদীপ ধরু জীহ দেহরীঁ দ্বার।
তুলসী ভীতর বাহেরহুঁ জৌঁ চাহসি উজিআর॥
সকল কামনা হীন জে রাম ভগতি রস লীন।
নাম সুপ্রেম পিযূষ হ্রদ তিন্হহুঁ কিএ মন মীন॥
সবরী গীধ সুসেবকনি সুগতি দীন্হি রঘুনাথ।
নাম উধারে অমিত খল বেদ বিদিত গুন গাথ॥
রামচন্দ্র কে ভজন বিনু জো চহ পদ নির্বান।
গ্যানবন্ত অপি সো নর পসু বিনু পূঁছ বিষান॥
বারি মথেঁ ঘৃত হোই বরু সিকতা তে বরু তেল।
বিনু হরি ভজন ন ভব তরিঅ যহ সিদ্ধান্ত অপেল॥

নামু সপ্রেম জপত অনয়াসা। ভগত হোহিঁ মুদ মঙ্গল বাসা॥
নামু জপত প্রভু কীন্হ প্রসাদূ। ভগত সিরোমনি ভে প্রহলাদূ॥
সুমিরি পবনসুত পাবন নামূ। অপনে বস করি রাখে রামূ॥
অপতু অজামিলু গজু গনিকাঊ। ভএ মুকুত হরি নাম প্রভাঊ॥
চহুঁ জুগ তীনি কাল তিহুঁ লোকা। ভএ নাম জপি জীব বিসোকা॥
কহৌঁ কহাঁ লগি নাম বড়াঈ। রামু ন সকহিঁ নাম গুন গাঈ॥

নাম মহিমাতে প্রমাণের কোনো পার নেই। আমাদের শাস্ত্র এতে ভরে রয়েছে। বেশি বিস্তারিত হওয়ার ভয়ে শুধু ঐটুকুই লেখা হচ্ছে। জগতে যতো

মত-মতান্তর আছে, প্রায় সবগুলিই ঈশ্বরের নামের মহিমা স্বীকার করে এবং কীর্তন করে। অবশ্য রুচি ও ভাব অনুসারে নামগুলির মধ্যে বিভিন্নতা থাকে, কিন্তু পরমাত্মার নাম যাই হোক না কেন, সবেতেই একপ্রকার লাভ হয়ে থাকে। সুতরাং যাঁর যে নাম পছন্দ হয় তিনি ধ্যানসহ সেই নামই অভ্যাস করবেন।

আমার অনুভব

কয়েকজন বন্ধু আমাকে এই বিষয়ে কিছু লেখার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু আমি যখন বিশেষ সংখ্যায় ভগবৎ-নাম জপই করিনি তখন আমি নিজের অনুভব কী লিখব ? ভগবৎ কৃপায় যে কিছু অল্প স্বল্প নামস্মরণ করতে পেরেছি তার মাহাত্ম্যও সম্পূর্ণভাবে লেখা কঠিন।

আমি বালকাবস্থা থেকেই নামজপের অভ্যাস করতে থাকি। তাতে ক্রমশঃ আমার মনে বিষয়াকাঙ্ক্ষা কম হতে থাকে এবং পাপ থেকে দূরে আসতে খুবই সাহায্য লাভ হয়। কাম-ক্রোধ ইত্যাদি দোষও কমে যায়, অন্তরে শান্তির উদয় হয়। কখনও কখনও চক্ষু বন্ধ করলে ভগবান শ্রীরামের ভালোমত ধ্যান হচ্ছিল। জাগতিক স্ফুরণও অত্যন্ত কমে গিয়েছিল। ভোগে বৈরাগ্য এসেছিল। সেই সময় আমার বনবাস বা একান্ত স্থানে থাকা অনুকূল প্রতীত হয়।

এইভাবে ক্রমশঃ অভ্যাসের ফলে একদিন স্বপ্নে সীতাদেবীও শ্রীলক্ষ্মণসহ ভগবান শ্রীরামের দর্শনলাভ হয় এবং তাঁর সঙ্গে কথা-বার্তাও হয়। শ্রীরাম আমাকে বর প্রার্থনা করতে বলেন, কিন্তু আমার বর চাইতে ইচ্ছা হয়নি, শেষে অনেক করে বললে আমি, 'আপনার সঙ্গে যেন কখনও বিচ্ছেদ না হয়' এছাড়া আর কিছুই চাইতে পারিনি। এই সবই নামের ফল।

এছাড়া নামজপে আমার আরও বেশি লাভ হয়েছে, যার মহিমা আমি বর্ণনা করতে অক্ষম। তবে একথা অবশ্যই বলতে পারি যে নামজপে আমার যতো লাভ হয়েছে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ছাড়া অন্য কোনো সাধনার দ্বারা হয়নি।

যখনই আমাকে সাধনাচ্যুত করার জন্য কোনো বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হত, তখনই আমি প্রেমপূর্বক ভাবনাসহ নামজপ করতাম এবং তারই প্রভাবে আমি সেই বিঘ্ন থেকে মুক্তিলাভ করতাম। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সাধন-পথের বিঘ্ন নাশ করা ও মনের মধ্যে হওয়া জাগতিক স্ফুরণ নাশ করার জন্য স্বরূপ-

চিন্তা সহ প্রেমপূর্বক ভগবৎ-নাম জপ করার মতো অন্য কোনো সাধন নেই। যখন সাধারণ ভাবে ভগবৎ-নাম জপ করায় আমার এমন পরম শান্তি, এতো অপার আনন্দ ও এরূপ অনুপম লাভ হয়েছে, যার বর্ণনা করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়, তাহলে যে ব্যক্তি নিষ্কামভাবে ধ্যানসহ ভগবৎ-নাম নিত্য-নিরন্তর জপ করেন, তাঁর আনন্দের মহিমা কে বলতে পারে ?

নাম-জপ কেন করা উচিত ?

শ্রুতি বলেন—

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥

(কঠোপনিষদ্ ১।২।১৬)

এই ওঁকার অক্ষরই ব্রহ্ম। ইনিই পর ব্রহ্ম, এই ওঁকাররূপ অক্ষরকে জেনে যে ব্যক্তি যে বস্তু কামনা করেন, তিনি সেই বস্তু লাভ করেন।

শ্রুতির এই বক্তব্যানুসারে কল্পবৃক্ষরূপ ভগবদ্‌ভজনের প্রতাপে মানুষ যে বস্তু চায়, সে তাই পেতে পারে। কিন্তু আত্মার কল্যাণ কামনাকারী শুদ্ধ প্রেমিক ভক্তের নিষ্কামভাবেই ভজনা করা উচিত। শাস্ত্রাদিতে নিষ্কাম প্রেমিক ভক্তেরই বেশি প্রশংসা করা হয়েছে। ভগবানও বলেছেন—

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

(গীতা ৭।১৬-১৭)

'হে ভরতবংশশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! উত্তম কর্মকারী অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী অর্থাৎ এরূপ চারপ্রকার নিষ্কাম ভক্ত আমার ভজনা করেন। তাঁদের মধ্যেও নিত্য আমাতে একীভাবে স্থিত অনন্য প্রেমভক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী ভক্ত অতি উত্তম ; কারণ আমাকে তত্ত্বতঃ জানা জ্ঞানীর আমি অতি প্রিয় এবং সেই জ্ঞানীও আমার অতি প্রিয়।'

এইভাবে নিষ্কাম প্রেমপূর্বক হওয়া ভগবদ্‌জনের প্রভাব যে ব্যক্তি জানেন,

তিনি এক মুহূর্তের জন্যও ভগবানকে ভোলেন না এবং ভগবানও তাঁকে ভুলেন না। ভগবান নিজেও বলেছেন—

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

(গীতা ৬।৩০)

'যে ব্যক্তি সর্বভূতে সকলের আত্মরূপে বাসুদেব আমাকেই ব্যাপক দেখে এবং সর্বভূতকে বাসুদেবের (আমার) অন্তর্গত দেখে, তাঁর নিকট আমি অদৃশ্য হই না এবং সেও আমার কাছে অদৃশ্য হয় না ; কারণ সে আমাতে নিত্য স্থিত।'

সত্যকার প্রেমিক কি কখনও তাঁর প্রেমাস্পদকে ছেড়ে কখনও অন্য কাউকে মনে স্থান দিতে পারে ? যে ভাগ্যবান ব্যক্তি পরম সুখময় পরমাত্মার প্রভাব জেনে তাঁকেই নিজের একমাত্র প্রেমাস্পদ করে নেয়, সে তো সর্বক্ষণ তাঁর প্রিয় নামের স্মৃতিতে নিমজ্জিত হয়ে থাকে, সে অন্য কোনো বস্তু চায়ও না এবং সেগুলিতে বিন্দুমাত্রও সুখ মনে করে না।

সুতরাং যতক্ষণ এরূপ অবস্থা না হয়, ততক্ষণ এরূপ অভ্যাস করে যাওয়া উচিত। নাম-জপ করার সময় মন প্রেমে এতোটা মগ্ন হওয়া উচিত যে তার শরীরের কোন হুঁশও যেন না থাকে। অত্যন্ত ভীষণ সংকটাবস্থাতেও বিশুদ্ধ প্রেম-ভক্তি ও ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার ভিন্ন অন্য কোনো জাগতিক বস্তুর কামনা, আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা কখনও করা উচিত নয়।

নিষ্কামভাবে প্রেমসহ বিধিপূর্বক জপকারীসাধক অতি শীঘ্রই ভালো ফল পেতে পারেন।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে অনেকেই ভগবৎ-নাম জপ করেন, কিন্তু তাঁদের বিশেষ কোনো লাভ হয়েছে এমন দেখা যায় না, তাহলে এর উত্তরে বলা যায় যে হয়তো তাঁরা বিধিমতো জপের অভ্যাস করেননি অথবা নিজ পরমধন জপ-অভ্যাসের পরিবর্তে তুচ্ছ জাগতিক ভোগ চেয়ে নিয়েছেন, নাহলে তাঁদেরও অবশ্যই বিশেষ লাভ হত, এতে কোনোই সন্দেহ নেই।

সুতরাং কোনো ছোটবড় কামনার জন্য নাম-জপ না করে কেবলমাত্র ভগবানের বিশুদ্ধ প্রেমের লাভের জন্যই নাম-জপ করা উচিত।

নাম-জপ কীভাবে করা উচিত ?

মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। (যোগদর্শন ১।২৭)

'সেই পরমাত্মার বাচক অর্থাৎ নাম হল ওঁকার।'

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্। (যোগদর্শন ১।২৮)

'সেই পরমাত্মার নামজপ এবং তার অর্থের ভাবনা অর্থাৎ স্বরূপের চিন্তা করা।'

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ। (যোগদর্শন ১।২৯)

'উপরোক্ত সাধনদ্বারা সমস্ত বিঘ্নের বিনাশ ও পরমাত্মা প্রাপ্তি হয়।'

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে নামীর স্বরূপ চিন্তায় রেখে নামজপ করা উচিত। স্বরূপ চিন্তাযুক্ত নামজপদ্বারা অন্তরায়ের বিনাশ এবং ভগবৎ-প্রাপ্তি হয়।

যদিও নামী নামেরই অধীন। শ্রীগোস্বামী মহারাজ বলেন—

দেখিঅহিঁ রূপ নাম আধীনা। রূপ গ্যান নহিঁ নাম বিহীনা।।
সুমিরিঅ নাম রূপ বিনু দেখেঁ। আবত হৃদয়ঁ সনেহ বিসেষেঁ।।

তাই স্বরূপচিন্তা ব্যতিরেকেও শুধুমাত্র নামজপের প্রতাপেও সাধক যথাসময়ে স্বতঃই ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ পেতে পারেন, কিন্তু তাতে বিলম্ব হয়। ভগবানের মনমোহন স্বরূপ চিন্তা করতে করতে জপের অভ্যাস করলে অতি শীঘ্রই লাভ হয় ; কারণ সর্বক্ষণ চিন্তা হওয়ায় ভগবানের স্মৃতিতে ছেদ পড়ে না।

সেজন্যই ভগবান গীতায় বলেছেন—

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ।।

(গীতা ৮।৭)

'অতএব হে অর্জুন ! তুমি সর্বসময় নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো এবং যুদ্ধও করো, এইভাবে আমাতে অর্পিত মন-বুদ্ধিযুক্ত হয়ে তুমি নিঃসন্দেহে আমাকেই প্রাপ্ত হবে।' ভগবানের এই নির্দেশ অনুসারে ওঠা-বসা, খাওয়া-

দাওয়া, শয়ন-জাগরণ ও প্রতিটি জাগতিক কাজ করার সময় সাধকের নাম-জপের সঙ্গে সঙ্গে মন-বুদ্ধিদ্বারা ভগবানের স্বরূপ চিন্তা এবং এক-নিশ্চয় করতে থাকা যাতে এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর স্মৃতি থেকে বিচ্ছেদ না হয়।

এতে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে কোন্ নাম জপ করা বেশি লাভজনক ও নামের সঙ্গে ভগবানের কোন্ রূপের ধ্যান করা উচিত ? তার উত্তরে বলা যায় যে, পরমাত্মার অনেক নাম রয়েছে, তার মধ্যে সাধকের যে নামে বেশি ভক্তি ও শ্রদ্ধা, তাঁর সেই নামে জপ করলে বিশেষ লাভ হবে। তাই সাধকের নিজ রুচি অনুযায়ীই ভগবৎ নাম জপ ও স্বরূপ চিন্তা করা উচিত। অবশ্য একটি কথা বলার আছে, যে নাম জপ করা হবে, তদনুসারে স্বরূপের চিন্তা করা উচিত।

উদাহরণরূপে বলা যায়—

'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই মন্ত্রজপকারীর সর্বব্যাপী বাসুদেবের ধ্যান করা উচিত। **'ওঁ নমো নারায়ণায়'** এই মন্ত্রজপকারীর চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণু-ভগবানের ধ্যান করা উচিত। **'ওঁ নমঃ শিবায়'** মন্ত্র জপকারীর ত্রিনেত্র ভগবান শঙ্করের ধ্যান করা উচিত। শুধুমাত্র ওঁ-কার জপকারীর সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘন শুদ্ধ ব্রহ্মের চিন্তা করা উচিত। শ্রীরাম নামজপকারীর শ্রীদশরথনন্দন ভগবান শ্রীরামের স্বরূপ চিন্তা লাভপ্রদ হয়।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥

(কলিসং. ১)

এই মন্ত্র জপকারী শ্রীরাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু অথবা সর্বব্যাপী ব্রহ্ম ইত্যাদি রূপের মধ্যে নিজ ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী যে কোনো রূপের ধ্যান করতে পারেন, কারণ এইসব নাম সকল রূপেই বাচক হতে পারে।

এই উদাহরণে এটাই বুঝতে হবে যে সাধক গুরুর কাছ থেকে যে নাম-রূপের উপদেশ পেয়েছেন, যে নাম ও যে রূপে তাঁর শ্রদ্ধা-প্রেম ও বিশ্বাসের আধিক্য থাকে এবং অনুকূল বলে মনে হয়, তাঁর সেই নাম-রূপের জপ-ধ্যানেই বেশি লাভ হতে পারে।

কিন্তু নাম-জপের সঙ্গে ধ্যান করা আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে নামের সঙ্গে

নামীর স্মৃতি থাকা অনিবার্য। মানুষ যেসব বস্তুর নাম উচ্চারণ করে, সেসব বস্তুর স্মৃতি অবশ্যই একবার তার মনে আসে আর স্মৃতি যেমন হয়, সেই অনুসারে তার ভালো-মন্দ পরিণামও অবশ্যই হয়। কোনো মানুষ যেমন কামের বশীভূত হয়ে যখন কোনো নারীকে স্মরণ করে, তখন সেই স্মৃতির সঙ্গেই তার শরীরে কাম জাগরিত হয়ে বীর্যপাতের মতো অঘটন ঘটায়। এইরূপ বীর-রস এবং করুণ-রস প্রধান বৃত্তান্তের স্মৃতি অনুযায়ীই মানুষের বৃত্তি ও তার ভাব জন্মায়। সাধু-পুরুষকে স্মরণ করলে মনে শ্রেষ্ঠ ভাব জাগ্রত হয় এবং দুরাচারের স্মৃতিতে মন্দভাবের আবির্ভাব হয়। লৌকিক স্মরণের যখন এইরূপ অনিবার্য পরিণাম হয় তখন পরমাত্মার স্মরণে পরমাত্মার ভাব ও গুণাদি যে অন্তঃকরণে আবির্ভূত হবে, এতে আর সন্দেহ কী ?

সুতরাং সাধকের ভগবানের প্রেমে বিহ্বল হয়ে নিষ্কামভাবে নিত্য-নিরন্তর দিন-রাত কর্তব্য-কর্ম করা কালেও ধ্যান সহকারে শ্রীভগবৎ-নামজপের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত।

সৎসঙ্গের সাহায্যেই নাম-জপে শ্রদ্ধা হয়

নামের এতো মহিমা হলেও প্রেম ও ধ্যানযুক্ত ভগবৎ-নামে লোক কেন প্রবৃত্ত হয় না ? তার উত্তর হল যে ভগবৎ-ভজনের প্রকৃত মর্ম জানতে পারেন তিনিই, যাঁর ওপর ভগবানের পূর্ণ দয়া হয়।

যদিও ভগবানের দয়া সর্বদাই সবার ওপর সমান ভাবে আছে, কিন্তু মানুষ যতক্ষণ তাঁর অপার দয়া চিনতে না পারে, ততক্ষণ তার সেই দয়াতে লাভ হয় না। যেমন কারো ঘরে ধন প্রোথিত আছে, কিন্তু যতোক্ষণ সে তা জানতে না পারে, ততোক্ষণ সেই ধনে তার কোনো লাভ হয় না। কিন্তু যখন কোনো সন্ধানপ্রাপ্ত লোকের দ্বারা সে জেনে যায় এবং সে পরিশ্রম করে তা উদ্ধার করে এবং তার লাভ হয়। তেমনই ভগবানের প্রভাব সম্পর্কে অবহিত পুরুষের সঙ্গ করলে মানুষ ভগবানের নিত্য দয়ার কথা জানতে পারে। দয়ার জ্ঞান হলে ভজনের মর্ম বুঝতে পারে, তখন তার ভজনে প্রবৃত্তি হয় এবং সদা-সর্বদা ভজনের অভ্যাসের সাহায্যে তার সমস্ত সঞ্চিত পাপ সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং পরমাত্মাপ্রাপ্তিরূপ পূর্ণলাভ প্রাপ্ত হয়।

নামে পাপনাশের স্বাভাবিক শক্তি রয়েছে

যদি কেউ এখানে আশঙ্কা করেন যে, ভগবান যদি শুধু ভজনকারীদের পাপ নাশ করে দেন বা তাঁদের ক্ষমা করে দেন, তবে কি তাঁদের মধ্যে বৈষম্য দোষ আসে না ? তার উত্তরে বলা যায় যে, অগ্নিতে যেমন জ্বালবার (পোড়াবার) ও আলো প্রকাশের স্বাভাবিক শক্তি থাকে, তেমনই ভগবানেরও পাপবিনাশ করার স্বাভাবিক শক্তি আছে। তাই ভগবান গীতায় বলেছেন—

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

(৯।২৯)

'সর্বভূতে আমি সমভাবে অবস্থিত, আমার কেউ অপ্রিয় নয়, কেউ প্রিয় নয়। কিন্তু যে ভক্ত আমাকে প্রেমভরে ভজনা করেন, তিনি আমাতে এবং আমি তাঁতে প্রত্যক্ষ অনুভূত হই।'

এতে এই বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে শীতে কষ্ট পাওয়া বহু ব্যক্তির মধ্যে যে ব্যক্তি অগ্নির কাছে গিয়ে তার তাপ গ্রহণ করেন, অগ্নি তাঁর শীত নিবারণ করে এবং তার কষ্ট দূর করে, কিন্তু যিনি অগ্নির সমীপে যান না তার কষ্ট (শীত) দূর হয় না। এতে অগ্নির কোনো বৈষম্য দোষ থাকে না, কারণ অগ্নি সকলকেই তাপদান করে কষ্ট নিবারণ করতে সর্বদা প্রস্তুত। কেউ যদি অগ্নির সন্নিকটে না যায়, তাহলে অগ্নি কী করবে ? এইরূপই যে ব্যক্তি ভগবদ্-ভজন করেন, তাঁর অন্তঃকরণ শুদ্ধ করে ভগবান তাঁর দুঃখ সর্বতোভাবে নাশ করে তাঁর কল্যাণ করেন। তাই ভগবানের কোনো বৈষম্য দোষ থাকে না।

নাম-ভজনা দ্বারাই জ্ঞান হয়ে যায়

জিজ্ঞাসা— একথা মেনে নেওয়া যায় যে ভগবদ্ নামে পাপ বিনাশ হয়, কিন্তু তার দ্বারা পরমপদ-প্রাপ্তি কীভাবে সম্ভব ? কারণ পরমপদ প্রাপ্তি তো কেবল জ্ঞানের সাহায্যেই হয়।

উত্তর—সেকথা ঠিক। জ্ঞানের দ্বারাই পরমপদ প্রাপ্তি হয়। কিন্তু শ্রদ্ধা, প্রেম

ও বিশ্বাস সহকারে নিষ্কামভাবে ভগবৎ ভজনের প্রভাবে ভগবান তাঁকে সেই জ্ঞান প্রদান করেন, যার সাহায্যে তাঁর ভগবৎ-স্বরূপের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় এবং তার দ্বারা সাধক অবশ্যই পরমপদ লাভ করেন।

ভগবান বলেছেন—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপয়ান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥

(গীতা ১০।৯-১১)

'সর্বদা আমাতে মননিবিষ্টকারী, আমাতেই প্রাণ অর্পণকারী ভক্তগণ সর্বদা আমার ভক্তির আলোচনার দ্বারা নিজেদের মধ্যে আমার প্রভাব জানিয়ে এবং গুণ ও প্রভাবসহ আমার কথা বলে সন্তুষ্ট হন এবং বাসুদেবকে আমাকে সর্বদা স্মরণ ও আমাতেই রমণ করেন। সেই সর্বদা আমার ধ্যানে ব্যাপৃত এবং প্রেমপূর্বক আমাকে ভজনাকারী ভক্তদের আমি সেই তত্ত্বজ্ঞানরূপ যোগপ্রদান করি, যাতে তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন। তাঁদের অনুগ্রহ করার জন্যই আমি একীভাবে অবস্থিত তাঁদের হৃদয়ে অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন অন্ধকারকে প্রকাশময় তত্ত্বজ্ঞানরূপ প্রদীপের সাহায্যে বিনাশ করে থাকি।'

সুতরাং সর্বদা প্রেমপূর্বক নিষ্কাম নামজপ ও স্বরূপ চিন্তাদ্বারা স্বতঃই জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং এই জ্ঞানের দ্বারা সাধক সত্বর পরমপদ লাভ করেন।

নাম উপেক্ষা করা উচিত নয়

কিছু ব্যক্তি নামজপের মহত্ত্ব না বুঝে তার নিন্দা করে থাকেন, তাঁরা বলেন যে—'রাম-রাম' জপ করা এবং অন্য কথা বলা (বক্ বক্) একই সমান। তার সঙ্গে এই কথাও বলেন যে, নাম-জপের বাহানায় লোকে আলস্যে নিজের জীবন নষ্ট করে। এইরূপ আরও নানাকথা তারা বলে থাকেন।

এরূপ ব্যক্তিদের কাছে আমার অনুরোধ যে, পরীক্ষা না করে এইভাবে

নাম-জপের নিন্দা করে জপ-কারীদের হৃদয়ে অশ্রদ্ধা উৎপন্ন করার মন্দ চেষ্টা না করাই উচিত, বরং কিছুদিন নাম-জপ করে তাঁরা দেখুন যে এতে কী লাভ হয় ! বৃথা নিন্দা বা উপেক্ষা করে পাপভাগী হওয়া উচিত নয়।

নাম-জপে প্রমাদ ও আলস্য করা উচিত নয়

অনেক লোক নামজপ ও ভজনকে ভালো মনে করলেও প্রমাদ ও আলস্যবশতঃ ভজন করেন না। এ তাঁদের মস্ত ভুল। এইরূপ দুর্লভ ও ক্ষণভঙ্গুর মানব-জীবন লাভ করে যিনি ভজনে আলস্য করেন, তাঁকে কী বলা যায় ? জীবনের সদ্ব্যবহার ভজনের দ্বারাই হয়। এখন যদি ভ্রমবশতঃ এই অমূল্য সময় নষ্ট হয় তাহলে পরে অনুতাপ করা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। কবীর বলেছেন—

মরোগে মরি জাওগে, কোঈ ন লেগা নাম।
উজড় জায় বসাওগে, ছাড়ি বসন্তা গাম॥
আজকালকী পাঁচ দিন, জঙ্গল হোগা বাস।
উপর উপর হল ফিরৈ, ঢোর চরেঁঙ্গে ঘাস॥
আজ কহে মৈঁ কাল ভজূঁ, কাল কহে ফির কাল।
আজকালকে করত হী, ঔসর জাসী চাল॥
কাল ভজন্তা আজ ভজ, আজ ভজন্তা অব।
পলমেঁ পবলয় হোয়গী, ফের ভজেগা কব॥

সেজন্য আলস্য ও প্রমাদ পরিত্যাগ করে যে কোনো প্রকারেই হোক উঠতে, বসতে, শুতে এবং সমস্ত কর্তব্যকর্ম করতে করতে সদা-সর্বদা ভজন করার অভ্যাস অবশ্যই করা উচিত।

'মা' শিশুকে ভোলানোর জন্য তাকে নানাপ্রকার খেলনা দিয়ে থাকেন, কিছু খাবার তার হাতে দেন, যাতে শিশু সেইসব পদার্থে ভুলে গিয়ে 'মা'র জন্য কান্নাকাটি না করে। 'মা'ও তখন তাকে ছেড়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে যান। কিন্তু যে শিশু কোনো কিছুতেই না ভুলে শুধু 'মা-মা' করে কাঁদতে থাকে, তখন 'মা' তাকে কোলে নিতে বাধ্য হন। এরূপ জেদি শিশুর জন্য গৃহের সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজ ছেড়েও মাকে শীঘ্র এসে তাকে বুকে করে ভোলাতে

হয়, কারণ 'মা' জানেন যে এই শিশু আমাকে ছাড়া আর কিছুই চায় না।

ভগবানও এইভাবে ভক্তের পরীক্ষার জন্য তার ইচ্ছানুযায়ী তাকে নানা বিষয়ের প্রলোভন দিয়ে ভোলাতে চান। যে তাতে ভুলে যায় সে ঐ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়, কিন্তু যে ভাগ্যবান ভক্ত জগতের সমস্ত পদার্থকে তুচ্ছ, ক্ষণিক এবং বিনাশশীল মনে করে সেগুলিকে অগ্রাহ্য করেন এবং প্রেমে মগ্ন হয়ে সত্য মনে সেই সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আকুল হয়ে ক্রন্দন করেন, এইরূপ ভক্তের জন্য ভগবান সমস্ত কিছু ত্যাগ করে শীঘ্রই স্বয়ং চলে আসেন।

মহাত্মা কবীর বলেছেন—

কেশব কেশব কূকিয়ে, ন কূকিয়ে অসার।
রাত দিবসকে কূকতে, কভী তো সুনেঁ পুকার॥
রাম নাম রটতে রহো, জবলগ ঘটমেঁ প্রান।
কবহুঁ তো দীনদয়ালকে, ভনক পরেগী কান॥

তাই জগতের সমস্ত বিষয়কে বিষ মাখানো মিষ্টান্ন মনে করে তার থেকে মন সরিয়ে শ্রীপরমাত্মার পবিত্র নাম-জপেই ব্যাপৃত হওয়া পরম কর্তব্য। যিনি পরমাত্মার নাম-জপ করেন, দয়ালু পরমাত্মা তাঁকে শীঘ্রই ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেন।

যদি এমন বলা যায় যে ঈশ্বর তো ন্যায়পরায়ণ, তাহলে শুধুমাত্র ভজনাকারীরই পাপ বিনাশ করে তাকে পরমগতি প্রদান করেন, তাহলে তাঁকে দয়ালু বলা হবে কেন ?

এই কথা যুক্তিপূর্ণ নয়। জগতের বড় বড় রাজা-মহারাজা তাঁদের অনুগতদের নানা প্রকার জাগতিক ধন-সম্পদ দিয়ে সন্তুষ্ট করেন, কিন্তু ভগবান তেমন নন। তাঁর নিয়ম হল তাঁকে যিনি যেভাবে ভজনা করেন, তিনিও তাঁকে সেইভাবে ভজনা করেন।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। (গীতা ৪।১১)

পরমাত্মা ছোট বড় বলে খেয়াল রাখেন না। এক অতি নগণ্য ব্যক্তি পরমাত্মাকে যেভাবে ভজন-পূজন করেন, যে আচরণ করেন, তিনিও সেই

ব্যক্তিকে তেমনভাবেই দেখেন এবং সেইরূপ আচরণই করে থাকেন। কেউ যদি পরমাত্মার জন্য কেঁদে আকুল হয়, তাহলে তিনিও তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সেইভাবে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। এ তাঁর অপার দয়া !

সুতরাং এই অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর, বিনাশশীল জগতের সমস্ত অসার, মিথ্যা ভোগ ত্যাগ করে সেই সর্বশক্তিমান ন্যায়পরায়ণ শুদ্ধ, পরম দয়ালু সত্যকার প্রেমিক পরমাত্মার পবিত্র নাম নিষ্কাম প্রেমভরে ধ্যানের সঙ্গে সদা-সর্বদা জপ করতে থাকা উচিত।

জগতের সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারের জন্য নামজপ করাই হল সর্বোপরি যুক্তিসঙ্গত সাধন।

~~○~~

(৬) ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ হতে পারে

বহু সজ্জন ব্যক্তি মনে আশঙ্কা নিয়ে এইরূপ প্রশ্ন করে থাকেন যে, দুজন প্রিয় বন্ধু যেমন নিজেরা মিলিত হন, এই কলিকালে তেমনভাবে কি ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ সম্ভব ? যদি তা সম্ভব হয় তাহলে কী সেই উপায় যার সাহায্যে আমরা তাঁর মনোমোহিনী মূর্তির শীঘ্রই দর্শন লাভ করতে পারি ? সেই সঙ্গে এটিও জানতে চায় যে বর্তমানে এমন কোনো পুরুষ কী জগতে আছেন, যিনি উপযুক্তভাবে ভগবৎদর্শন লাভ করেছেন ?

এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর তো বাস্তবে সেই মহান পুরুষই দিতে সক্ষম, যিনি ভগবানের সেই মনোমোহিনী মূর্তির সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেছেন।

যদিও আমি এক সাধারণ মানুষ, তবুও পরমাত্মা এবং মহাপুরুষদের দয়ায় কেবল নিজের মনের বিনোদের (সন্তুষ্টির) জন্য তিনটি প্রশ্নের বিষয়ে ক্রমান্বয়ে কিছু লেখার সাহস করছি।

১) যেভাবে সত্যযুগ ইত্যাদিতে ধ্রুব, প্রহ্লাদ আদির সাক্ষাৎ দর্শনের প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনই কলিযুগেও সূরদাস, তুলসীদাস আদি বহুভক্তের প্রত্যক্ষ

দর্শনের ইতিহাস জানা যায়, এমনকি বিষ্ণুপুরাণে তো সত্যযুগের থেকে কলিযুগে ভগবৎ দর্শন লাভ অত্যন্ত সুগম বলে জানানো হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও বলা হয়েছে—

কৃতে যদ্ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

(১২।৩।৫২)

'সত্যযুগে সর্বদা বিষ্ণুর ধ্যান করলে, ত্রেতায় যজ্ঞ দ্বারা যজনা করলে এবং দ্বাপরে পূজা (উপাসনা) করলে যে পরমগতি প্রাপ্তি হয়, কলিযুগে শুধুমাত্র নাম-কীর্তনেই তা পাওয়া যায়।'

অরণী কাষ্ঠে ঘর্ষণ করলে যেমন আগুন জ্বলে ওঠে, তেমনই সত্য প্রেমপূর্ণ হৃদয় মন্থন করলে অর্থাৎ ভগবানের প্রেমময় নামোচ্চারণের গম্ভীর ধ্বনির প্রভাবে ভগবান স্বয়ং উপস্থিত হন। মহর্ষি পতঞ্জলিও যোগদর্শনে বলেছেন—

'স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসংপ্রয়োগঃ।' (২।৪৪)

'নামোচ্চারণ দ্বারা ইষ্টদেব পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হয়।'

যেভাবে সত্যসঙ্কল্পপূর্ণ যোগী যে বস্তুর জন্য সঙ্কল্প করেন, সেই বস্তুই তার সম্মুখে প্রত্যক্ষ উপস্থিত হয়, তেমনই শুদ্ধ অন্তঃকরণযুক্ত অনন্য প্রেমিক ভক্ত যখন ভগবানের প্রেমে মগ্ন হয়ে ভগবানের কোনো প্রেমপূর্ণ মূর্তি দর্শনের জন্য আকুল হন, ভগবান তখনই সেইরূপে উপস্থিত হন। গীতার একাদশ অধ্যায়ের ৫৪ শ্লোকে ভগবান বলেছেন—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥

'হে শ্রেষ্ঠ তপযুক্ত অর্জুন! অনন্য ভক্তিদ্বারা এই প্রকার (চতুর্ভুজ) রূপ সম্পন্ন আমার প্রত্যক্ষ দর্শন, তত্ত্ব জানা ও প্রবেশ অর্থাৎ একীভাবে প্রাপ্ত হতে আমি শক্য হই অর্থাৎ আমাকে পাওয়া সম্ভব।'

একজন প্রেমিক ব্যক্তি যদি তাঁর অন্য প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক হন এবং সেই অন্য প্রেমিক তা জানতে পারেন তাহলে

তিনি মিলিত না হয়ে থাকতে পারেন না, তাহলে এটা কীভাবে সম্ভব যে যাঁর মতো প্রেমের বিষয় আর কেউ জানে না, সেই প্রেমমূর্তি পরমেশ্বর স্বয়ং তাঁর প্রেমিক ভক্তের সঙ্গে মিলিত না হয়ে থাকতে পারবেন ?

তাই একথাই প্রমাণিত হয় যে, প্রেমমূর্তি পরমেশ্বর সর্বকালে ও সর্বদেশে সব মানুষকেই ভক্তি পরবশ হয়ে অবশ্যই প্রত্যক্ষ দর্শন দান করেন।

২) ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার অনেক উপায়ের মধ্যে সর্বোত্তম উপায় হল 'সত্যকারের বিশুদ্ধ প্রেম'। শাস্ত্রকারগণ একেই বলেছেন অব্যাভিচারিণী ভক্তি, ভগবানে অনুরক্তি, প্রেমাভক্তি ও বিশুদ্ধ ভক্তি ইত্যাদি।

যখন সৎসঙ্গ, ভজন, চিন্তন, নির্মলতা, বৈরাগ্য, উপরতি, প্রবল ইচ্ছা ও পরমেশ্বর বিষয়ক ব্যাকুলতা ক্রমান্বয়ে হতে থাকে তখন ভগবানে বিশুদ্ধ প্রেম হয়ে থাকে।

এই ব্যাপারে দুঃখ হয় যে, বহু মানুষ ভগবানের অস্তিত্বই বিশ্বাস করেন না। কিছু ব্যক্তি বিশ্বাস করলেও তাঁরা ক্ষণভঙ্গুর বিনাশশীল বিষয়াদির মিথ্যা সুখে লিপ্ত থাকায় এই প্রাণপ্রিয়র সঙ্গে মিলিত হওয়ার গুরুত্ব জানেনই না। যদি কেউ কিছু শুনে বা বিশ্বাস করে তাঁর প্রভাব কিছু জেনেও যান, তাহলে সামান্য চেষ্টা করেই সন্তুষ্ট থাকেন অথবা অল্প সাধনা করেই নিরাশ হয়ে যান। বস্তু-উপার্জন করার মতোও পরিশ্রম করেন না।

অনেকে বলে থাকেন যে, আমরা বহু চেষ্টা করেছি কিন্তু প্রাণপ্রিয় পরমেশ্বরের দর্শন হয়নি। তাঁদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে তোমরা ফাঁসীর মামলা থেকে মুক্তি পাওয়ার মতো কখনও জন্ম-মৃত্যু-রূপ ফাঁসীর থেকে মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করেছ কি ? কলুষিত, নিন্দনীয় কামবশীভূত হয়ে মেয়েমানুষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার চেষ্টার মতো ভগবানের দর্শনলাভের জন্য চেষ্টা করেছ কি ? যদি না করে থাক, তাহলে ভগবানকে পাওয়া যায় না, একথা বলা সর্বতোভাবে বৃথা।

যে ব্যক্তি শরশয্যায় শয়ন করে পিতামহ ভীষ্মের ন্যায় ভগবানের ধ্যানে মত্ত হয়ে থাকেন, ভগবানও তাঁর ধ্যানে তাঁরই মতো মগ্ন থাকেন। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকেও ভগবান বলেছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

'হে অর্জুন ! যে ব্যক্তি আমাকে যেভাবে ভজনা করেন, আমিও তাঁকে সেইভাবেই ভজনা করি।'

সর্বদা ভগবানের নাম উচ্চারণের প্রভাবে যখন ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চ থাকে, তখন তাঁর সমস্ত পাপনাশ হয়ে ভগবান ব্যতীত আর কোনো বস্তুই তাঁর প্রিয় লাগে না। বিরহ-বেদনায় অত্যন্ত ব্যাকুল হওয়ায় চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে এবং তিনি যখন ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্যে মত্ত না হয়ে গোপিনীদের ন্যায় পাগলের মতো বিচরণ করেন এবং জলবিহীন মাছের মতো ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, তখন আনন্দকন্দ প্রিয় শ্যামসুন্দরের মোহিনী মূর্তির দর্শন লাভ হয়। এই হল ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সত্যকার উপায়।

যদি কারো ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সত্যই ইচ্ছা হয়, তাহলে তাঁকে রুক্মিণী, সীতা ও বজ্রবালাদের মতো প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ক্রন্দন করতে হবে।

৩) যদিও বর্তমানে কলিকালে এইরূপ ব্যক্তি দেখা যায় না, যিনি উপরিউক্ত প্রকারে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেছেন, তবুও একেবারেই কেউ নেই, এটিও সম্ভব নয় ; কারণ প্রহ্লাদের ন্যায় হাজার-হাজারের মধ্যে কোনো একজন কারণবিশেষে লোকপ্রসিদ্ধি লাভ করেন, নাহলে এই সব ব্যক্তি এই বিষয় বিখ্যাত করার জন্য নিজেদের কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না।

যদি বলা হয় যে, জগতের মঙ্গলের জন্য সকলকে এই বিষয় জানানো উচিত ; তবে এতে একটি কথা বলার আছে। আসলে এরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত শ্রোতা পাওয়াও কঠিন এবং অপাত্রে বিশ্বাস হওয়াও কঠিন। পাত্র ব্যতীতই যদি একথা বলতে শুরু করা হয় তাহলে এর কোনো মূল্যই থাকে না এবং কেউ তা বিশ্বাসও করবে না।

সুতরাং আমাদের বিশ্বাস করা উচিত যে এমন পুরুষ জগতে অবশ্যই আছেন, যিনি উপরোক্ত প্রকারে দর্শনলাভ করেছেন। কিন্তু আমাদের অশ্রদ্ধার

জন্যই আমরা তাঁকে পাই না। বিশ্বাস না করার থেকে বিশ্বাস করাই সকলের পক্ষে লাভদায়ক। কারণ ভগবানে বিশুদ্ধ প্রেম হওয়াতে এবং দুই বন্ধুর মতো ভগবানের মনোমোহিনী মূর্তির প্রত্যক্ষ দর্শন পাওয়াতে বিশ্বাসই হল মূল কারণ।

~~○~~

(৭) ভগবৎ-দর্শনের প্রত্যক্ষ উপায়

আনন্দময় ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভের সর্বোত্তম উপায় হল 'খাঁটি প্রেম'। সেই প্রেম কীরূপ হওয়া উচিত এবং কীরূপ প্রেমে ভগবান উপস্থিত হয়ে প্রত্যক্ষ দর্শন দিতে পারেন ? এই বিষয়ে আপনাদের কিছু নিবেদন করা হচ্ছে।

বহু বিঘ্ন উপস্থিত হলেও ধ্রুবের মতো ভগবানের ধ্যানে একনিষ্ঠভাবে থাকলে ভগবান প্রত্যক্ষ দর্শন দিতে পারেন।

ভক্ত প্রহ্লাদের মতো আনন্দসহকারে সর্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করে রাম-নাম করতে থাকলে এবং তীক্ষ্ণ তলোয়ারে মাথা কাটানোর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকলে ভগবান প্রত্যক্ষ দর্শন দিতে পারেন।

শ্রীলক্ষ্মণের মতো কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করে ভগবানের জন্য বনগমন করলে ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যায়।

ঋষিকুমার সুতীক্ষ্ণর ন্যায় প্রেমোন্মত্ত হয়ে বিচরণ করলে ভগবানকে পাওয়া সম্ভব।

শ্রীরামের শুভাগমনের সুসংবাদে সুতীক্ষ্ণর কীরূপ বিশেষ দশা হয়েছিল, তার বর্ণনা শ্রীতুলসীদাস অত্যন্ত প্রভাবপূর্ণ বাক্যে করেছেন। ভগবান শিব উমাদেবীকে বলেছেন—

হোইহৈঁ সুফল আজু মম লোচন।
দেখি বদন পঙ্কজ ভব মোচন॥

নির্ভর প্রেম মগন মুনি গ্যানী।
কহি ন জাই সো দসা ভবানী॥
দিসি অরু বিদিসি পন্থ নহিঁ সূঝা।
কো মৈঁ চলেউঁ কহাঁ নহি বূঝা॥
কবহুঁক ফিরি পাছেঁ পুনি জাঈ।
কবহুঁক নৃত্য করই গুন গাঈ॥
অবিরল প্রেম ভগতি মুনি পাঈ।
প্রভু দেখৈঁ তরু ওট লুকাঈ॥
অতিসয় প্রীতি দেখি রঘুবীরা।
প্রগটে হৃদয়ঁ হরন ভব ভীরা॥
মুনি মগ মাঝ অচল হোই বৈসা।
পুলক সরীর পনস ফল জৈসা॥
তব রঘুনাথ নিকট চলি আএ।
দেখি দসা নিজ জন মন ভাএ॥
রাম সুসাহেব সন্ত প্রিয় সেবক দুখ দারিদ দবন।
মুনি সন প্রভু কহ আই উঠু উঠু দ্বিজ মম প্রান সম॥

শ্রীহনুমানের মতো প্রেমে বিহ্বল হয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ভগবানের শরণ গ্রহণ করলে তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া সম্ভব।

কুমার ভরতের ন্যায় রাম-দর্শনের জন্য প্রেমে বিহ্বল হলে ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যেতে পারে। চতুর্দশ বর্ষ পূর্ণ হওয়া কালে প্রেমমূর্তি ভরতের কী ভীষণ অবস্থা হয়েছিল, শ্রীতুলসীদাস তার সুন্দর বর্ণনা করেছেন—

রহেউ এক দিন অবধি অধারা।
সমুঝত মন দুখ ভয়উ অপারা॥
কারন কবন নাথ নহিঁ আয়উ।
জানি কুটিল কিধৌঁ মোহি বিসরায়উ॥

অহহ ধন্য লছিমন বড়ভাগী।
রাম পদারবিন্দু অনুরাগী॥
কপটী কুটিল মোহি প্রভু চীন্হা।
তাতে নাথ সঙ্গ নহিঁ লীন্হা॥
জৌঁ করনী সমুঝৈ প্রভু মোরী।
নহিঁ নিস্তার কলপ সত কোরী॥
জন অবগুন প্রভু মান ন কাউ।
দীন বন্ধু অতি মৃদুল সুভাউ॥
মোরে জিয়ঁ ভরোস দৃঢ় সোঈ।
মলিহহিঁ রাম সগুন সুভ হোঈ॥
বীতেঁ অবধি রহহিঁ জৌঁ প্রানা।
অধম কবন জগ মোহি সমানা॥
রাম বিরহ সাগর মহঁ ভরত মগন মন হোত।
বিপ্র রূপ ধরি পবন সুত আই গয়উ জনু পোত॥
বৈঠে দেখি কুসাসন জটা মুকুট কৃস গাত।
রাম রাম রঘুপতি জপত স্রবত নয়ন জলজাত॥

হনুমানের সঙ্গে কথাবার্তা হওয়ার পর শ্রীরামের সঙ্গে ভরত মিলনের সময়ের বর্ণনা এইরূপ। শ্রীশিব মহারাজ দেবী পার্বতীকে বলেছেন—

রাজীব লোচন স্রবত জল তন ললিত পুলকাবলি বনী।
অতি প্রেম হৃদয়ঁ লগাই অনুজহি মিলে প্রভু ত্রিভুঅন ধনী॥
প্রভু মিলত অনুজহি সোহ মো পহিঁ জাতি নহিঁ উপমা কহী।
জনু প্রেম অরু সিঙ্গার তনু ধরি মিলে বর সুষমা লহী॥
বূঝত কৃপানিধি কুসল ভরতহি বচন বেগি ন আবঈ।
সুনু সিবা সো সুখ বচন মন তে ভিন্ন জান জো পাবঈ॥
অব কুসল কোমলনাথ আরত জানি জন দরসন দিয়ো।
বূড়ত বিরহ বারীস কৃপানিধান মোহি কর গহিঁ লিয়ো॥

মান-প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করে শ্রীঅক্রূরের মতো ভগবানের চরণকমল রজে ভূলুণ্ঠিত হলে ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া সম্ভব।

পদানি তস্যাখিললোকপালকিরীটজুষ্টামলপাদরেণোঃ।
দদর্শ গোষ্ঠে ক্ষিতিকৌতুকানি বিলক্ষিতান্যব্জয়বাঙ্কুশাদ্যৈঃ॥
তদ্দর্শনাহ্লাদবিবৃদ্ধসম্ভ্রমঃ প্রেম্ণোর্ধ্বরোমাশ্রুকলাকুলেক্ষণঃ।
রথাদবস্কন্দ্য স তেম্বচেষ্টত প্রভোরমূন্যঙ্ঘ্রিরজাংস্যহো ইতি॥
দেহংভৃতামিয়ানর্থো হিত্বা দম্ভং ভিয়ং শুচম্।
সন্দেশাদ্যো হরের্লিঙ্গদর্শনশ্রবণাদিভিঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩৮।২৫-২৭)

যাঁর শ্রীচরণের পরম পবিত্র রজকে সমস্ত লোকপালগণ অত্যন্ত সমাদরে মস্তকে ধারণ করেন, সেই পৃথিবীর অলঙ্কাররূপ পদ্ম, যব, অঙ্কুশ ইত্যাদি অপূর্ব রেখাদি দ্বারা অঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণের সেই চরণচিহ্ন শ্রীঅক্রূর গোকুলে প্রবেশ করার সময় দেখেছিলেন।

তাই দেখে তিনি আনন্দে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, প্রেমে শরীরে রোমাঞ্চ হতে থাকল, চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হল। আহা ! এ হল প্রভুর চরণের ধূলি, এই বলে রথ থেকে নেমে তিনি সেখানে ধুলায় গড়াতে লাগলেন।

দেহধারীদের একমাত্র প্রয়োজন হল গুরুর উপদেশ মতো নির্দম্ভ, নির্ভয় এবং বিগতশোক হয়ে ভগবানের মনোহর মূর্তি দর্শন ও গুণাদি শ্রবণ করে অক্রূরের মতো হরিভক্তি করা।

গোপীদের প্রেম দেখে জ্ঞান ও যোগের অহং-অভিমান ত্যাগকারী উদ্ধবের মতো প্রেমবিহ্বল হলে ভগবানকে প্রাপ্ত করা সম্ভব।

একটি মুহূর্তকে প্রলয়ের মতো অতিবাহিতকারী রুক্মিণীর মতো শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় অন্তর দিয়ে বিলাপ করলে ভগবান প্রত্যক্ষভাবে দর্শন দিতে পারেন।

মহাত্মাদের নির্দেশ পালনে তৎপর রাজা ময়ূরধ্বজের মতো প্রয়োজন হলে নিজ পুত্রের মস্তক কাটতেও দ্বিধাবোধ না থাকা প্রেমিক ভক্তকে ভগবান প্রত্যক্ষ দর্শন দান করতে পারেন।

শ্রীনরসী মেহতার ন্যায় লাজ-লজ্জা, মান, মর্যাদা, ভয় ত্যাগ করে ভগবানের গুণ-গানে মগ্ন হয়ে বিচরণ করলে ভগবান প্রত্যক্ষ হতে পারেন।

'বি-এ', 'এম-এ', 'আচার্য' ইত্যাদি পরীক্ষার জায়গায় ভক্ত প্রহ্লাদের মতো নবধা ভক্তির[১] প্রকৃত পরীক্ষা দিলে ভগবান প্রত্যক্ষ দর্শন দান করতে পারেন।

ভগবান শুধু দর্শনই দেন না, বরং দ্রৌপদী, গজেন্দ্র, বিদুর ইত্যাদি ভক্তের প্রেমপূর্বক অর্পণ করা বস্তুও স্বয়ং উপস্থিত হয়ে গ্রহণ করেন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রয়চ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রয়তাত্মনঃ॥

(গীতা ৯।২৬)

পত্র-পুষ্প-ফল-জল ইত্যাদি যা কিছু ভক্ত আমাকে প্রেমসহকারে সমর্পণ করে, সেই শুদ্ধবুদ্ধি নিষ্কাম প্রেমিক ভক্তের প্রেমপূর্বক অর্পণ করা বস্তুসমূহ আমি সগুণরূপে দৃশ্যমান হয়ে প্রীতিসহ গ্রহণ করি। অতএব সকলের উচিত পরম প্রেম এবং আগ্রহ সহকারে ভগবদ্দর্শনের জন্য ব্যাকুল হওয়া।

~~○~~

(৮) অনন্য প্রেমই হল ভক্তি

অনির্বচনীয় ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তির জন্য ভগবদ্‌ভক্তির ন্যায় কোনো সহজ উপায় কোনো যুগেই নেই। কলিযুগে তো নেই-ই। কিন্তু প্রথমে সকলকে জানতে হবে যে, ভক্তি কাকে বলে ? ভক্তির কথা বলা যত সহজ, বাস্তবে ততই কঠিন। শুধুমাত্র বাহ্যাড়ম্বরের নাম ভক্তি নয়। ভক্তি, প্রদর্শনের বস্তু নয়, এ হল

---

[১]শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণম্ পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৫।২৩)

হৃদয়ের গুপ্ত ধন। ভক্তির স্বরূপ যত গুপ্ত থাকে ততই তা বেশি মূল্যবান বলে মনে করা হয়। ভক্তি তত্ত্ব বোঝা অত্যন্ত কঠিন। যাঁরা সেই দয়াময় পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করেন, তাঁদের অবশ্য এটি বুঝতে তত কষ্ট বা শ্রম করতে হয় না। একান্ত শরণাগত ভক্তকে ভক্তির তত্ত্ব পরমেশ্বর নিজে জানিয়ে দেন। যিনি একবার সত্য হৃদয়ে ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন, ভগবান তাঁকে অভয় করে দেন, এ তাঁর ব্রত।

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম॥

(বাল্মীকি রামায়ণ ৬।১৮।৩৩)

ভগবানের শরণাগতি এক অত্যন্ত মহৎ সাধন কিন্তু তাতে অনন্যতা থাকা উচিত। পূর্ণ অনন্যতা হলে ভগবানের দিক থেকে সত্ত্বর ঈপ্সিত উত্তর লাভ হয়। বিভীষণ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে একমাত্র শ্রীরামের আশ্রয়কেই নিজের রক্ষা কবচ মনে করে শ্রীরামের শরণ গ্রহণ করেন। ভগবান তখনই তাঁকে আপন করে নেন। কৌরবদের রাজসভায় সর্বভাবে নিরাশ হয়ে দ্রৌপদী দেবী যখনই শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে তাঁকে স্মরণ করেন, তখনই তাঁর প্রার্থনা পূরণ হয়। অনন্য শরণের এ হল উদাহরণ। এই শরণাগতি ছিল জাগতিক কষ্ট নিবৃত্তের জন্য। এইভাব রেখে ভক্তকে ভগবানের জন্য ভগবানেরই শরণ গ্রহণ করা উচিত। তাহলে তত্ত্ব উপলব্ধি করতে বিলম্ব হবে না।

যদিও এইরূপ ভক্তির পরমতত্ত্ব ভগবানের শরণ গ্রহণ করলেই জানা সম্ভব হয় তবুও শাস্ত্র এবং সাধু-মহাত্মাদের বাক্যের ওপর এবং নিজের অধিকার না জেনেও নিজ চিত্তের প্রসন্নতার জন্য আমি যা কিছু লিখছি, তারজন্য ভক্তগণ আমাকে ক্ষমা করবেন।

পরমাত্মাতে পরম অনন্য বিশুদ্ধ হওয়াকেও ভক্তি বলা হয়। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও অনেক জায়গায় এর ব্যাখ্যা আছে, যেমন—

'ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।' (১৩।১০)

'মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।' (১৪।২৬) ইত্যাদি।

এইপ্রকার ভাব নারদ ও শাণ্ডিল্য-সূত্রে পাওয়া যায়। অনন্য প্রেমের সাধারণ স্বরূপ হল এই যে একমাত্র ভগবান ব্যতীত অন্য কিছুতে কোনো সময় যেন আসক্তি না থাকে, প্রেমমগ্নতার মধ্যে ভগবান ভিন্ন অন্য কিছুর জ্ঞান না থাকে। যে যে স্থানে মন যায় সেখানেই যেন ভগবানকে দেখা যায়। এরূপ করলে, অভ্যাস গড়ে উঠে নিজেকে বিস্মৃত হয়ে শুধু ভগবানই যেন থেকে যান। একেই বলা হয় বিশুদ্ধ প্রেম। পরমেশ্বরে প্রেম করার কারণ কেবল পরমেশ্বর বা তাঁর প্রেমই যেন হয়—প্রেমের জন্যই প্রেম করা হোক—অন্য কোনো কারণ যেন না থাকে। মান, মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা এবং ইহলোক ও পরলোকের কোনো পদার্থের ইচ্ছার লেশও যেন সাধকের মনে না থাকে, ত্রৈলোক্যের রাজত্বের জন্যও তাঁর মন যেন কখনও লালায়িত না হয়। ভগবান স্বয়ং প্রসন্ন হয়ে ভোগ্য-পদার্থ প্রদান করার জন্য আগ্রহ করলেও নেবেন না। তারজন্য ভগবান রুষ্ট হলেও তারজন্য চিন্তা করবেন না। নিজ স্বার্থের কথা শুনলেই তাতে অত্যন্ত বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্য যেন আসে। ভগবানের দিক থেকে বিষয়াদির প্রলোভন এলে মনে মনে অনুতপ্ত হয়ে যেন এই ভাব উদয় হয় যে, 'আমার প্রেমে অবশ্যই কোনো ত্রুটি আছে, আমার মনে যদি সত্যকার বিশুদ্ধভাব থাকত এবং এই স্বার্থের কথা শুনে যদি আমার প্রকৃতই দুঃখ হোত তাহলে ভগবান কখনও আমাকে এভাবে প্রলোভন দিতেন না।' বিনয়, অনুরোধ ও ভয় দেখালেও পরমাত্মার প্রেম ব্যতীত কোনোভাবেই অন্য বস্তু স্বীকার করবেন না, নিজের প্রেমে অচল-অটল হয়ে থাকবেন। তিনি এই মনে করবেন যে, যতক্ষণ ভগবান আমাকে নানা বিষয়ের প্রলোভন দেখাচ্ছেন ও আমার পরীক্ষা গ্রহণ করছেন, ততক্ষণ অবশ্যই আমার মনে বিষয়াসক্তি আছে। সত্যকার প্রেম হলে নিজ প্রেমাস্পদকে ছেড়ে আমি অন্য কথা শুনতে পারতাম না। বিষয়াদি দেখে, শুনে ও সহ্য করে নিচ্ছি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আমি সত্যকার প্রেমের অধিকারী নই। তাই তো ভগবান আমাকে লোভ দেখাচ্ছেন। সব থেকে ভালো হত যদি আমি বিষয়াদির আলোচনা শুনেই মূর্ছিত হতাম। সেই অবস্থা হয়নি, তাই নিঃসন্দেহে আমার হৃদয়ে কোনো না কোনো

স্থানে বিষয়বাসনা লুকিয়ে আছে। এই হল বিশুদ্ধ প্রেমের উচ্চ-সাধনের স্বরূপ।

এরূপ বিশুদ্ধ প্রেম হলে যে আনন্দ হয় তার মহিমা অনির্বচনীয়। এরূপ প্রেমের প্রকৃত মহত্ত্ব কোনও একজন পরমাত্মার অনন্য প্রেমিকই জানেন। প্রেমের সাধারণতঃ তিনটি সংজ্ঞা থাকে। গৌণ, মুখ্য ও অনন্য। যেমন গোবৎস্যকে ছেড়ে গরু বনে যায়, যেখানে ঘাস থাকে, সেই গোরুর প্রেম ঘাসে গৌণ, বাছুরে মুখ্য এবং নিজ জীবনে অনন্য হয়। সে বাছুরের জন্য ঘাস এবং জীবনের জন্য বাছুরকেও ত্যাগ করতে পারে। এরূপ উত্তম সাধক সাংসারিক কার্য করেও অনন্যভাবে পরমাত্মার চিন্তা করেন। সাধারণ ভগবৎ-প্রেমিক তাঁর মন পরমাত্মাতে ন্যস্ত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু অভ্যাস ও আসক্তিবশতঃ ভজন-ধ্যান করার সময়ও তাঁর মন বিষয়াদিতে চলে যায়। যাঁর ভগবানে মুখ্য প্রেম, তিনি সর্বসময় ভগবানকে স্মরণে রেখে সমস্ত কাজ করেন, যাঁর ভগবানে অনন্য প্রেম হয় তাঁর তো সমগ্র চরাচর বিশ্ব এক বাসুদেবময় প্রতীত হয়। এরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ (গীতা ৭।১৯)।

এইরূপ অনন্য প্রেমিক ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ তো প্রেমে এতো মগ্ন হয়ে যান যে লোকদৃষ্টিতে পাগল বলে প্রতিভাত হন। কারও কারও বালকের মতো আচরণ দেখা যায়। তাঁর সাংসারিক কাজ পরিত্যক্ত হয়। আবার কোনো প্রেমিক পুরুষ অনন্য প্রেমে নিমগ্ন হয়েও মহান ভাগবৎ শ্রীভরতের মতো বা ভক্তরাজ শ্রীহনুমানের ন্যায় সর্বদা 'রামকাজ' করতে প্রস্তুত থাকেন। এরূপ ভক্তদের সর্বকার্যই লোকহিতার্থে হয়ে থাকে। এই মহাত্মাগণ এক মুহূর্তের জন্যও পরমাত্মাকে ভোলেন না এবং ভগবানও তাঁকে ভুলতে পারেন না। ভগবান বলেছেনেই যে—

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

(গীতা ৬।৩০)

~~○~~

(৯) গীতায় ভক্তি

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা এক অদ্বিতীয় আধ্যাত্মিক গ্রন্থ, এটি কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞানতত্ত্বের ভাণ্ডার। কেউ একথা বলতে পারেন না যে, গীতায় প্রধানতঃ শুধু অমুক বিষয়েরই বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও এটি এক ছোট গ্রন্থ এবং এতে সর্ব বিষয়ই সূত্ররূপে বর্ণিত আছে, কিন্তু কোনো বিষয়ের বর্ণনা স্বল্প হলেও অপূর্ণ নয়। তাই বলা হয়েছে—

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥

(মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৪৩।১)

এই বক্তব্য দ্বারা অন্য শাস্ত্রকে নিষেধ করা হয়নি, একথায় গীতার সত্যকার মহত্ত্ব বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে গীতোক্ত জ্ঞানের উপলব্ধি হলে আর কিছু জানার বাকি থাকে না। গীতায় নিজ নিজ স্থানে কর্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান—তিনটির বিশদ্‌ও পূর্ণ বর্ণনা থাকায় এটি বলা যায় না যে এর মধ্যে কোন্ বিষয়টি প্রধান এবং কোন্‌টি গৌণ। সুতরাং যাঁর যে বিষয় প্রিয় যে সিদ্ধান্ত মনোমত, সেটিই তার কাছে গীতায় প্রতিভাত হয়। তাই বিভিন্ন টীকাকারগণ নিজ নিজ ভাবনা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করেছেন, কিন্তু সেগুলির কোনোটিকেই আমরা অসত্য বলতে পারি না। বেদ যেমন পরমাত্মার নিঃশ্বাস, তেমনই গীতাও সাক্ষাৎ ভগবানের মুখ নিঃসৃত হওয়ায় এটিও ভগবৎ-স্বরূপ। সুতরাং ভগবানের ন্যায় গীতার স্বরূপও ভক্তদের নিজ নিজ চিন্তা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করা হয়। কৃপাসিন্ধু ভগবান তাঁর প্রিয় সখা— ভক্ত অর্জুনকে নিমিত্ত করে সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্য জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডারকে গীতা-শাস্ত্রের আকারে উপদেশ দিয়েছিলেন। এরূপ গীতা-শাস্ত্রের কোনো একটি তত্ত্ব ধরে চর্চা করা আমার ন্যায় সাধারণ মানুষের কাছে বালকসুলভ চপলতা মাত্র। আমার এই বিষয়ে কিছু বলার অধিকার নেই জেনেও যা কিছু বলছি তা কেবল নিজের মন-বিনোদনের জন্যই। আমার বিনীত অনুরোধ যে, ভক্ত ও বিজ্ঞগণ আমার এই বালকসুলভ প্রচেষ্টাকে ক্ষমা করবেন।

গীতায় কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান—তিন সিদ্ধান্তেরই নিজ নিজ স্থানে প্রাধান্য রয়েছে, তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে গীতা এক ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ, এতে এমন কোনো অধ্যায় নেই যাতে কোনো ভক্তিপ্রসঙ্গ নেই। গীতার আরম্ভ ও শেষ ভক্তিতেই হয়েছে। আরম্ভে অর্জুন **'শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'** (২।৭) বলে ভগবানের শরণ গ্রহণ করেছেন আর শেষে ভগবান **'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'** (১৮।৬৬) বলে শরণাগতিরই পূর্ণ সমর্থন করেছেন। শুধু সমর্থনই নয়, সমস্ত ধর্মের আশ্রয় সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে শুধু ভগবদাশ্রয়—তাঁর আশ্রয় নেবার জন্য আদেশ করেছেন, সেই সঙ্গে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করার আশ্বাস দিয়েছেন। এটি সর্বজন স্বীকৃত যে শরণাগতি হল ভক্তিরই এক স্বরূপ। অবশ্য গীতার ভক্তি অবিবেচনাপূর্বক করা অন্ধভক্তি বা অজ্ঞানপ্রেরিত আলস্যময় কর্মভোগরূপ জড়ত্ব নয়, গীতার ভক্তি ক্রিয়াত্মক ও বিবেকপূর্ণ। গীতার ভক্তি পূর্ণপুরুষ পরমাত্মার সমীপে পৌঁছে যাওয়া সাধকদ্বারা করা হয়। গীতার ভক্তির লক্ষণ দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান নিজে জানিয়েছেন। গীতার ভক্তিতে পাপের স্থান নেই। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের যিনি শরণাগত অনন্যভক্ত, যিনি সর্ব দিকে সর্বদা ভগবানকেই দেখেন, তিনি কীকরে লুকিয়ে পাপ কাজ করতে পারেন ? যে শরণাগত ভক্ত তাঁর জীবন পরমাত্মার হাতে সমর্পণ করে তাঁর ইশারায় চলেন তাঁর দ্বারা পাপকাজ কীকরে হতে পারে ? যে ভক্ত সর্বজগৎ পরমাত্মার স্বরূপ জেনে সকলের সেবা করা নিজ কর্তব্য মনে করেন, তিনি নিষ্ক্রিয় ও আলস্যপরায়ণ কী করে হতে পারেন ? পরমাত্মার জ্ঞানের আলো যাঁর কাছে থাকে, তিনি কীভাবে অন্ধকারে প্রবেশ করবেন ?

তাই ভগবান অর্জুনকে স্পষ্ট বলেছেন—

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যসংশয়ম্ ॥

(গীতা ৮।৭)

যুদ্ধ করো, কিন্তু সর্বদা আমাকে (ভগবানকে) স্মরণ করে এবং আমাতে (ভগবানে) অর্পিত মন-বুদ্ধিদ্বারা যুক্ত হয়ে করো। এই হল নিষ্কামকর্ম সংযুক্ত ভক্তিযোগ, এর দ্বারা নিঃসন্দেহে পরমাত্মাপ্রাপ্তি হয়। এইরূপ আদেশ

গীতার ৯।২৭ এবং ১৮।৫৭ ইত্যাদি শ্লোকেও দেওয়া হয়েছে।

এর অর্থ এই নয় যে কেবল কর্মযোগ বা কেবল ভক্তিযোগের জন্য ভগবান পৃথকভাবে কোথাও কিছু বলেননি। **'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে'** (২।৪৭) **'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি'** (২।৪৮) ইত্যাদি শ্লোকে কেবল কর্মের এবং **'মন্মনা ভব'** (৯।৩৪) ইত্যাদি শ্লোকে কেবল ভক্তির বর্ণনা পাওয়া যায়, কিন্তু এখানেও কর্মে ভক্তির ও ভক্তিতে কর্মের অন্যোন্যাশ্রিত প্রচ্ছন্ন সম্বন্ধ আছে। সমত্বরূপ যোগেস্থিত হয়ে ফলের অধিকার ঈশ্বরের মনে করে যিনি কর্ম করেন, তিনিও প্রকারান্তরে ঈশ্বরস্মরণরূপ ভক্তি করে থাকেন এবং ভক্তি, পূজা, নমস্কার ইত্যাদি ভগবদ্-ভক্তিরূপ ক্রিয়া করেন যে সাধক, তিনিও ক্রিয়ারূপ কর্মই করে থাকেন। সাধারণ সকামকর্মে এবং ঐসব কর্মের মধ্যে পার্থক্য শুধু এই যে সকামকর্মী সাংসারিক জাগতিক কামনা সিদ্ধির জন্য কর্মের অনুষ্ঠান করেন আর নিষ্কামকর্মী ভগবানে প্রীতির জন্য করেন। কর্মত্যাগকে গীতায় স্বরূপতঃ নিন্দা করা হয়েছে, তাকে তামসত্যাগ বলা হয়েছে (১৮।৭) এবং তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে কর্মত্যাগের দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্তি হয় না বলে পরের শ্লোকে স্বরূপতঃ কর্মত্যাগ অশক্য বলেও জানিয়েছেন। সুতরাং গীতা অনুসারে প্রধানতঃ অনন্যভাবে ভগবানের স্বরূপে স্থিত হয়ে ভগবানের নির্দেশ মনে করে কায়মনোবাক্যে স্ববর্ণ অনুসারে সমস্ত কর্মের আচরণ করাই হল ভগবানে ভক্তি এবং এর দ্বারাই পরম সিদ্ধিরূপ মোক্ষপ্রাপ্তি লাভ সম্ভব। ভগবান ঘোষণা করেছেন—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।।

(গীতা ১৮।৪৬)

যে পরমাত্মা থেকে সর্বভূতের উৎপত্তি হয়েছে এবং যাঁর দ্বারা এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত , সেই পরমেশ্বরকে নিজ স্বাভাবিক কর্মদ্বারা পূজা করে মানুষ পরম সিদ্ধি লাভ করে।

এইরূপ কর্ম বন্ধনের কারণ না হয়ে মুক্তিরই কারণ হয়, এতে পতনের কোনো ভয় থাকে না। ভগবান সাধককে ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য এবং সাধনোত্তর

সিদ্ধকালে জ্ঞানীকেও লোকসংগ্রহ অর্থাৎ জনগণকে সৎপথে আনার জন্য নিজের উদাহরণ দিয়ে কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন, যদিও তাঁর কোনো কর্তব্য বাকী থাকে না—**'তস্য কার্যং ন বিদ্যতে'** (৩।১৭)।

এতদ্ব্যতীত অর্জুন ক্ষত্রিয়, গৃহস্থ ও কর্মশীল পুরুষ ছিলেন, তাইজন্য তাঁকে কর্মসহ ভক্তি করার জন্য বিশেষভাবে বলা হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে সর্বসাধারণের হিতের জন্যও এটির প্রয়োজন থাকে। সংসারে তমোগুণ বেশি করে ব্যাপ্ত আছে। তমোগুণের জন্যই লোকে ভগবদ্ তত্ত্বতে অনভিজ্ঞ থেকে একান্তবাসে ভজন-ধ্যান করার নামে নিদ্রা, আলস্য ও অকর্মণ্যতার শিকার হয়ে ওঠে। এমন দেখা যায় যে কিছু ব্যক্তি 'এখন আমি নিরন্তর একান্তে থেকে ভজন-ধ্যান করব' বলে কাজকর্ম পরিত্যাগ করে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মন নির্জন স্থান থেকে সরে আসে। কিছু লোক শুয়ে কাল কাটায় আবার কেউ বলে 'কী করব, ধ্যানে মন বসে না।' ফলে কিছু ব্যক্তি নিষ্কর্ম হয়ে যায় এবং কিছু প্রমাদবশতঃ ইন্দ্রিয়াদির আরামের বশবর্তী হয়ে ভোগে প্রবৃত্ত হয়। সত্যকার ভজন-ধ্যানকারী ব্যক্তি বিরলই হয়ে থাকে। একান্তে বাস করে ভজন-ধ্যান করা খারাপ নয়। কিন্তু তা সাধারণ ব্যাপার নয়। তারজন্য অনেক অভ্যাসের প্রয়োজন। এই অভ্যাস কর্ম করতে করতেই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় ও গাঢ় হয়। সেইজন্য ভগবান বলেছেন যে নিত্য-নিরন্তর আমাকে স্মরণ করে ফলাসক্তিরহিত হয়ে আমার নির্দেশে আমার প্রীতির জন্য কর্ম করা উচিত। পরমেশ্বরের ধ্যানের গাঢ় স্থিতি প্রাপ্ত হওয়াতে কর্মাদির সংযোগ-বিয়োগ বাধক সাধক নয়। প্রেম ও সত্যকার শ্রদ্ধাই হল এর প্রধান কারণ। প্রেম ও শ্রদ্ধা থাকলে তার পক্ষে কর্ম বাধক হয় না বরং তাঁর প্রত্যেক কর্ম ভগবৎ-প্রীতির জন্যই অনুষ্ঠিত হয়ে শুদ্ধ ভক্তিরূপে পরিণত হয়। এর দ্বারাও কর্মত্যাগের আবশ্যকতা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু এই কথার দ্বারা একান্তে বাস করে নিরন্তর ভক্তির সাধনার নিষেধ করা হয়নি।

অধিকারীদের জন্য **'বিবিক্তদেশসেবিত্বম্'** এবং **'অরতির্জনসংসদি'** (১৩।১০) হওয়াই উচিত। কিন্তু জগতে প্রায় অধিকাংশ কর্মেরই অধিকারী পাওয়া যায়। প্রকৃত একান্তবাসের অধিকারী তিনি, যিনি ভগবানের ভক্তিতে লীন

হয়ে থাকেন, যার হৃদয় অনন্যপ্রেমে পরিপূর্ণ, যিনি ক্ষণমাত্র ভগবানের বিস্মরণ হলেই ভীষণ ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, ভগবদ্-প্রেমের বিহ্বলতায় বাহ্য জ্ঞান লুপ্ত হওয়ায় যাঁর সাংসারিক কর্ম সুচারুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না এবং যাঁর সাংসারিক সুখ-আরাম ভোগ দর্শনে ও শ্রবণে শরীরে জ্বালা ধরে, এরূপ অধিকারীদের জন্য লোকালয় থেকে আলাদা একান্তে থেকে নিরন্তর অনন্য সাধন-ভজন করাই অধিক শ্রেয় হয়ে থাকে। তাঁরা কর্ম ত্যাগ করেন না, কর্মই তাঁদের পরিত্যাগ করে। এরূপ পুরুষদের একান্তে কখনও আলস্য বা বিষয়-চিন্তা হয় না। তাঁদের ভগবদ্প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাঁরা অত্যন্ত শীঘ্রই পরমাত্মারূপী মহাসমুদ্রে মিলিত হয়ে তাঁদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সমুদ্রের বিশাল অসীম অস্তিত্বে অভিন্নরূপে মিশিয়ে দেন। কিন্তু যাঁদের একান্তে থাকলে সাংসারিক বিক্ষেপ উৎপীড়ন করে, তাঁরা বেশিক্ষণ কর্মহীন থেকে একান্তবাসের অধিকারী হন না। জগতে এইরূপ ব্যক্তিই অধিক। অধিক সংখ্যক ব্যক্তির জন্য যে উপায় উপযুক্ত প্রায় সেটিই বলা হয়, এবং তাই হল নিয়ম। তাই শাস্ত্রোক্ত সাংসারিক কর্মের গতি ভগবানের দিকে করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত, কর্ম ত্যাগ করার নয়।

ওপরে বলা হয়েছে যে অর্জুন ছিলেন গৃহস্থ, ক্ষত্রিয় এবং কর্মশীল, তাই কর্মের কথা বলা হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে গীতা কেবল গৃহস্থ, ক্ষত্রিয় বা কর্মীদেরই জন্য। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে গীতারূপ দুগ্ধামৃত অর্জুনরূপ বৎসের নিমিত্ত বিশ্ব প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু এটি এতো সার্বভৌম এবং সুমধুর যে সর্ব দেশ, সর্ব জাতি, সর্ব বর্ণ এবং সমস্ত আশ্রমের লোক এটি অবাধিতভাবে পান করে অমরত্ব লাভ করতে সক্ষম। ভগবদ্-প্রাপ্তিতে যেমন সকলের অধিকার আছে, তেমনই গীতায়ও সকলের অধিকার আছে। অবশ্য তার মধ্যে সদাচার, শ্রদ্ধা ও ভক্তিপ্রেম থাকা উচিত। কারণ ভগবান শ্রদ্ধাহীন, শুনতে না চাওয়া, ভ্রষ্ট আচরণযুক্ত, ভক্তিহীন মানুষের মধ্যে এর প্রচার নিষেধ করেছেন (গীতা ১৮।৬৭)। ভগবানের আশ্রিত যে কেউই এই অমৃতপানের উপযুক্ত পাত্র (১৮।৬৮)।

যদি একথা বলা হয় যে গীতায় সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ নামক দুটি নিষ্ঠারই বর্ণনা করা হয়েছে। ভক্তির তৃতীয় কোনো নিষ্ঠাই নেই, তাহলে গীতাকে ভক্তিপ্রধান বলা হয় কীভাবে ? তার উত্তর হল যদিও ভক্তির পৃথক নিষ্ঠা ভগবান বলেননি কিন্তু প্রথমে এটি বুঝতে হবে যে নিষ্ঠা কাকে বলে এবং যোগ ও সাংখ্যনিষ্ঠা উপাসনা ব্যতীত কী সম্পন্ন হতে পারে ? উপাসনা ব্যতীত কর্ম জড় হওয়ায় কখনও মুক্তিদায়ক হয় না এবং উপাসনারহিত জ্ঞান প্রশংসনীয় হয় না। গীতায় ভক্তি জ্ঞান ও কর্ম—উভয়ে ওতপ্রোত। নিষ্ঠার অর্থ হল—পরমাত্মার স্বরূপে স্থিতি। যে স্থিতি পরমেশ্বরের স্বরূপে ভিন্নরূপে হয়ে থাকে, অর্থাৎ পরমেশ্বর অংশী ও আমি তাঁর অংশ, পরমেশ্বর সেব্য, আমি তাঁর সেবক—এই ভাবদ্বারা পরমাত্মার প্রীতির জন্য তাঁর নির্দেশানুসারে ফলাশক্তি ত্যাগ করে যে কর্ম করা হয় তার নাম নিষ্কাম কর্ম যোগনিষ্ঠা এবং যেটি সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মে অভেদরূপে স্থিতি অর্থাৎ ব্রহ্মে স্থিত হয়ে প্রকৃতি দ্বারা সংঘটিত সমস্ত কর্মকে প্রকৃতির বিস্তার ও মায়া মনে করে বাস্তবে এক সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের অতিরিক্ত আর কিছুই নেই এটি স্থির করে যে অভেদ স্থিতি হয়, তাকে বলা হয় সাংখ্যনিষ্ঠা। এই দুই নিষ্ঠাই উপাসনাপূর্ণ। সুতরাং ভক্তির তৃতীয় নিষ্ঠাকে স্বতন্ত্রভাবে বলার প্রয়োজন নেই। এতে যদি কেউ বলেন যে, তবে তো নিষ্কাম কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ ব্যতীত শুধু ভক্তিমার্গ দ্বারা পরমাত্মা লাভ হতে পারে না, তবে তা বলা ঠিক নয় ; কারণ স্থানে স্থানে শুধু ভক্তিযোগ দ্বারাই পরমাত্মপ্রাপ্তি হয়, বলা হয়েছে। সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য একথাও বলা হয়েছে যে, অনন্যভক্তি ভিন্ন অন্য কোনো উপায়ে তা হয় না (গীতা ১১।৫৪)। ধ্যানযোগরূপ ভক্তিকে (গীতা ১৩।২৪) **'ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি'** বলে ভগবান আরও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এই ধ্যানযোগের প্রয়োগ উপরোক্ত দুই সাধনের সঙ্গে বা পৃথকরূপেও হয়। এই উপাসনা বা ভক্তিমার্গ অত্যন্ত সহজ এবং মহত্ত্বপূর্ণ। এতে ঈশ্বরের সাহায্য থাকে এবং তাঁর বল প্রাপ্ত হতে থাকে। সুতরাং আমাদের এই গীতোক্ত নিষ্কাম বিশুদ্ধ অনন্যভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে নিজের সমস্ত কর্ম ভগবানের প্রীত্যর্থে করা উচিত।

~~o~~

(১০) প্রেম-ভক্তি-প্রকাশ

পরমাত্মার শরণপ্রাপ্ত পুরুষের মন পরমাত্মার কাছে প্রার্থনা করে—

হে প্রভো ! হে বিশ্বম্ভর ! হে দীনদয়াল ! হে কৃপাসিন্ধু ! হে অন্তর্যামী ! হে পতিতপাবন ! হে সর্বশক্তিমান্ ! হে দীনবন্ধু ! হে নারায়ণ ! হে হরি ! দয়া করুন, দয়া করুন। হে অন্তর্যামী ! আপনার নাম জগতে দয়াসিন্ধু ও সর্বশক্তিমান বলে বিখ্যাত, তাই দয়া করা আপনার কাজ।

হে প্রভো ! আপনার নাম যখন পতিতপাবন, তাহলে দয়া করে একবার এসে দর্শন দিন। আমি আপনাকে বারংবার প্রণাম করে বলছি, হে প্রভো ! দর্শন দিয়ে কৃপা করুন। হে প্রভো ! আপনি ছাড়া এই জগতে আমার আর কেউই নেই, একবার দর্শন দিন, দর্শন দিন, কষ্ট দেবেন না। আপনার নাম বিশ্বম্ভর, তবে কেন আমার আশা পূর্ণ করছেন না ! হে করুণাময় ! হে দয়াসাগর ! দয়া করুন। আপনি দয়ার সমুদ্র, সুতরাং অল্প দয়া করলে আপনার দয়াসাগরের কিছু কম হবে না। আপনার অল্প দয়াতে সম্পূর্ণ জগৎ উদ্ধার হতে পারে তাহলে এক তুচ্ছ জীবকে উদ্ধার করা আপনার কাছে কী এমন বিশেষ ব্যাপার। হে প্রভো ! যদি আপনি আমার কর্মের দিকে তাকান, তাহলে তো এই সংসার থেকে আমার নিস্তার লাভের কোনো উপায়ই নেই। তাই আপনি আপনার পতিতপাবন নামের দিকে তাকিয়ে এই তুচ্ছ জীবকে দর্শন দিন। আমি কোনো ভক্তি জানি না, যোগও জানি না এবং কোনো ক্রিয়া-কর্মও জানি না, যার দ্বারা আমি আপনার দর্শন পেতে পারি। আপনি যদি অন্তর্যামী হয়ে দয়াসিন্ধু না হতেন, তবে আপনাকে জগতে কেউ দয়াসিন্ধু বলত না, যদি আপনি দয়াসাগর হয়েও অন্তরের দুঃখ না জানতেন, তাহলে কেউ আপনাকে অন্তর্যামী বলত না। উভয় গুণযুক্ত হয়েও যদি আপনি সামর্থ্যবান না হতেন, তাহলে আপনাকে কেউ সর্বশক্তিমান ও সর্বসামর্থ্যবান বলত না। হে প্রভো ! হে দয়াসিন্ধু ! দয়া করে একবার দর্শন দিন॥ ১॥

জীবাত্মা নিজের মনকে বলে—

ওরে দুষ্ট মন ! কপটতাপূর্ণ প্রার্থনা দ্বারা অন্তর্যামী ভগবান কি প্রসন্ন হতে

পারেন ? একথা কি তিনি জানেন না যে তোমার এইসব প্রার্থনা নিষ্কাম নয় ? তোমার হৃদয়ে শ্রদ্ধা বিশ্বাস ও প্রেম কিছুই নেই ? তোমার মনে যদি এই বিশ্বাস থাকে যে তিনি অন্তর্যামী, তাহলে প্রার্থনা করছ কেন ? প্রেমবিহীন মিথ্যা প্রার্থনা কখনও শোনেন না আর যদি প্রেম থাকে তাহলে বলারই বা কী প্রয়োজন ? কারণ ভগবান নিজেই গীতায় বলেছেন যে—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। (গীতা ৪।১১)

যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে, আমিও তাকে সেই ভাবেই ভজনা করি। এবং

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্। (গীতা ৯।২৯)

যে (ভক্ত) আমাকে যেভাবে ভক্তি দ্বারা ভজনা করে সে আমাতে এবং আমিও তার মধ্যে (প্রত্যক্ষ প্রকট) থাকি[১]।

ওরে মন ! হরি দয়াসিন্ধু হয়েও যদি দয়া না করেন, তাহলেও কোনো চিন্তা নেই, নিজের তো কর্তব্যকর্ম করতে থাকা উচিত। হরি প্রেমিক, তিনি প্রেমকে চেনেন, প্রেমের বিষয় প্রেমিকই জানেন, এই অন্তর্যামী ভগবান কী তোমার শুষ্ক প্রেমে দর্শন দিতে পারেন ? যখন বিশুদ্ধ প্রেম ও শ্রদ্ধায় বিশ্বাসরূপ বন্ধন তৈরি হবে তখন সেই বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে হরি নিজেই চলে আসবেন। ওরে মূর্খ মন ! মিথ্যা প্রার্থনাতে কী কাজ চলে ? কারণ হরি অন্তর্যামী। ওরে মন ! তোমাকে নমস্কার, তোমার কাজ হল জগতে মজে থাকা, অতএব তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও। তোমার আসক্তির জন্যই আমি এই অসাড় জগতে অনেক দিন ঘুরে মরছি, এবার হরির চরণ-কমলের আশ্রয় গ্রহণ করায় তোমার সব কপটতা জানা গেছে। তুমি আমার জন্য কপটভাবে ও অতি দীন বাক্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, কিন্তু তুমি জাননা যে হরি অন্তর্যামী। শ্রীযোগবাসিষ্ঠতে ঠিকই উল্লিখিত আছে যে মন নাশ না হলে ভগবদ্প্রাপ্তি হয় না। বাসনা ক্ষয়, মনের নাশ ও পরমেশ্বর প্রাপ্তি এই তিনটি একই সময়ে হয়।

---

[১]যেমন অগ্নি সর্বত্র সূক্ষ্মরূপে ব্যাপ্ত হলেও সাধনদ্বারা প্রকট করলে তবেই প্রত্যক্ষ হয়, তেমনই সর্বত্র অবস্থান করলেও পরমেশ্বর ভক্তিদ্বারা ভজনকারীর অন্তরেই প্রত্যক্ষরূপে প্রকটিত হন।

তাই তোমার কাছেই অনুরোধ করছি তুমি এখান থেকে চলে যাও, এখন এই পক্ষী তেমার মায়ারূপ ফাঁদে বদ্ধ হবে না ; কারণ সে হরির চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তুমি কি তোমার দুর্দশা করে তবেই যাবে ? আহা ! কোথায় সেই মায়া ! কোথায় কাম-ক্রোধাদি শত্রুগণ ! এক তো এই সকল সৈন্য-সামন্ত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, অতএব নিজ প্রভাব বিস্তারের আশা ছেড়ে যেখানে ইচ্ছা চলে যাও॥ ২॥

মন আবার পরমাত্মার কাছে প্রার্থনা করতে থাকে—

প্রভো ! প্রভো ! দয়া করুন হে নাথ ! আমি আপনার শরণাগত ! হে শরণাগত প্রতিপালক। শরণাগতের লজ্জা রক্ষা করুন। হে প্রভো ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, একবার এসে দর্শন দিন। আপনি ছাড়া এই জগতে আমার জন্য কোনো আধার নেই, অতএব আপনাকে বারংবার নমস্কার করি ; প্রণাম করি। বিলম্ব করবেন না, শীঘ্র এসে দর্শন দিন। হে প্রভো ! হে দয়াসিন্ধো ! একবার এসে দাসের খবর নিন। আপনি না এলে প্রাণের আধার দেখা যায় না। হে প্রভো ! দয়া করুন, দয়া করুন, আমি আপনার শরণাগত, আমার দিকে একবার দয়াদৃষ্টি দিয়ে দেখুন। হে প্রভো ! হে দীনবন্ধু ! হে দীনদয়াল ! বিশেষ কষ্ট দেবেন না, দয়া করুন ! আমার কুকর্মের দিকে না তাকিয়ে আপনার পতিতপাবন স্বভাব প্রকাশ করুন॥ ৩॥

জীবাত্মা নিজের মনকে আবার বলে—

ওরে মন ! সাবধান ! সাবধান ! কীসের জন্য ব্যর্থ প্রলাপ করছ ? এই শ্রীসচ্চিদানন্দঘন হরি মিথ্যা বিনয় চান না। এখন তোমার কপটতা এখানে চলবে না, তুমি আমার জন্য হরির কাছে কেন কপটতা করে প্রার্থনা করো ? আমি এমন প্রার্থনা চাই না, তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যাও।

হরি যদি অন্তর্যামী হন, তবে প্রার্থনার কী প্রয়োজন ? যদি তিনি প্রেমিক হন, তাহলে ডাকার প্রয়োজন কী ? তিনি যদি বিশ্বম্ভর হন, তবে চাওয়ার প্রয়োজন কীসের ? তোমাকে নমস্কার, তুমি এখান থেকে চলে যাও, চলে যাও॥ ৪॥

জীবাত্মা তাঁর বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদিকে বলে—

হে ইন্দ্রিয়াদি ! তোমাদের নমস্কার। তোমরাও যাও। যেখানে বাসনা থাকে সেখানে তোমরা টিকে থাকো। আমি শ্রীহরির চরণ-কমলের আশ্রয় নিয়েছি, তাই এখন তোমাদের জোর খাটবে না। হে বুদ্ধে ! তোমাকেও নমস্কার। আগে তোমার জ্ঞান কোথায় গিয়েছিল যখন তুমি আমাকে জগৎ-সংসারে মজে থাকার জন্য শিক্ষা দিয়েছিলে ? এখন কি সেই শিক্ষা কাজে লাগতে পারে ?॥ ৫

জীবাত্মা পরমাত্মাকে বলে—

হে প্রভো ! আপনি অন্তর্যামী, তাই আমি আপনাকে বলছি না যে আপনি এসে আমাকে দর্শন দিন ; কারণ আমার যদি পূর্ণ প্রেম থাকত, তাহলে কী আপনি উপেক্ষা করতে পারতেন ? বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীদেবীও কী আপনাকে আটকাতে পারতেন ? আমার যদি আপনাতে পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকত, তাহলে কী আপনি দেরী করতেন ? সেই প্রেম ও বিশ্বাস কী আপনাকে ছাড়তে পারত ? আহা ! আমি বৃথাই সংসারে নিষ্কাম ও নির্বাসনিক হয়ে আছি এবং বৃথাই নিজেকে আপনার শরণাগত বলে মনে করি। কিন্তু কোনো চিন্তা নেই, যা কিছু প্রাপ্তি হয়, তাতেই আমার প্রসন্ন থাকা উচিত। কারণ আপনি এইরূপই গীতায় বলেছেন[১]। তাই আপনার চরণ-কমলে মগ্ন থেকে আমার যদি নরকও প্রাপ্তি হয়, তা-ও আমার কাছে স্বর্গের থেকে শ্রেষ্ঠ। এই অবস্থায় আমার চিন্তা কী ? আমার যখন আপনাতে প্রেম হবে, আপনার কী হবে না ? আমি যখন আপনাকে না দেখে থাকতে পারব না, তখন আপনি কি থাকতে পারবেন ? আপনি তো নিজেই গীতায় বলেছেন যে—'**যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্**॥' (গীতা ৪।১১)।

'যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে, আমিও তাকে সেইভাবেই ভজনা করি।' সুতরাং আমি আপনাকে বলছি না যে আমাকে আপনি দর্শন দিন আর

---

[১]যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ (গীতা ৪ অধ্যায়, ২২ শ্লোক)। সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ (গীতা ১২।১৯)

আপনারও কীসের চিন্তা ? যাক্, চিন্তার কোনো কারণ নেই, আপনি যেমন উচিত মনে করেন তাই করুন, আপনি যাই করুন, তাতেই আমার আনন্দ করা উচিত॥ ৬॥

জীবাত্মা জ্ঞাননেত্রদ্বারা পরমেশ্বরের ধ্যান করতে করতে আনন্দে বিহ্বল হয়ে বলে—

আহা ! আহা ! আনন্দ ! আনন্দ ! প্রভো ! প্রভো ! আপনি কী এসেছেন ? ধন্য ভাগ্য ! ধন্য ভাগ্য ! আজ আমার মতো পতিতও আপনার চরণ কমলের প্রভাবে কৃতার্থ হয়েছেন। কেন হবে না, আপনি নিজে গীতায় বলেছেন—

অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতি জানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

(৯।৩০-৩১)

যদি (কোনো) অত্যন্ত দুরাচারীও অনন্যভাবে আমার ভক্ত হয়ে আমাকে (সর্বদা) ভজনা করে, সে সাধু হবার যোগ্য ; কারণ সে প্রকৃত নিশ্চিতকারী।

তাই যে অতি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে ওঠে এবং সর্বদাস্থিত পরম শান্তি লাভ করে, হে অর্জুন ! তুমি নিশ্চিতভাবে জেনো যে আমার ভক্ত কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হয় না॥ ৭॥

জীবাত্মা পরমাত্মার আশ্চর্যময় সগুণরূপ ধ্যানে দেখতে দেখতে নিজ মনে তাঁর শোভা বর্ণনা করছে—

অহো ! কী সুন্দর ভগবানের চরণারবিন্দ যা নীলমণির ন্যায় চমক দিয়ে অনন্ত সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হচ্ছে। চমক-সুন্দর নখযুক্ত কোমল আঙুল যার ওপর রত্নমণ্ডিত স্বর্ণ অঙ্গুরীয় শোভা পাচ্ছে। ভগবানের চরণ-কমল যেমন তেমনই জানু ও জঙ্ঘার নীলমণি শোভা তাঁর পীতাম্বরের মধ্যে শোভা পাচ্ছে। আহা ! তাঁর সুন্দর চতুর্ভুজ কী অপূর্ব শোভাসম্পন্ন। উপরের দুই বাহুতে শঙ্খ ও চক্র আর নিচের দুই বাহুতে গদা-পদ্ম বিরাজমান। চতুর্বাহু সুন্দর সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিত। আহা ! ভগবানের বক্ষঃস্থল কী সুন্দর, তার মধ্যে

শ্রীলক্ষ্মীদেবীর ও ভৃগুলতার চিহ্ন বিদ্যমান। নীলকমলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ভগবানের গ্রীবাও কী সুন্দর, যেখানে রত্নখচিত হার ও কৌস্তুভমণি বিরাজমান এবং মুক্তা, বৈজয়ন্তী, সুবর্ণ ও নানা পুষ্পের মালা শোভা পাচ্ছে। সুন্দর মুখ, লাল ঠোঁট, অতি সুন্দর নাক যার অগ্রভাগে মুক্তা বিরাজ করছে। ভগবানের দুই চক্ষু কমলপত্রের ন্যায় বিশাল ও পদ্মফুলের ন্যায় প্রস্ফুটিত হয়ে আছে। কানে সুন্দর রত্নখচিত মকরাকৃতি কুণ্ডল ও ললাটে শ্রীযুক্ত তিলক, মস্তকে রত্নবিজড়িত মুকুট। আহা ! ভগবানের মুখারবিন্দ পূর্ণিমার চাঁদের মতো মনোহর, যার চারপাশে সূর্যকিরণের মতো উজ্জ্বল প্রভা বিচ্ছুরিত ; যার ছটায় মুকুটাদি সর্ব অলঙ্কার চমক দিচ্ছে। আজ আমি ধন্য, ধন্য যে এই মৃদু-মন্দ হাস্যবিজড়িত সুন্দর আনন্দমূর্তি ভগবান হরির দর্শন লাভ করেছি॥ ৮॥

ভগবান স্নান করে পদার্পণ করেছেন। বস্ত্র ধারণ করেছেন এবং যজ্ঞোপবীত সুশোভিত। আনন্দে বিহ্বল জীবাত্মা ধ্যানে এইভাবে নিজের সামনে কিছু দূরে দ্বাদশ বর্ষের সুকুমার ভগবানকে মাটি থেকে একটু উপরে বিরাজমান দেখে তাঁর মানসিক পূজা করছেন।

মানসিক পূজার বিধি

ওঁ পাদয়োঃ পাদ্যং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ॥ ১॥

এই মন্ত্র বলে শুদ্ধ জলে শ্রীভগবানের চরণ-কমল ধুয়ে সেই জল নিজের মস্তকে ধারণ করা॥ ১॥

ওঁ হস্তয়োরর্ঘ্যং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ॥ ২॥

এই মন্ত্র বলে শ্রীহরি ভগবানের হস্তকমলে পবিত্র জল দেওয়া॥ ২॥

ওঁ আচমনীয়ং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ॥ ৩॥

এই মন্ত্র বলে শ্রীনারায়ণদেবকে আচমন করানো॥ ৩॥

ওঁ গন্ধং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ॥ ৪॥

এই মন্ত্র বলে শ্রীহরি ভগবানের ললাটে তিলক লাগানো॥ ৪॥

ওঁ মুক্তাফলং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ॥ ৫॥

এই মন্ত্র বলে শ্রীভগবানের ললাটে মুক্তা লাগানো॥ ৫॥

ওঁ পুষ্পং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ॥ ৬॥

এই মন্ত্র বলে শ্রীভগবানের মস্তকে ও নাকের সামনে আকাশে পুষ্প ছুঁড়ে দেওয়া ॥ ৬ ॥

ওঁ মালাং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ ॥ ৭ ॥

এই মন্ত্র বলে পুষ্পমালা শ্রীহরির গলায় পরানো ॥ ৭ ॥

ওঁ ধূপমাঘ্রাপয়ামি নারায়ণায় নমঃ ॥ ৮ ॥

এই মন্ত্র বলে শ্রীভগবানের সামনে ধূপে আগুন দেওয়া ॥ ৮ ॥

ওঁ দীপং দর্শয়ামি নারায়ণায় নমঃ ॥ ৯ ॥

এই মন্ত্র বলে ঘৃতপ্রদীপ জ্বালিয়ে শ্রীবিষ্ণুর সামনে রাখা ॥ ৯ ॥

ওঁ নৈবেদ্যং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ ॥ ১০ ॥

এই মন্ত্র বলে মিছরী দ্বারা শ্রীহরি ভগবানের ভোগ অর্পণ করা ॥ ১০ ॥

ওঁ আচমনীয়ং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ ॥ ১১ ॥

এই মন্ত্র বলে শ্রীভগবানকে আচমন করানো ॥ ১১ ॥

ওঁ ঋতুফলং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ ॥ ১২ ॥

এই মন্ত্র বলে ঋতুফলা (কলা ইত্যাদি) দ্বারা শ্রীভগবানের ভোগদান করা ॥ ১২ ॥

ওঁ পুনরাচমনীয়ং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ ॥ ১৩ ॥

এই মন্ত্র বলে শ্রীভগবানকে আবার আচমন করানো ॥ ১৩ ॥

ওঁ পূগীফলং সতাম্বূলং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ ॥ ১৪ ॥

এই মন্ত্র বলে সুপারি সহ নাগরপান শ্রীভগবানে অর্পণ করা ॥ ১৪ ॥

ওঁ পুনরাচমনীয়ং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ ॥ ১৫ ॥

এই মন্ত্র বলে পুনরায় শ্রীহরিকে আচমন করানো। পরে স্বর্ণপাত্রে কর্পূর জ্বেলে শ্রীনারায়ণদেবের আরতী করা ॥ ১৫ ॥

ওঁ পুষ্পাঞ্জলিং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ ॥ ১৬ ॥

এই মন্ত্র বলে সুন্দর ফুলের অঞ্জলি ভরে শ্রীহরির মস্তকে বর্ষণ করা ॥ ১৬ ॥

পরে চারবার প্রদক্ষিণ করে সাষ্টাঙ্গে শ্রীনারায়ণদেবকে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করা ॥ ৯ ॥

এইভাবে শ্রীহরি ভগবানের মানসিক পূজা করার পরে তাঁকে নিজের হৃদয় আকাশে শয়ন করিয়ে জীবাত্মা নিজ মনে শ্রীভগবানের স্বরূপ ও গুণাদির বর্ণনা করে বারংবার নত মস্তকে প্রণাম করে।

শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং।
বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্॥
লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধ্যানগম্যং।
বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হরং সর্বলোকৈকনাথম্॥

'যাঁর আকৃতি অতি শান্ত, যিনি শেষনাগের শয্যায় শয়ন করেছেন, যাঁর নাভিতে কমল, যিনি দেবগণেরও ঈশ্বর ও সমগ্র জগতের আধার, যিনি আকাশের ন্যায় সর্বত্র ব্যাপ্ত , নীলমেঘের ন্যায় যাঁর বর্ণ, অত্যন্ত সুন্দর যাঁর সমস্ত অঙ্গ, যোগীগণ ধ্যান করে যাঁকে প্রাপ্ত হন, যিনি সমগ্র লোকের প্রভু, যিনি জন্মমৃত্যুরূপ ভয় নাশকারী, সেই কমলনেত্র শ্রীলক্ষ্মীপতি বিষ্ণুভগবানকে মস্তক নত করে প্রণাম করি।'

অসংখ্য সূর্যের ন্যায় যাঁর দীপ্তি, অনন্ত চন্দ্রসম যাঁর শীতলতা, কোটি কোটি অগ্নির ন্যায় যাঁর তেজ, অসংখ্য মরুতের মতো যাঁর পরাক্রম, অনন্ত ইন্দ্রের ন্যায় যাঁর ঐশ্বর্য, কোটি কোটি কামদেবের মতো যাঁর সৌন্দর্য, অসংখ্য পৃথিবী তুল্য যাঁর ক্ষমা, কোটি কোটি সমুদ্রসম যাঁর গাম্ভীর্য, যাঁর কোনোভাবে কোনো তুলনা করা যায় না, বেদ ও শাস্ত্রাদিতে যাঁর স্বরূপের কেবলমাত্র কল্পনা করা হয়, কেউ তাঁর কূল কিনারা পায় না, এরূপ অনুপমেয় শ্রীহরি ভগবানকে বারবার নমস্কার করি।

যে সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিষ্ণুভগবান মদু মৃদু হাসছেন, যাঁর সর্ব অঙ্গের রোমে ঘর্ম চমক দিয়ে শোভা দিচ্ছে, সেই পতিতপাবন শ্রীহরি ভগবানকে বারংবার নমস্কার করি॥ ১০॥

জীবাত্মা মনে মনে শ্রীহরি ভগবানকে পাখা দিয়ে হাওয়া করতে করতে এবং তাঁর শ্রীচরণের সেবা করতে করতে তাঁর স্তুতি করে—

আহা ! হে প্রভু ! আপনিই ব্রহ্মা, আপনিই বিষ্ণু, আপনিই মহেশ, আপনিই সূর্য, আপনিই চন্দ্র ও তারকা, আপনিই ভূর্ভুবঃ স্ব ত্রিলোক ও সপ্তদ্বীপ

এবং চতুর্দশ ভুবন ইত্যাদি যা কিছু আছে, সেসব আপনারই স্বরূপ, আপনি বিরাট স্বরূপ, আপনিই হিরণ্যগর্ভ, আপনিই চতুর্ভুজ এবং মায়াতীত শুদ্ধ ব্রহ্মও আপনি। আপনি নিজে নানারূপ ধারণ করেছেন, তাই এই সমগ্র জগৎ আপনারই স্বরূপ এবং দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন যা কিছু, সেসবই আপনি[১]। অতএব

নমঃ সমস্তভূতানামাদিভূতায় ভূভৃতে।
অনেকরূপরূপায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে॥

'সমস্ত প্রাণীর আদিভূত পৃথিবী ধারণকারী ও যুগে যুগে প্রকটিত হওয়া অনন্ত রূপসংবলিত বিষ্ণু ভগবান, আপনাকে নমস্কার।'

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব॥
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব॥

'আপনিই মাতা, পিতাও আপনি, আপনি বন্ধু, সখাও আপনি, আপনি বিদ্যা, ধনও আপনি, হে দেবতাদের দেবতা ! আপনি আমার সর্বস্ব'॥ ১১॥

উক্ত প্রকারে পরমাত্মার প্রেম-ভক্তিতে ব্যাপৃত পুরুষের যখন পরমাত্মাতে অত্যন্ত প্রেম হয়, তখন তাঁর আর নিজের শরীরাদির কোনো খেয়াল থাকে না, যেমন শ্রীসুন্দরদাস প্রেম-ভক্তির লক্ষণ জানিয়ে বলেছেন—

ইন্দব ছন্দ

প্রেম লগ্যো পরমেশ্বরসোঁ, তব ভূলি গয়ো সিগরো ঘরবারা।
জ্যোঁ উন্মত্ত ফিরৈ জিত হী তিত, নেক রহী ন শরীর সঁভারা॥

---

[১]'একো বিষ্ণুর্মহদ্ভূতং পৃথগ্ভূতান্যনেকশঃ' (বিষ্ণুসহস্রনাম ১৪০)

'পৃথক-পৃথক সমস্ত প্রাণী উৎপন্নকারী মহান ভূত একই বিষ্ণু অনেক রূপে অবস্থিত।' এবং 'একোঽহং বহু স্যাম্' (ইতি শ্রুতিঃ)

'(সৃষ্টির আদিতে ভগবান সঙ্কল্প করেছিলেন যে) আমি বহুরূপ ধারণ করব।'

শ্বাস উসাস উঠে সব রোম, চলৈ দৃগ নীর অখণ্ডিত ধারা।
সুন্দর কৌন করৈ নবধা বিধি, ছাকি পর্‌য়ো রস পী মতবারা॥

নারাচ ছন্দ

ন লাজ তীন লোককী, ন বেদকো কহ্যো করৈ।
ন শংক ভূত প্রেতকী, ন দেব যক্ষ তেঁ ডরৈ॥
সুনে ন কান ঔরকী, দ্রসৈ ন ঔর ইচ্ছনা।
কহৈ ন মুখ ঔর বাত, ভক্তি-প্রেম লচ্ছনা॥

বীজুমালা ছন্দ

প্রেম অধীনো ছাক্যো ডোলৈ, ক্যোঁকী ক্যোহী বাণী বোলৈ।
জৈসে গোপী ভূলী দেহা, তৈসো চাহে জাসোঁ নেহা॥

মনহরণ ছন্দ

নীর বিনু মীন দুঃখী, ক্ষীর বিনু শিশু জৈসে,
পীরকী ওষধি বিনু, কৈসে রহ্যো জাত হৈ।
চাতক জ্যো স্বাতিবূঁদ, চন্দকো চকোর জৈসে,
চন্দনকী চাহ করি, সর্প অকুলাত হৈ॥
নির্ধন জ্যোঁ ধন চাহে, কামিনীকো কন্ত চাহে,
ঐসী জাকে চাহ তাহি, কছু ন সুহাত হৈ।
প্রেমকো প্রবাহ ঐসো, প্রেম তহাঁ নেম কৈসো,
সুন্দর কহত যহ, প্রেমহী কী বাত হৈ॥

ছপ্পয় ছন্দ

কবহুঁক হঁসি উঠি নৃত্য করৈ, রোবন ফির লাগে।
কবহুঁক গদ্‌গদ-কণ্ঠ, শব্দ নিকসে নহিঁ আগে॥
কবহুঁক হৃদয় উমঙ্গ, বহুত উঁচে স্বর গাবে।
কবহুঁক হ্বৈ মুখ মৌন, গগন ঐসে রহি জাবে॥
চিত্ত-বিত্ত হরিসো লগ্যো, সাবধান কৈসে রহৈ।
যহ প্রেম লক্ষণা ভক্তি হৈ, শিষ্য সুনহু সুন্দর কহৈ॥ ১২॥

সগুণ ভগবান অন্তর্ধান করলে জীবাত্মা শুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন সর্বব্যাপী পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপে মগ্ন হয়ে বলেন—

আহা ! আনন্দ ! আনন্দ ! অতি আনন্দ ! সর্বত্র একমাত্র বাসুদেব-ই পরিব্যাপ্ত আছেন(১)। আহা ! সর্বত্র এক আনন্দই পরিপূর্ণ রয়েছে।

কোথায় কাম, কোথায় ক্রোধ, কোথায় লোভ, কোথায় মোহ, কোথায় মদ (উদ্বত্ত), কোথায় হিংসা, কোথায় অহঙ্কার, কোথায় ক্ষোভ, কোথায় মায়া, কোথায় মন, কোথায় বুদ্ধি, কোথায় ইন্দ্রিয় ! সর্বত্র এক সচ্চিদানন্দ-ই-সচ্চিদানন্দ ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। আহা ! আহা ! সর্বত্র এক সত্যরূপ, চেতনরূপ, আনন্দরূপ, ঘনরূপ, পূর্ণরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, কূটস্থ, অক্ষর, অব্যক্ত, অচিন্ত, সনাতন, পরব্রহ্ম, পরম অক্ষর, পরিপূর্ণ, অনির্দেশ্য, নিত্য, সর্বগত, অচল, ধ্রুব, অগোচর, মায়াতীত, অগ্রাহ্য, আনন্দ, পরমানন্দ, মহানন্দ, আনন্দ-ই-আনন্দ, আনন্দ-ই-আনন্দ পরিপূর্ণ, আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই নেই॥ ১৩॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

~~০~~

(১১) ধর্ম এবং তার প্রচার

এখন জগতের প্রায় সকল জাতির মানুষই অল্পবিস্তর নিজ নিজ ধর্মের উন্নতি ও প্রচারের জন্য নিজ নিজ পদ্ধতি অনুসারে চেষ্টা করছেন। এঁদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি তাঁদের ধর্মভাবের খবর জগতের কোনায় কোনায় পৌঁছে দিতে চান, আর সেইজন্য তাঁরা কোনো কাজই ফেলে রাখতে চান না। ক্রিশ্চান ধর্ম প্রচার

---

(১)বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ (গীতা ৭।১৯)

'(যিনি) বহু জন্মের অন্তে তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্ত জ্ঞানী সবকিছুই বাসুদেব, এই রূপে আমার ভজনা করেন, সেই মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।'

করার জন্য খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ বহু অর্থ জলের মতো খরচ করেন। আমেরিকা থেকে কোটি কোটি টাকা এজন্য ভারতে আনা হয়, লক্ষ লক্ষ খ্রীষ্টান যাজক নানা দেশে গিয়ে নানাপ্রকার সেবামূলক কাজ ও অন্যান্য প্রলোভনে মানুষকে বশ করে তাঁদের ধর্ম প্রচার ও বিস্তারের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন।

কিছু বিভ্রান্ত লোক পরধন ও পরস্ত্রী অপহরণ, ধর্মের নামে হিংসা, পরধর্মের বিনাশ করাকেই ধর্ম বলে মনে করেন এবং সেটিই প্রচার করে থাকেন। এরূপ ধর্মপ্রচারে চতুর্দিকে অশান্তি-হিংসা ও দুঃখ ছড়িয়ে পড়ে। নিজ বুদ্ধির দ্বারা লোক-কল্যাণের জন্য যে ধর্ম অধিক উপযোগী, তার প্রচারের জন্যই মানুষের চেষ্টা করা কর্তব্য। এই ভাবনায় কোনো ব্যক্তি যদি প্রকৃত পক্ষে এরূপ শুদ্ধভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে লোক-কল্যাণের জন্য ধর্ম প্রচার করতে চান, তাহলে তা অনুচিত নয়, বরং তাঁর কাজ দেখে আমাদের কী করা কর্তব্য—তা ভেবে দেখা উচিত। আমাদের বুদ্ধিতে এক হিন্দু ধর্মই, সর্বপ্রকারে উপযুক্ত পূর্ণ ধর্ম, যার চরম লক্ষ্য হল মানুষকে জগতের ত্রিতাপ অনল থেকে মুক্ত করে অনন্ত সুখের শেষ সীমায় পৌঁছিয়ে চিরদিনের মতো আনন্দময় করে তোলা। এই ধর্মের পবিত্র বার্তা লাভ করে জগতের অশান্তপ্রাণী নানা সময়ে পরমশান্তি লাভ করেছে এবং এখনও অনেক উন্নত চিন্তাশীল ব্যক্তি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এই সন্দেশ-বার্তা লাভের জন্য ব্যাকুল-চিত্ত। যে ধর্মের এমন অপার মহিমা, সেই অনাদি কাল থেকে প্রচলিত পবিত্র এবং গভীর অর্থবহ সেই ধর্মের অনুসরণকারী জাতি মোহবশত জগতের অন্যান্য অপূর্ণ মতের আশ্রয় নিয়ে অজ্ঞানতার প্রবাহে ভেসে যেতে উদ্যত—এ অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

ভারত যদি তার চিরকালের ধর্মের পবিত্র আদর্শ ভুলে ঐহিক সুখের ব্যর্থ কল্পনার পিছনে উন্মত্ত হয়ে শুধুমাত্র কাল্পনিক ভৌতিক, স্বর্গ-সুখকেই ধর্মের ধ্যেয় মনে করা মতাদি অনুসরণ করতে থাকে, তবে তা অত্যন্তই অনর্থের কথা। এই অনর্থের সূত্রপাতও হতে চলেছে। নানাসময়ে এর বহু উদাহরণ দেখা যায়। লোক প্রায়শঃ পরমানন্দ প্রাপ্তির পথ থেকে সরে নানা প্রকার ভোগপ্রাপ্তির চেষ্টাকেই নিজের কর্তব্য বলে মনে করেন। ধর্মক্ষয়ের এই প্রারম্ভিক দুষ্পরিণাম দেখেও যদি ধর্মপ্রেমি মানুষেরা ধর্ম-নাশ থেকে উৎপন্ন

ভয়ানক বিপদ থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য যথোপযুক্তভাবে সচেষ্ট না হন তবে তা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার।

আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই এখন শুধুমাত্র অর্থ-নাম-যশের জন্য নিজেদের দুর্লভ ও অমূল্য জীবন উৎসর্গ করছে। কিছু ব্যক্তি স্বরাজ্য এবং জনগণের ভালো করার চেষ্টা করেন, কিন্তু সত্য (যথার্থ) ধর্মের প্রচারক মহাত্মা পাওয়া অত্যন্ত বিরল। যদিও মান-যশ-প্রতিষ্ঠার কামনা ও স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করে স্বরাজ্য ও সমাজ সংশোধনের চেষ্টা করলেও সত্যকার সুখপ্রাপ্তিতে কিছু লাভ হয়, কিন্তু জাগতিক সুখের আকাঙ্ক্ষা পরম ধ্যেয়কেও ভুলিয়ে দেয়। সেই শান্তিপ্রদ সত্য ধর্মের প্রচার কার্যই আসল সুখ প্রাপ্তিতে পূর্ণভাবে সাহায্য করতে সক্ষম।

যদিও আমার জগতের মত-মতান্তরের জ্ঞান অত্যন্তই কম, কিন্তু সাধারণভাবে আমার বিশ্বাস যে সর্বাপেক্ষা উত্তম সার্বভৌম ধর্ম সেটিই হতে পারে যার লক্ষ্য অত্যন্ত মহান, নিত্য এবং অবাধ আনন্দের প্রাপ্তিলাভ হয় এবং যাতে সকলের অধিকার থাকে। শুধুমাত্র জাগতিক সুখ বা স্বর্গসুখ নির্দেশ করে যে ধর্ম, বুদ্ধিমানেদের জন্য তা গ্রহনীয় নয়। সুতরাং সর্বোত্তম ধর্ম হল সেটি, যা প্রকৃতই পরম কল্যাণকারক হয়। আমার মতে সেই ধর্ম হল বৈদিক সনাতন ধর্ম, যা নিম্নলিখিত রূপে শাস্ত্রে বলা হয়েছে।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সংপদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥

(গীতা ১৬।১-৩)

'সর্বতোভাবে নির্ভয় হওয়া, পূর্ণরূপে অন্তঃকরণের স্বচ্ছতা, তত্ত্বজ্ঞানের

জন্য ধ্যানযোগে নিরন্তর স্থিতি[১], সাত্ত্বিক দান[২], ইন্দ্রিয়াদি দম, ভগবৎ-পূজা, অগ্নিহোত্রাদি উত্তম কর্মের আচরণ, বেদ-শাস্ত্রাদি পঠন-পাঠনপূর্বক ভগবানের নাম-গুণ কীর্তন, স্বধর্ম পালনের জন্য কষ্ট স্বীকার, শরীর ও ইন্দ্রিয়সহ অন্তরের সারল্য, কায়-মনো-বাক্যে কাউকে কোনোরূপ কষ্ট না দেওয়া, যথার্থ এবং প্রিয় বাক্য বলা[৩], নিজের প্রতি অপরাধকারীর ওপরও রাগ না করা, কর্মে কর্তৃত্বের অহঙ্কার ত্যাগ করা, অন্তঃকরণের উপরাম বৃত্তি অর্থাৎ চিত্ত-চাঞ্চল্য না থাকা, কারো নিন্দা না করা, সর্বপ্রাণীতে অহেতুক দয়া, বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদির সংযোগ ঘটলেও আসক্ত না হওয়া, কোমলভাব, লোক ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণে লজ্জা, বৃথা চেষ্টার অভাব, তেজ[৪], ক্ষমা, ধৈর্য, শৌচ অর্থাৎ বাহ্যান্তর শুচি[৫], কারোকে শত্রুভাবে না দেখা, নিজের মধ্যে পূজ্যভাবের অহঙ্কার না থাকা—হে অর্জুন! এসবই হল দৈবীসম্পদ প্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ।'

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্॥

(মনুস্মৃতি ৬।৯২)

'ধৈর্য, ক্ষমা, মন নিগ্রহ, চুরি না করা, বাহ্য-আভ্যন্তর শুদ্ধি,

---

[১]পরমাত্মার তত্ত্ব যথার্থভাবে জানার জন্য সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপে একীভাবে ধ্যানের গাঢ় স্থিতির নামই 'ধ্যানযোগব্যবস্থিতি' বলে জানতে হবে।

[২]গীতা প্রেস থেকে প্রকাশিত গীতার ১৭ অধ্যায়ের ২০ শ্লোকের অর্থ দ্রষ্টব্য।

[৩]অন্তর ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা ঠিক করা হয়েছে, সেসবই প্রিয় বাক্যে বলার নাম সত্যভাষণ।

[৪]শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সেই শক্তিকে তেজ বলে, যার প্রভাবে তাঁর সামনে বিষয়াসক্ত ও নীচপ্রকৃতির মানুষও প্রায়শঃ অন্যায় আচরণ থেকে বিরত হয়ে শ্রেষ্ঠ কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

[৫]সত্যতাপূর্বক শুদ্ধ উপার্জনে অর্থ ও অন্ন আহারে এবং যথাযোগ্য ব্যবহারে আচরণ ও জল-মাটি দ্বারা শারীরিক শুদ্ধিকে বলে বাহ্য শুদ্ধি। রাগ-দ্বেষ-কপটাচরণ বিকার নাশ হয়ে অন্তঃকরণ শুদ্ধ ও স্বচ্ছ হওয়াকে বলে অভ্যন্তর শুদ্ধি।

ইন্দ্রিয়াদির সংযম, সাত্ত্বিক বুদ্ধি, অধ্যাত্মবিদ্যা, যথার্থ বাক্য বলা এবং ক্রোধ না করা—ধর্মের এই হল দশটি লক্ষণ।'

'অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ।' (যোগদর্শন ২।৩০)

'অহিংসা, সত্যভাষণ, চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য পালন এবং ভোগসামগ্রী সংগ্রহ না করা—এই হল পাঁচ প্রকারের যম।

'শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।' (যোগদর্শন ২।৩২)

'বাহ্যান্তর পবিত্রতা, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় এবং সর্বস্ব ঈশ্বরকে নিবেদন করা—নিয়ম হল এই পাঁচপ্রকারের।' এগুলি সব নিষ্কামভাবে পালন করাই হল প্রকৃত ধর্মাচারণ।

ধর্মের এটিই সর্বোত্তম লক্ষণ, এর সাহায্যেই পরমপদ প্রাপ্তি হয়। সুতরাং যিনি অন্তর থেকে মানুষমাত্রেরই সেবা করতে চান, তাঁর পক্ষে এই হল উচিত যে তিনি উপরোক্ত লক্ষণযুক্ত ধর্মকেই উন্নতির পরম-সাধন জ্ঞান করে নিজে সেটিই আচরণ করবেন এবং নিজ দৃষ্টান্ত ও যুক্তিদ্বারা এই ধর্মের মহত্ত্ব জানিয়ে মানুষ মাত্রেরই হৃদয়ে এরূপ আচরণের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন করে তুলবেন। বাস্তবে এই হল সত্যকার ধর্ম প্রচার এবং এর সাহায্যেই লৌকিক অভ্যুদয়ের সঙ্গে দেশ-কালের অবধি অতিক্রম করে মুক্তিরূপ পরম কল্যাণ হওয়া সম্ভব। এই স্থিতি লাভ করে নিলে পুরুষ দুঃখরূপ সংসার সমুদ্রে আর ফিরে আসেন না। এরূপ পুরুষদের জন্যই শ্রুতি বলে থাকেন—

'ন চ পুনরাবর্ততে ন চ পুনরাবর্ততে।' (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৮।১৫।১)

এই পরম আনন্দের নিত্য ও মধুর আস্বাদ মানুষমাত্রকে সুলভ করাবার জন্য বৈদিক সনাতন ধর্মের প্রচার করার চেষ্টা প্রতিটি মানুষেরই বিশেষভাবে করা উচিত।

কিছু ব্যক্তির অভিমত হল যে স্বরাজ্য (স্ব-শাসনক্ষমতা) এবং বিপুল অর্থের অভাবের জন্য ধর্মপ্রচার করা সম্ভব হয় না। কিন্তু আমার মনে হয় এই তাদের এই ধারণা সর্বতোভাবে ঠিক নয়। রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্তির দ্বারা ধর্মপ্রচারে সাহায্য লাভ হতে পারে, কিন্তু একথা ঠিক নয় যে স্বরাজ্যের অভাবে

ধর্মপ্রচার করাই সম্ভব নয়। ধর্মপালনের সাহায্যে বিশাল আত্মিক (আধ্যাত্মিক) স্বরাজ্য সাহায্য লাভ করা সম্ভব, তাহলে এই সাধারণ স্বরাজ্যের আর কথাই কী। সেটি তো অনায়াসেই প্রাপ্ত করা সম্ভব।

ধর্মপ্রচারের জন্য অর্থের প্রয়োজনীয়তা নেই, আংশিকভাবে এতে কিছু সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। এরজন্য প্রধান প্রয়োজন হল সত্যকার ত্যাগী এবং ধর্মজ্ঞ প্রচারকের। এরূপ ব্যক্তি মান, যশ, অহঙ্কার ও স্বার্থ ত্যাগ করে কোমর বেঁধে ধর্মপ্রচারের জন্য প্রস্তুত হলে তখন অর্থ আদি কোনো বস্তুর ঘাটতি থাকতেই পারে না। বরং তিনি তাঁর প্রতিপক্ষের ব্যক্তিদেরও প্রেমের দ্বারা জয় করে তাঁদের বন্ধু করে তুলতে পারেন। শুধুমাত্র সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য লোভ দেখিয়ে বা ধমক-চমক দিয়ে কারো ধর্ম পরিবর্তন করানো হলে প্রকৃতপক্ষে তাতে তার বিশেষ কোনো হিতসাধন হয় না এবং এইভাবে স্বার্থ-যুক্ত ধর্মপ্রচারের দ্বারা প্রচারকেরও বিশেষ কোনো লাভ হয় না। মানুষ যখন ধর্মের মহত্ত্ব ভালোভাবে বুঝে তা পালন করে এবং তাঁর তার থেকে অপূর্ব আনন্দ ও পরম শান্তি অনুভব করার পরই যখন জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবদ্ধ অশান্ত, দুঃখী জীবেদের দুঃখজনক অবস্থা দেখে করুণার্দ্র হৃদয়ে তাঁদের শান্ত ও সুখী করার জন্য চেষ্টা করেন, তখনই সেটি হয় প্রকৃত ধর্মপ্রচার।

অত্যন্ত দুঃখের কথা হল যে অপার আনন্দের এমন প্রত্যক্ষ সাগর থাকলেও মানুষ দুঃখরূপ সংসার সাগরে মগ্ন হয়ে ভয়ানক দুঃখভোগ করে। মৃগতৃষ্ণায় পরিশ্রান্ত ও ব্যাকুল মৃগরা যেমন গঙ্গার তীরে থেকেও জলতৃষ্ণায় কাতর হয়ে ছট্‌ফট্ করে মারা যায়, আমার বন্ধুরাও তেমনি দশা প্রাপ্ত হতে থাকে।

সত্য ধর্ম পালন করলে যে অপার আনন্দ লাভ হয় সেটি না বোঝার জন্যই মানুষ এই দশা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এইসব লোকের দুঃখজনক অবস্থা বুঝে তাঁদের বৈদিক-সনাতন-ধর্মের তত্ত্ব বোঝাবার চেষ্টা করলে তাঁদের উপকার ও শোধরানো যেতে পারে। এই ধর্ম সম্বন্ধে জানাবার জন্য আমাদের এখানে অনেক এমন গ্রন্থ আছে, যেগুলি মনন ও অনুশীলন করা সহজসাধ্য নয়। অতএব এমন এক গ্রন্থ অবলম্বন করা উচিত, যা সরলতার সঙ্গে মানুষকে সেই

পবিত্র পথে নিয়ে যেতে পারে। আমার মনে হয় সেই পবিত্র গ্রন্থ হল **'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'**। অত্যন্ত সহজ বাক্যে কঠিনতম সিদ্ধান্ত বোঝানো, সর্বপ্রকার মানুষকে তাঁদের অধিকারানুযায়ী পথ দেখানো, সত্য ধর্মের পথ প্রদর্শক, পক্ষপাত ও স্বার্থবর্জিত উপদেশের অপূর্ব সংগ্রহের এ এক সার্বভৌম মহান্ গ্রন্থ। জগতের অধিকাংশ মহানুভব ব্যক্তি এই কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। গীতায় এমন বহু শ্লোক আছে[১] যার মাত্র একটিকে পূর্ণরূপে ধারণ করলে মানুষ মুক্ত হতে পারেন, তাহলে সম্পূর্ণ গীতা সম্বন্ধে আর বলার কী আছে !

সুতরাং যেসব ব্যক্তির ধর্মের বিপুল গ্রন্থরাশি দেখার পুরো সময় বা সুযোগ থাকে না, তাঁদের অর্থসহ গীতা অবশ্যই অধ্যয়ন করা উচিত। সেই সঙ্গে এর উপদেশ পালনেও তৎপর হতে হবে। মনুষ্য মাত্রেরই মুক্তিতে অধিকার আছে আর গীতা হল মুক্তির পথ দেখানোর এক প্রধান গ্রন্থ। সেইজন্যই পরমেশ্বরে ভক্তি ও শ্রদ্ধাযুক্ত সকল ব্যক্তিরই এটি পাঠ করার অধিকার আছে। ভগবান গীতা প্রচারের জন্য কোনো দেশ, কাল, জাতি ও ব্যক্তিবিশেষের জন্য কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেননি, উপরন্তু তাঁর ভক্তদের মধ্যে গীতাপ্রচারকারীকে সব থেকে শ্রেষ্ঠ বড় ভক্ত-প্রেমিক বলে জানিয়েছেন।

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥

(গীতা ১৮।৬৮)

'যে ব্যক্তি আমাকে পরম প্রেম-ভক্তি করে এই পরম রহস্য-সংবলিত গীতাশাস্ত্র আমার ভক্তদের জানাবেন অর্থাৎ নিষ্কামভাবে প্রেমসহ আমার ভক্তদের পাঠ করাবেন অথবা অর্থের ব্যাখ্যা দ্বারা এর প্রচার করবেন, তিনি নিঃসন্দেহে আমাকে প্রাপ্ত হবেন।'

---

[১]যেমন গীতার অধ্যায় ২।৭১, ৩।৩০, ৪।৩৪, ৫।২৯, ৬।৪৭, ৭।১৪, ৮।১৪, ৯।৩২, ১০।৯, ১০, ১১।৫৪, ৫৫, ১২।৮, ১৩।১০, ১৪।১৯, , ২৬, ১৫।১৯, ১৬।১, ১৭।১৬, ১৮।৬৫, ৬৬ইত্যাদি।

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥
(১৮।৬৯)

'এর থেকে বড় আমার অত্যন্ত প্রিয়কার্যকারী মানুষের মধ্যে আর কেউ নেই এবং এর থেকে শ্রেষ্ঠ আমার প্রিয় এই পৃথিবীতে কেউ হবেনও না।'

অতএব সকল দেশের সর্বজাতির মধ্যে গীতাশাস্ত্রের প্রচার অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে করা উচিত। একমাত্র গীতার বর্ণিত পথেই পৃথিবীর মানুষমাত্রই উদ্ধার লাভ করতে সক্ষম। তাই এই গীতা ধর্ম প্রচার করতে সকলের যত্নশীল হওয়া উচিত। এর দ্বারাই সকলে আত্যন্তিক সুখলাভ করতে সক্ষম। এই হল এক অতি সহজ, সরল প্রধান উপায়।

~~○~~

(১২) ত্যাগের দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তি

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥

গৃহস্থ আশ্রমে থেকেও মানুষ ত্যাগের দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম হন। পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য 'ত্যাগ'ই প্রকৃত সাধন। সুতরাং সাত শ্রেণীতে ভাগ করে সংক্ষেপে ত্যাগের লক্ষণ জানানো হচ্ছে।

(১) নিষিদ্ধ কর্মসমূহ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ।

চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাচার, ছল-কপট, জোরজুলুম, হিংসা, অখাদ্য খাওয়া, প্রমাদ ইত্যাদি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নীচ-কর্ম কায়-মনো-বাক্যে কোনোপ্রকারে

না করা, এইগুলি হল প্রথম শ্রেণীর ত্যাগ।

(২) কাম্য কর্মাদির ত্যাগ।

স্ত্রী, পুত্র, ধন ইত্যাদি প্রিয়বস্তু প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এবং রোগসঙ্কট ইত্যাদি নিবৃত্তির জন্য করা যজ্ঞ, দান, তপ ও উপাসনা ইত্যাদি সকাম কর্মাদি নিজ স্বার্থের জন্য না করা[১], এ হল দ্বিতীয় শ্রেণীর ত্যাগ।

(৩) সর্বতোপ্রকারে তৃষ্ণা ত্যাগ করা।

অহঙ্কার, মান, প্রতিষ্ঠা এবং স্ত্রী, পুত্র ও ধন ইত্যাদি যা কিছু অনিত্য বস্তু প্রারব্ধানুসারে (ভাগ্যবশতঃ) লাভ হয়েছে, সেগুলি বৃদ্ধি করার ইচ্ছাকে ভগবদ্প্রাপ্তির অন্তরায় মনে করে, সেগুলি ত্যাগ করা, এ হল তৃতীয় শ্রেণীর ত্যাগ।

(৪) স্বার্থের জন্য অপরের দ্বারা সেবা করানোর ত্যাগ।

নিজ সুখের জন্য কারো দ্বারা ধন ইত্যাদি পদার্থের বা সেবা করাবার আকাঙ্ক্ষা করা এবং আকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকে প্রদত্ত বস্তুসমূহ বা সেবা করা স্বীকার করে নেওয়া অথবা কোনোভাবে কারো দ্বারা নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করার চিন্তা মনে রাখা, বা স্বার্থের জন্য অপরের দ্বারা সেবা করাবার ভাব—এসব ত্যাগ করা[২] হল চতুর্থ শ্রেণীর ত্যাগ।

---

[১]যদি ঘটনাক্রমে কোনো লৌকিক বা শাস্ত্রীয় কর্ম উপস্থিত হয়, যা স্বরূপতঃ সকাম হলেও সেটি না করলে কেউ দুঃখ পায় বা কর্ম উপাসনার পরম্পরাতে কোনো প্রকার বাধার সৃষ্টি হয়, তবে স্বার্থত্যাগ করে শুধুমাত্র লোকসংগ্রহের উদ্দেশ্যে সেই কর্ম করলে সেটি সকাম কর্ম হয় না।

[২]যদি এমন কোনো পরিস্থিতি হয় যাতে শারীরিক সেবা অথবা আহার পদার্থ স্বীকার না করলে কেউ কষ্ট পায় বা লোকশিক্ষাতে কোনোরূপ বাধা আসে, তাহলে সেই সময় স্বার্থ ত্যাগ করে কেবল তার প্রীতির জন্য সেবা ইত্যাদি স্বীকার করে নেওয়া দূষণীয় নয় ; কারণ স্ত্রী, পুত্র ও পরিচারক ইত্যাদির দ্বারা সেবা এবং বন্ধু, বান্ধব অথবা আত্মীয় পরিজনের দেওয়া আহারাদি গ্রহণ না করলে তাদের কষ্ট হয় এবং লোক-মর্যাদাতে বাধা পড়তে পারে।

(৫) সমস্ত কর্তব্যকর্মে আলস্য এবং ফলের আকাঙ্ক্ষার সর্বতোভাবে ত্যাগ।

ঈশ্বর-ভক্তি, দেবপূজা ও অর্চনা, মাতা-পিতা ও গুরুজনদের সেবা, যজ্ঞ, দান, তপ এবং বর্ণাশ্রম অনুসারে জীবিকা দ্বারা পরিবার প্রতিপালন এবং শারীরিক আহার-বিহার ইত্যাদি যেসব কর্তব্য-কর্ম থাকে, সেসবে আলস্য ও সর্বপ্রকার কামনা ত্যাগ করা।

ক) ঈশ্বর-ভক্তিতে আলস্য ত্যাগ।

নিজ জীবনের পরম কর্তব্য মনে করে পরম দয়ালু, সকলের সুহৃদ্, পরম প্রেমী, অন্তর্যামী পরমেশ্বরের গুণ, প্রভাব ও প্রেমের রহস্যময় কথা শ্রবণ, মনন ও পঠন-পাঠন করা এবং আলস্য ত্যাগ করে উৎসাহ সহকারে তাঁর পবিত্র নাম ধ্যানযুক্ত হয়ে নিরন্তর জপ করা।

খ) ঈশ্বর-ভক্তিতে কামনা ত্যাগ।

ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত ভোগকে ক্ষণভঙ্গুর, বিনাশশীল ও ভগবানের ভক্তির বাধক মনে করে কোনো বস্তু প্রাপ্তির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা বা মনের ইচ্ছা পোষণ করা এবং কোনো সঙ্কটের উদ্ভব হলে তা নিবারণ করার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা উচিত নয় অর্থাৎ অন্তরে এমনভাব রাখতে হয় যে, যদি প্রাণও চলে যায় তবুও এই অসার জীবনের জন্য বিশুদ্ধ ভক্তিতে কলঙ্ক লেপন করা উচিত নয়। ভক্ত প্রহ্লাদ যেমন পিতাদ্বারা উৎপীড়িত হয়েও নিজের কষ্ট নিবারণের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেননি।

নিজের অনিষ্টকারীদের প্রতিও ‘ভগবান তোমায় শাস্তি দেবেন’ ইত্যাদি কোনোপ্রকার কঠিন ভাষায় অভিশাপ না দেওয়া এবং মনেও তাঁদের অনিষ্ট কামনা না করা।

ভগবদ্-ভক্তির অভিমানবশতঃ কারোকে বরদানও করা উচিত নয়, যেমন ‘ভগবান তোমাকে ভালো রাখুন’, ‘ভগবান তোমার দুঃখ দূর করুন’, ‘ভগবান তোমাকে দীর্ঘায়ু করুন’ ইত্যাদি ইত্যাদি।

পত্র লেখনেও সকাম শব্দ লেখা উচিত নয়। সাংসারিক বস্তুর জন্য

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার রেওয়াজ বিভিন্ন সমাজে রয়েছে, তা না লিখে 'শ্রীপরমাত্মদেব আনন্দরূপ সর্বত্র বিরাজমান', 'শ্রীপরমেশ্বরের ভজনই সারবস্তু' ইত্যাদি নিষ্কাম মাঙ্গলিক শব্দ লেখা এবং এছাড়া অন্য কোনোভাবেও লেখা, বলা ইত্যাদিতে সকাম শব্দ প্রয়োগ না করা।

গ) দেবপূজায় আলস্য ও কামনা-ত্যাগ।

শাস্ত্র মর্যাদা বা লোক মর্যাদায় পূজ্য দেবতাদের পূজাকালে তাঁদের পূজার জন্য ভগবানের আদেশ রয়েছে। ভগবানের আদেশ পালন করা পরম কর্তব্য, এই মনে করে উৎসাহ সহকারে নিয়মমতো তাঁদের পূজা করা এবং তাঁদের কাছে কোনো প্রকার কামনা না করা।

তাঁদের পূজার উদ্দেশ্যে কোনো কিছুতে সকাম শব্দ না লেখা অর্থাৎ বিভিন্ন সমাজে-বর্ণে নতুন বছরের দিন অথবা দীপাবলির দিন শ্রীলক্ষ্মীমাতার পূজা করে নানাপ্রকার বহু সকাম শব্দ লেখা হয় যেমন মা লক্ষ্মীর ভরসা, মা-কালী ধন-ধন্যা পূর্ণ করুন, মা গঙ্গা সহায় ইত্যাদি ইত্যাদি। তা না লিখে 'শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সর্বত্র আনন্দরূপে বিরাজমান' এবং 'অনেক আনন্দ ও উৎসাহপূর্বক শ্রীলক্ষ্মীর পূজা করা হয়েছে' ইত্যাদি নিষ্কাম মাঙ্গলিক শব্দ লেখা উচিত এবং প্রতিদিনের জাবেদা, খতিয়ান লেখার প্রারম্ভে এরূপ লেখা উচিত।

ঘ) মাতা-পিতা-গুরুজনদের সেবায় আলস্য ও কামনার ত্যাগ।

মাতা-পিতা-আচার্য এবং আরও যে পূজনীয় ব্যক্তি বর্ণ, আশ্রম, অবস্থা ও গুণে কোনোভাবে নিজের থেকে বড়ো, তাঁদের সকলকে সর্বপ্রকারে নিত্য সেবা করা ও নিত্য প্রণাম করা মানুষের পরম কর্তব্য, এইভাব হৃদয়ে রেখে সর্বপ্রকারে আলস্য ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে উৎসাহপূর্বক ভগবদ্ আজ্ঞা অনুসারে তাঁদের সেবায় তৎপর থাকা।

ঙ) যজ্ঞ-দান-তপ ইত্যাদি শুভকর্মে আলস্য ও কামনার ত্যাগ।

পঞ্চ মহাযজ্ঞ[১] নিত্য কর্ম এবং অন্যান্য নিত্য কর্মরূপ যজ্ঞ করা এবং

---

[১]পঞ্চ মহাযজ্ঞ হল, দেবযজ্ঞ (অগ্নিহোত্রাদি), ঋষিযজ্ঞ (বেদপাঠ, সন্ধ্যা, গায়ত্রীজপ), পিতৃযজ্ঞ (তর্পণ শ্রাদ্ধাদি), মনুষ্যযজ্ঞ (অতিথিসেবা) ও ভূতযজ্ঞ (বলিবৈশ্য)।

অন্ন-বস্ত্র-বিদ্যা-ঔষধ-অর্থ পদার্থসমূহের দান দ্বারা সমস্ত জীবের যথাযোগ্য সুখ প্রদান করার জন্য কায়মনোবাক্যে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করা তথা নিজ ধর্ম পালনের জন্য সর্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করা ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত কর্মে ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত ভোগের কামনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করে এবং নিজের পরম কর্তব্য মনে করে শ্রদ্ধাসহ উৎসাহপূর্বক ভগবদাজ্ঞানুসারে শুধুমাত্র ভগবদর্থেই আচরণ করা।

চ) জীবিকা দ্বারা পরিবার-প্রতিপালনের জন্য উপযুক্ত কর্মে আলস্য ও কামনার ত্যাগ

জীবিকার জন্য কর্ম, যেমন বৈশ্যের জন্য কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য ইত্যাদি কর্ম বলা হয়েছে, তেমনই শাস্ত্রে নিজ নিজ বর্ণ-আশ্রম অনুযায়ী যে কর্মের বিধান করা হয়েছে, সেই সব পালন করে সংসারের হিতসাধন করতঃ পরিবার প্রতিপালনের জন্য ভগবানের নির্দেশ রয়েছে। তাই নিজ কর্তব্য মনে করে লাভ-ক্ষতিকে সমান মনে করে সর্বপ্রকার কামনা ত্যাগ করে উৎসাহপূর্বক সেই সকল কর্ম করা।[১]

ছ) শরীর-সম্বন্ধীয় কর্মে আলস্য এবং কামনার ত্যাগ।

শরীর নির্বাহের জন্য শাস্ত্রোক্ত রীতিতে আহার, পরিধেয় এবং ঔষধ গ্রহণরূপ শরীর সম্বন্ধীয় যেসব কর্ম আছে, তাতে সর্বপ্রকার ভোগবিলাসের কামনা ত্যাগ করে এবং সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি ও জীবন-মরণ ইত্যাদিকে সমান মনে করে শুধুমাত্র ভগবদ্-প্রাপ্তির জন্যই যোগ্যতা অনুসারে সেগুলির পালন করা।

---

[১]উপরোক্ত ভাবে কৃত পুরুষের কর্ম লোভবর্জিত হওয়ায় তাঁর মধ্যে কোনোপ্রকার দোষ আসতে পারে না ; কারণ জীবিকাকর্মে লোভই বিশেষভাবে পাপের হেতু হয়ে থাকে। তাই মানুষের উচিত 'গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর' থেকে প্রকাশিত গীতার ভাষ্য টীকাতে ১৮ অধ্যায়ের ৪৪ শ্লোকের টিপ্পনীতে যেমনভাবে বৈশ্যদের বাণিজ্য দোষ ত্যাগ করার জন্য বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে, তেমনই নিজ নিজ বর্ণ-আশ্রম অনুসারে সমস্ত কর্মের সর্বপ্রকার দোষ ত্যাগ করে কেবল ভগবানের আদেশ মনে করে ভগবানের জন্য নিষ্কামভাবেই সেগুলির আচরণ করা।

পূর্বোক্ত চারশ্রেণীর ত্যাগসহ এই পঞ্চম শ্রেণীর ত্যাগানুসারে সমস্ত দোষ এবং সর্বপ্রকার কামনা নাশ হয়ে শুধু এক ভগবদ্প্রাপ্তির তীব্র ইচ্ছা হওয়া জ্ঞানের প্রথম ভূমিকাতে পরিপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ বলে জানতে হবে।

(৬) জগৎ সংসারের সমস্ত পদার্থ ও কর্মে মমতা ও আসক্তিকে সর্বতোভাবে ত্যাগ

অর্থ, প্রাসাদ ও বস্ত্র ইত্যাদি সমস্ত বস্তু এবং স্ত্রী-পুত্র-বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি সমস্ত আত্মীয়-পরিজন ও মান-মর্যাদা-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ইহলোক ও পরলোকের যতো বিষয়ভোগরূপ উপাদান আছে, সেই সমস্তকে ক্ষণভঙ্গুর ও বিনাশশীল মনে করে, অনিত্য ভেবে তাতে মমত্ববোধ ও আসক্তি না রাখা এবং শুধুমাত্র এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতেই অনন্যভাবে বিশুদ্ধ প্রেম হওয়ায় কায়-মনো-বাক্যে হওয়া সমস্ত ক্রিয়াতে এবং শরীরেও মমতা এবং আসক্তি সর্বতোভাবে বিনাশ হয়ে যাওয়া, এই হল ষষ্ঠ শ্রেণীর ত্যাগ[১]।

উক্ত ষষ্ঠ শ্রেণীর ত্যাগী পুরুষদের সংসারের সমস্ত পদার্থে বৈরাগ্য হয়ে কেবল একমাত্র পরম প্রেমময় ভগবানেই অনন্যপ্রেম হয়ে যায়। তাই তাঁদের ভগবানের গুণ-প্রভাব-রহস্যপূর্ণ বিশুদ্ধ প্রেম-বিষয়ক কথা শোনা ও শোনানো এবং মনন করা আর নির্জন স্থানে বাস করে ভগবানের ভজন-ধ্যান এবং শাস্ত্রের মর্ম বিচার করতে প্রিয় লাগে। বিষয়াসক্ত মানুষদের মধ্যে থেকে হাস্য-বিলাস-প্রমাদ-নিন্দা-বিষয়ভোগ ও বৃথা কথাবার্তায় নিজ অমূল্য সময়ের এক মুহূর্তও ব্যয় করা তাঁদের পছন্দ নয় এবং তাঁদের সমস্ত কর্তব্য-কর্ম ভগবানের স্বরূপ ও নামের মননপূর্বক বিনা আসক্তিতে

---

[১]সমস্ত পদার্থে ও কর্মাদিতে তৃষ্ণা ও ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগের কথা তৃতীয় এবং পঞ্চম শ্রেণীর ত্যাগে বলা হয়েছে কিন্তু উল্লিখিত ত্যাগ হলেও তাঁর মধ্যে মমত্ববোধ এবং আসক্তি অবশিষ্ট থেকে যায়। যেমন ভজন, ধ্যান ও সৎসঙ্গের অভ্যাসদ্বারা ভরতমুনির সমস্ত পদার্থে ও কর্মে তৃষ্ণা ও ফলাকাঙ্ক্ষা দূর হলেও হরিণে এবং হরিণের পালনরূপ কর্মে মমতা ও আসক্তি থেকে গিয়েছিল। তাই জগতের সমস্ত পদার্থে ও কর্মে মমতা ও আসক্তি ত্যাগকে ষষ্ঠ শ্রেণীর ত্যাগ বলা হয়েছে।

শুধু ভগবদর্থ হয়ে থাকে।

এই সর্বপদার্থে ও কর্মে মমতা ও আসক্তি সর্বতোভাবে ত্যাগ হয়ে কেবল সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাতেই বিশুদ্ধ প্রেমের উদয় হওয়া জ্ঞানের দ্বিতীয় ভূমিকাতে পরিপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত পুরুষদের লক্ষণ বলে জানতে হবে।

(৭) সংসার, শরীর এবং সমস্ত কর্মে সূক্ষ্ম বাসনা এবং অহংভাবের সর্বতোরূপে ত্যাগ

জগতের সমস্ত পদার্থ মায়ার কার্য হওয়ায় সর্বতোভাবে অনিত্য এবং এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাই সর্বত্র সমভাবে পরিপূর্ণ ; এরূপ দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত হয়ে শরীরসহ জগতের সমস্ত পদার্থে এবং সম্পূর্ণ কর্মে সূক্ষ্ম বাসনা সর্বদা ত্যাগ করা অর্থাৎ অন্তঃকরণে তার লেশমাত্র সংস্কারও না থাকা এবং শরীরে অহংভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে কায়-মনো-বাক্যে হওয়া সমস্ত কর্মে কর্তৃত্বভাব না থাকা, এই হল সপ্তম শ্রেণীর ত্যাগ।[১]

এই সপ্তম শ্রেণীর ত্যাগরূপ পর-বৈরাগ্য[২] প্রাপ্ত পুরুষদের অন্তরের বৃত্তিগুলি সমস্ত সংসার থেকে উপরত হয়ে যায়। যদি কোনো কালে কোনো সাংসারিক স্ফুরণ হয়, তবু তার সংস্কার থাকে না। কারণ তাঁদের এক সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেব পরমাত্মাতেই অনন্যভাবে গভীর স্থিতি নিরন্তর বজায় থাকে।

তাই তাঁদের অন্তঃকরণে সমস্ত অপগুণ বিনাশ হয়ে (১) অহিংসা,

---

[১]জগতের সমস্ত পদার্থ ও কর্মে তৃষ্ণা ও ফলাকাঙ্ক্ষা এবং মমতা ও আসক্তি সর্বদা দূর হলেও তাতে সূক্ষ্মবাসনা ও কর্তৃত্ব অভিমান বাকী থেকে যায়। তাই সূক্ষ্ম বাসনা ও অহংভাবের ত্যাগকে সপ্তম শ্রেণীর ত্যাগ বলা হয়েছে।

[২]পূর্বোক্ত ষষ্ঠ শ্রেরীর ত্যাগী পুরুষের বিষয় সংসর্গ হওয়ায় কদাচিৎ তাঁর কিছু আসক্তি হতে পারে, কিন্তু এই সপ্তম শ্রেরীর পুরুষের বিষয়ের সঙ্গে সংসর্গ হলেও তাঁর আসক্তি হতে পারে না। কারণ তাঁর মনে এক পরমাত্মা বিনা অন্য কিছু থাকেই না, তাই একে পরবৈরাগ্য বলা হয়।

(১) কায়-মনো-বাক্যে কারোকে কোনো প্রকার কষ্ট না দেওয়া।

(২) সত্য, (৩) অস্তেয়, (৪) ব্রহ্মচর্য, (৫) অপৈশুনতা, লজ্জা, (৬) অমানিত্ব, নিষ্কপটতা, (৭) শৌচ, (৮) সন্তোষ, (৯) তিতিক্ষা, সৎসঙ্গ, সেবা, যজ্ঞ, দান, (১০) তপ, (১১) স্বাধ্যায়, (১২) শম, (১৩) দম, বিনয়, (১৪) আর্জব, (১৫) দয়া, (১৬) শ্রদ্ধা, (১৭) বিবেক, (১৮) বৈরাগ্য, একান্তবাস, (১৯) অপরিগ্রহ, (২০) সমাধান, উপরামতা, (২১) তেজ,

---

(২) অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা ঠিক করা হয়েছে, তেমনই ঠিকভাবে প্রিয় শব্দে বলা।

(৩) চুরি না করা।

(৪) আট প্রকার মৈথুনের অভাব।

(৫) কারো নিন্দা না করা।

(৬) সৎকার, মান, পূজার আকাঙ্ক্ষা না করা।

(৭) অন্তর-বাহ্যের পবিত্রতা (সত্যতাপূর্বক শুদ্ধ ব্যবহারে দ্রব্য ও তার দ্বারা প্রাপ্ত অন্নদ্বারা আহারের ও যথাযোগ্য আচরণের এবং জল-মাটি দ্বারা শরীরিক শুদ্ধিকে বাহ্যিক শুদ্ধি বলে এবং রাগ, দ্বেষ, ছল, কপটাদি বিকার বিনাশ হয়ে অন্তর শুদ্ধ, স্বচ্ছ হওয়াকে ভিতরের শুদ্ধি বলা হয়।)

(৮) সর্বতোভাবে তৃষ্ণা না থাকা।

(৯) শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্বাদি সহ্য করা।

(১০) স্বধর্ম পালনের জন্য কষ্ট স্বীকার।

(১১) বেদ-সৎশাস্ত্র অধ্যয়ন ও ভগবানের নাম-গুণ কীর্তন।

(১২) মন বশীভূত হওয়া।

(১৩) ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত হওয়া।

(১৪) শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি-সহ অন্তঃকরণের সারল্য।

(১৫) দুঃখীদের জন্য করুণা।

(১৬) বেদ-শাস্ত্র-মহাত্মা-গুরু ও পরমেশ্বরের বাক্যে প্রত্যক্ষের ন্যায় বিশ্বাস।

(১৭) সদসৎ পদার্থের যথার্থ জ্ঞান।

(১৮) ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমগ্র পদার্থে আসক্তির অত্যন্ত অভাব।

(১৯) মমত্ববুদ্ধিপূর্বক সংগ্রহ না করা।

(২০) অন্তঃকরণে সংশয় ও বিক্ষেপের অভাব।

(২১) শ্রেষ্ঠ পুরুষের সেই শক্তি হল তেজ, যার প্রভাবে বিষয়াসক্ত ও নীচ প্রকৃতির মানুষও প্রায়শঃ পাপাচার বন্ধ করে তাঁর কথানুসারে শ্রেষ্ঠ কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

(২২) ক্ষমা, (২৩) ধৈর্য, (২৪) অদ্রোহ, (২৫) অভয়, নিরহংকারতা, (২৬) শান্তি এবং ঈশ্বরে অনন্য ভক্তি ইত্যাদি সদগুণগুলির আবির্ভাব স্বভাবতঃ স্বতঃই হয়ে যায়।

এইভাবে শরীরসহ সমস্ত পদার্থে ও কর্মে বাসনা ও অহংভাব সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপেই একীভাবে নিত্য নিরন্তর দৃঢ় স্থিতিতে থাকা জ্ঞানের তৃতীয় ভূমিকায় পরিপক্ক অবস্থাপ্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ বলা হয়েছে।

উপরোক্ত গুণগুলির মধ্যে কতকগুলি প্রথম ও দ্বিতীয় ভূমিকাতেই প্রাপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ গুণাদির আবির্ভাব প্রায়শঃ তৃতীয় ভূমিকাতেই হয়। কারণ এসবই ভগবৎ-প্রাপ্তির অতি নিকটে পৌঁছানো পুরুষদের লক্ষণ এবং ভগবৎ-স্বরূপের সাক্ষাৎ জ্ঞানের হেতু ; তাই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান প্রায়শঃ এই গুণগুলিকে গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (৭ থেকে ১১ শ্লোক অবধি) জ্ঞানের নামে এবং ষোড়শ অধ্যায়ে (১ থেকে ৩ শ্লোক অবধি) দৈবী সম্পদের নামে বলেছেন।

উক্ত গুণাবলীকে শাস্ত্রকারগণ সাধারণ ধর্ম বলে মনে করেছেন, তাই মনুষমাত্রেরই এতে অধিকার থাকে, সুতরাং উপরোক্ত সদ্গুণাদি নিজ হৃদয়ে আবির্ভূত করার জন্য ভগবানের শরণ নিয়ে সকলের বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত।

উপসংহার

এই লেখায় সাত শ্রেণীর ত্যাগ দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম পাঁচ শ্রেণীর ত্যাগ তো জ্ঞানের প্রথম ভূমিকার লক্ষণ এবং ষষ্ঠ

---

(২২) নিজের প্রতি অপরাধকারীকে কোনোপ্রকার দণ্ডদেবার ভাবনা না রাখা।

(২৩) অত্যন্ত বিপদেও নিজ স্থিতিতে অটুট থাকা।

(২৪) নিজের প্রতি দ্বেষাভিমানীর জন্যও দ্বেষ না রাখা।

(২৫) সর্বতোভাবে ভয় ত্যাগ করা।

(২৬) ইচ্ছা ও বাসনা একেবারেই না থাকা ও অন্তঃকরণে সর্বদা প্রসন্নভাব বজায় রাখা।

শ্রেণী পর্যন্ত ত্যাগ দ্বিতীয় ভূমিকার লক্ষণ এবং সপ্তম শ্রেণীর ত্যাগ তৃতীয় ভূমিকার লক্ষণ বলা হয়েছে। উক্ত তৃতীয় ভূমিকার পরিপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত পুরুষ তখনই সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাকে লাভ করেন। তখন তাঁর আর এই ক্ষণভঙ্গুর, বিনাশশীল, অনিত্য জগৎ-সংসারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না, অর্থাৎ স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির স্বপ্নের জগতের সঙ্গে যেমন কোনো সম্পর্ক থাকে না, তেমনই অজ্ঞান নিদ্রা থেকে জাগ্রত পুরুষেরও মায়ার কার্যরূপ এই অনিত্য সংসারের সঙ্গে কোনই সম্বন্ধ থাকে না। যদিও লোকদৃষ্টিতে সেই জ্ঞানী পুরুষের শরীর দ্বারা সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম সম্পূর্ণ হতে দেখা যায় এবং তাঁর কর্মদ্বারা সংসারের অনেক উন্নতি সাধন হয়ে থাকে ; কারণ কামনা, আসক্তি এবং অহং-অভিমান রহিত হওয়ায় সেই মহাত্মার কায়-মনো-বাক্যে করা আচরণ লোকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করে এবং ঐসব পুরুষদের ভাবের দ্বারাই শাস্ত্র সৃজন হয় কিন্তু এইসব হলেও সেই সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেবকে প্রাপ্ত করা পুরুষ এই ত্রিগুণময়ী মায়ার থেকে সর্বতোভাবে অতীতই হন। তাই তিনি গুণাদির কার্যরূপ প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও নিদ্রা ইত্যাদি প্রাপ্ত হলেও তাতে দ্বেষ করেন না এবং নিবৃত্ত হলেও তার আকাঙ্ক্ষা করেন ; কারণ সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, মান-অপমান ও নিন্দা-স্তুতি ইত্যাদিতে এবং মাটি-পাথর-সোনা ইত্যাদি সর্বত্রই তাঁর সমভাব হয়ে যায়। তাই সেই মহাত্মার কোনো প্রিয় বস্তু প্রাপ্তি ও অপ্রিয় বস্তুর নিবৃত্তিতে হর্ষ হয় না এবং অপ্রিয় প্রাপ্তি ও প্রিয় বস্তুর বিরহে বিষাদ অনুভূত হয় না। যদি সেই ধীর পুরুষের শরীর কোনো কারণে শাণিত অস্ত্র দ্বারা কাটা হয় বা তাঁর জীবনে কোনো ভয়ঙ্কর দুঃখ উপস্থিত হয় তাহলেও সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেবে অনন্যভাবে স্থিত হওয়া সেই পুরুষ প্রফুল্লচিত্তে দিনযাপন করেন। কারণ তাঁর অন্তঃকরণে সমস্ত জগৎ মৃগতৃষ্ণার জলের ন্যায় প্রতীত হয় এবং এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই প্রতিফলিত হয় না। বিশেষ আর কী বলা যায়, বাস্তবে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাপ্রাপ্ত পুরুষের ভাব তিনিই স্বয়ং জানেন। মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়দ্বারা তা প্রকাশ করার কারোই সামর্থ্য নেই। তাই যত শীঘ্র সম্ভব অজ্ঞাননিদ্রা থেকে জেগে উঠে উক্ত সাত শ্রেণীতে বর্ণিত ত্যাগ দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার জন্য

সন্ত পুরুষের কারণগ্রহণ করে তাঁর কথানুসারে সাধন করার জন্য তৎপর হওয়া উচিত। কারণ এই দুর্লভ মনুষ্যদেহ বহু জন্মের পর ভগবদ্ কৃপাতে প্রাপ্ত হয়েছে। তাই বিনাশশীল, ক্ষণভঙ্গুর জগতের অনিত্য ভোগ্য বস্তুর উপভোগে নিজ জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

হরি ওঁ তৎসৎ হরি ওঁ তৎসৎ হরি ওঁ তৎসৎ

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

~~○~~

(১৩) বৈরাগ্য

বৈরাগ্যের মহত্ত্ব

কল্যাণ আকাঙ্ক্ষাকামী ব্যক্তির বৈরাগ্য সাধনের পরম আবশ্যকতা থাকে। বৈরাগ্য না হলে আত্মার উদ্ধার কখনও হয় না। প্রকৃত বৈরাগ্যে সাংসারিক ভোগ পদার্থের প্রতি বিরাগ উৎপন্ন হয়। বিরাগের থেকে পরমেশ্বরের স্বরূপের যথার্থ ধ্যান হয়। ধ্যানের সাহায্যে পরমাত্মার স্বরূপের বাস্তবিক জ্ঞান হয়। জ্ঞান থেকে উদ্ধার লাভ হয়। যাঁরা জ্ঞান-সম্পাদন করে মুক্তিতে বৈরাগ্য এবং উপরামতার কোনো প্রয়োজন বোঝেন না, তাঁদের মুক্তি প্রকৃতপক্ষে মুক্তি না হয়ে শুধু ভ্রমই হয়ে থাকে। বৈরাগ্য-উপরামবৃত্তি-বর্জিত জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নয়, তা হল কেবল বাচিক ও শাস্ত্রীয় জ্ঞান, যার ফল মুক্তি নয়, বরং আরও কঠিন বন্ধন হয়ে থাকে। তাই শ্রুতিতে বলা হয়েছে—

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াঁ্রতাঃ॥

(ঈশ.ম.৯)

'যিনি অবিদ্যার উপাসনা করেন, তিনি অন্ধকারে প্রবেশ করেন এবং

যিনি বিদ্যায় রত, তিনি তার থেকেও বেশি অন্ধকারে প্রবেশ করেন।' এইরূপ বাচিক জ্ঞানী নির্ভয়ে বিষয়-ভোগে প্রবৃত্ত হন, তিনি পাপকেও পাপ মনে করেন না, তাইজন্য তিনি বিষয়-রূপ পঙ্কে আবদ্ধ হয়ে পতিত হয়ে থাকেন। এরূপ ব্যক্তিদের জন্যই এই উক্তি প্রসিদ্ধ—

ব্রহ্মজ্ঞান জান্যো নহীঁ, কর্ম দিয়ে ছিটকায়।
তুলসী ঐসী আত্মা, সহজ নরক মহঁ জায়॥

বাস্তবে জ্ঞানের নামে মহা অজ্ঞান গ্রহণ করা হয়। অতএব প্রকৃত কল্যাণ লাভে ইচ্ছুক সাধকের সত্যকার, দৃঢ় বৈরাগ্য অর্জন করা উচিত। কোনো সঙ্গবিশেষের নাম বৈরাগ্য নয়। কোনো কারণবশতঃ বা মূর্খতার জন্য স্ত্রী-পুত্র-পরিবার-অর্থ ত্যাগ করা, জমকালো বস্ত্র পরিধান করা, মস্তক মুণ্ডন করা, জটা রাখা অথবা অন্য কোনো বাহ্য চিহ্ন ধারণ করাকে বৈরাগ্য বলা হয় না। মনে মনে বিষয়ে রমণ করা এবং বাহ্যতঃ সাধু সাজা হল মিথ্যাচার—দম্ভ।

ভগবান বলেছেন—

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

(গীতা ৩।৬)

'যে মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয়কে হটতাপূর্বক রুদ্ধ করে ইন্দ্রিয় ভোগের চিন্তা করতে থাকে, তাঁকে মিথ্যাচারী বা দাম্ভিক বলা হয়।'

সম্প্রতি দম্ভ বহুভাবে বিস্তারিত হয়েছে। কিছু ব্যক্তি লোক ঠকাবার জন্য মৌন ধারণ করার নাটক করেন, কেউ আসন করে বসে থাকেন, কেউ ভস্ম মেখে ঘুরে বেড়ান, কেউ জটা রাখেন, কেউ ধুনী জ্বেলে যজ্ঞ করেন, **'উদরনিমিত্তং বহুকৃতবেষঃ।'**

এরমধ্যে কোনোটিই বৈরাগ্য নয়। আমার বক্তব্যের অভিপ্রায় এই নয় যে আমি স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজন-ধন-সম্পদ-শিখা-সূত্র ও কর্মগুলি স্বরূপতঃ (বাহ্যভাবে) ত্যাগ করাকে খারাপ মনে করছি। এও বোঝা উচিত নয় যে মৌনধারণ করা, আসনে বসা, ভস্ম মাখা, জটা ধারণ বা মস্তক মুণ্ডন ইত্যাদি অশাস্ত্রীয় বা নিন্দনীয় কর্ম। আমার বক্তব্য এ-ও নয় যে ঘর-সংসার ত্যাগ করে

এমন চিহ্ন ধারণকারী সকলেই পাষণ্ড। উপরোক্ত বক্তব্য কাউকে নিন্দা বা ঘৃণা করার জন্য নয়। আমার অভিপ্রায় হল সেই লোকগুলির প্রতি যাঁরা বৈরাগ্যের নামে পূজা পাওয়া ও সাধারণ মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের ঠকাবার জন্য নানাপ্রকার নাটক করেন। যেসব সাধক সংযমের জন্য, অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য, সাধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এসব করে থাকেন, তাঁদের সম্বন্ধে একথা বলা হয়নি। ভগবানও তাঁদের মিথ্যাচারী বলেছেন, যাঁরা বাহ্যতঃ সংযমের নাটক করে মনে মনে বিষয়ের চিন্তা করেন। যে ব্যক্তি তাঁর চিত্তবৃত্তিসমূহ ভগবদ্-চিন্তায় সমর্পণ করে প্রকৃত বৈরাগ্য বৃত্তির দ্বারা অন্তর-বাহির থেকে ত্যাগ করেন, সকল শাস্ত্রই তাঁর প্রশংসা করে থাকেন।

বৈরাগ্য অত্যন্ত গুহ্য বিষয়, এর বাস্তবিক তত্ত্ব সাংসারিক অনাসক্ত মহানুভব ব্যক্তিই জানেন। বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা সেই ব্যক্তির মধ্যেই পাওয়া যায় যিনি জীবন্মুক্ত মহাত্মা— যিনি পরমাত্মারসে অবগাহন করে বিষয়-রস থেকে নিজেকে সর্বতোভাবে মুক্ত করে নিয়েছেন।

ভগবান বলেছেন—

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥

(গীতা ২।৫৯)

‘ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিষয় গ্রহণে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হলেও, বিষয়াসক্তি নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু জীবন্মুক্ত ব্যক্তির আসক্তি পরমাত্মার সাক্ষাৎকারে নিবৃত্ত হয়ে যায়।’

এবার আমাদের বৈরাগ্যের স্বরূপ, তার প্রাপ্তির উপায়, বৈরাগ্যপ্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ এবং ফলের বিষয়ে কিছু আলোচনা করা উচিত। সাধনকালে বৈরাগ্য দুপ্রকারের হয়। গীতায় যাকে বৈরাগ্য ও দৃঢ়বৈরাগ্য, যোগদর্শনে বৈরাগ্য এবং পরবৈরাগ্য এবং বেদান্তে বৈরাগ্য ও উপরতি নামে বলা হয়েছে। যদিও উপরোক্ত তিনটিতেই পরস্পর শব্দ ও লক্ষ্যবস্তুতে কিছু কিছু পার্থক্য আছে, কিন্তু বহু অংশে সামঞ্জস্য রয়েছে। এখানে লক্ষ্য করাবার জন্য তিনটির উল্লেখ করা হয়েছে।

বৈরাগ্যের স্বরূপ

টীকাকারগণ যোগদর্শনে যতমান, ব্যতিরেক, একেন্দ্রিয় ও বশীকার ভেদের দ্বারা বৈরাগ্যের চারপ্রকার সংজ্ঞার কথা বলেছেন, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যাও করেছেন। সেই ব্যাখ্যা সর্বভাবে যুক্তিযুক্ত এবং মান্য। তবুও এখানে সংক্ষেপে নিজ সাধারণ বুদ্ধি অনুসারে বৈরাগ্যের কিছু রূপ বলার চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে সহজভাবে সকলেই এই বিষয় বুঝতে পারেন।

ভয় থেকে হওয়া বৈরাগ্য—সাংসারিক ভোগ করলে পরিণামে নরক প্রাপ্তি হবে। কারণ ভোগে সংগ্রহের প্রয়োজন থাকে, সংগ্রহের জন্য আরম্ভের প্রয়োজন। আরম্ভে পাপ হয়, পাপের ফল হল নরক বা দুঃখ। এইভাবে ভোগ প্রাপ্ত করার উপায়ে পাপ ও পাপের পরিণাম দুঃখ মনে করে তার ভয়ে বিষয় থেকে দূরে থাকাই হল ভয় থেকে উৎপন্ন বৈরাগ্য।

বিবেক-বিচার থেকে উৎপন্ন বৈরাগ্য—যেসব পদার্থকে ভোগ্যবস্তু মনে করে তার সাহচর্যে আনন্দের ভাবনা করা হয়, যার প্রাপ্তিতে সুখ অনুভব হয়, বাস্তবে সেসব ভোগও নয়, সুখের সাধনও নয় এবং তাতে সুখও নেই। দুঃখপূর্ণ পদার্থে—দুঃখেই অবিচারদ্বারা সুখ কল্পনা করা হয়েছে। তাতেই এগুলি সুখরূপে প্রতিভাসিত হয়, বাস্তবে তা দুঃখ বা দুঃখেরই কারণ। ভগবান বলেছেন—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥

(গীতা ৫।২২)

'ভোগ যদিও বিষয়ী পুরুষদের কাছে সুখরূপে প্রতিভাত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা দুঃখেরই হেতু। এর আদি-অন্ত আছে অর্থাৎ এগুলি অনিত্য। সেইজন্য হে অর্জুন ! বুদ্ধিমান, বিবেকবান ব্যক্তি তাতে রত হন না।' অনিত্য মনে না হলেও এগুলি ক্ষণস্থায়ী মনে করে সহ্য করা উচিত। ভগবান বলেছেন—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥

(গীতা ২।১৪)

'হে কুন্তীপুত্র ! শীত-গ্রীষ্ম ও সুখ-দুঃখ প্রদানকারী ইন্দ্রিয় এবং বিষয়াদির সংযোগ তো ক্ষণভঙ্গুর ও অনিত্য ; সুতরাং হে ভারত ! তুমি এসব সহ্য করো।' পরের শ্লোকে এই সহনশীলতার ফলও জানিয়েছেন—

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥

(গীতা ২।১৫)

'কারণ সুখদুঃখ সমভাববিশিষ্ট যে ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের এই সংযোগ বিচলিত করতে পারে না, তিনিই মোক্ষলাভের যোগ্য পুরুষ।' পরে ভগবান একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যেসব পদার্থ অসৎ বলে মনে করা হয়, বাস্তবে তা নেইই। তত্ত্বদর্শীদের এই হল নির্ণীত সিদ্ধান্ত।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

(গীতা ২।১৬)

'হে অর্জুন ! অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নেই এবং সৎ বস্তুর অভাব (অনস্তিত্ব) নেই, এইভাবে উভয় তত্ত্বই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ উপলব্ধ করেছেন।'

এইরূপ বিচার-বিবেচনা দ্বারা উৎপন্ন বৈরাগ্য হল 'বিচারদ্বারা উৎপন্ন বৈরাগ্য'।

সাধনা দ্বারা উপলব্ধ বৈরাগ্য—মানুষ যখন সাধনা করতে করতে প্রেম-ভক্তিতে বিভোর হয়ে ভগবানের তত্ত্ব অনুভব করতে থাকেন, তখন তাঁর মনে ভোগের প্রতি স্বাভাবিকভাবে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। তখন সংসারের সমস্ত ভোগ-পদার্থ তাঁর কাছে অসার দুঃখরূপ বলে মনে হয়। সকল বিষয়ভোগই ভগবদ্প্রাপ্তির বাধাস্বরূপ বলে প্রতীত হয়।

অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে যে স্ত্রী-পুত্রদের রমণীয়, সুখপ্রদ বলে মনে হয়, তখন সেগুলিই তাঁর কাছে ঘৃণিত ও দুঃখপ্রদ বলে মনে হয়[১]। অর্থ-সম্পদ, রূপ-

---

[১]এতে যেন একথা মনে করা না হয় যে স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা উচিত। গৃহস্থ সাধকের সবার সঙ্গে যথাযোগ্য সুন্দর ব্যবহার করে মনে বৈরাগ্য চিন্তা রাখা উচিত।

যৌবন, গাড়ি-বাড়ি, মান-মর্যাদা, বিলাস-ব্যসন সবই তাঁর বিষবৎ বলে মনে হয় এবং এসবের সংস্পর্শ তাঁর কাছে সাক্ষাৎ কারাগারের থেকেও বন্ধনদায়ক, দুঃখপ্রদ ও ঘৃণ্য বলে মনে হতে থাকে। মান-সম্মান, পূজা-প্রতিষ্ঠা, সৎকার-শ্রদ্ধা ইত্যাদিতে তিনি এতো ভীত হন, যেমন সাধারণ ব্যক্তিরা বাঘ-সিংহ বা ভূত-প্রেত বা যম থেকে ভয় পান। যেখানে তাঁর সম্মান-মর্যাদা ইত্যাদি পাবার কোনোরকম সম্ভাবনা থাকে, তিনি সেখানে যেতে ভয় পান। তিনি তাই সেই সব স্থান দূর থেকেই ত্যাগ করেন। যে প্রশংসা-প্রতিষ্ঠা, মান-সম্মান প্রাপ্তিতে সাধারণ মানুষ গর্বিত হয়ে ওঠেন, তাতেই তিনি লজ্জা, সঙ্কোচ ও দুঃখ বোধ করেন, তিনি সেগুলিকে তাঁর অধঃপতন বলে মনে করেন। আমরা যেমন অপবিত্র, ঘৃণিত বস্তু দেখলে আঁৎকে উঠি, তিনি সেইরূপ মান-মর্যাদাতে আঁৎকে ওঠেন। কারোকে প্রসন্ন করার জন্য বা কারও কোনো চাপের কাছে তিনি মাথা নত করেন না। তাঁর কাছে এসবই নরকতুল্য বলে মনে হয়। যাঁরা তাঁকে মান-সম্মান প্রদান করেন, তাঁদের সম্পর্কে তিনি একথাই ভাবেন যে এই আমার অজ্ঞ ভ্রাতাগণ আমার হিতার্থে বিপরীত আচরণ করছে। **'ভোলে সাজন শত্রু বরাবর'** (অজ্ঞ সুহৃদ শত্রুর মতো) এই উক্তি চরিতার্থ করছেন। তাই তিনি তাঁদের ক্ষণিক খুশির জন্য তাঁদের আগ্রহ মেনে নেন না। তিনি জানেন যে এর দ্বারা তাঁদের তো কোনো লাভ হবে না, আমারই অধঃপতন হবে। অপর পক্ষে স্বীকার না করায় দোষও নেই, হিংসাও নেই এবং এই কার্যের জন্য এইসব ব্যক্তির আগ্রহে রাজী হওয়া ধর্মসম্মতও নয়। ধর্ম তাকেই বলা হয় যা ইহলোক ও পরলোকে কল্যাণকারী হয়। যা ইহলোক ও পরলোকে অহিত করে, তা কল্যাণ নয়, অকল্যাণই। পুরস্কার নয়, অভিসম্পাৎ। মাতা-পিতা স্নেহবশতঃ ক্ষণিক সুখের জন্য বালককে কুপথ্য খাওয়ালে পরে বালকের সঙ্গে নিজেরাও দুঃখ পায়। তেমনই এই অজ্ঞ সুহৃদগণ তত্ত্ব না জানায় আমাকে এই পাপ-পথে নিয়ে যেতে চায়। বুদ্ধিমান বালক মাতা-পিতার অজ্ঞতা মেনে না নিলে সে দোষী হয় না। পরিণাম দেখে বা চিন্তা করে মাতা-পিতাও অসন্তুষ্ট হন না। এইভাবে চিন্তা করলে এই সুহৃদগণও অসন্তুষ্ট হবেন না। এরূপ ভেবে তিনি কারও প্রদত্ত

মান-সম্মান স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন এইসব মেনে নিলে আমি অনাথের মতো মারা যাব। আমি এতো ত্যাগী নই যে অন্যের সামান্য খুশির জন্য নিজের সর্বনাশ করব। ত্যাজ্যবুদ্ধি থাকলেও, অন্তর্বিবেক এইপ্রকার ত্যাগকে বিবেকে বুদ্ধিমানী ও ভালো বলা যায় না, যে সরল চিত্ত বন্ধুরা অজ্ঞতাবশতঃ সাধককে এইরূপ মান-সম্মান মেনে নিতে বাধ্য করে তাঁকে মহা অন্ধকার ও দুঃখের গহ্বরে ঠেলে দেয়, পরমাত্মা তাঁদের সৎবুদ্ধি প্রদান করুন। যাতে তাঁরা সাধকদের এইরূপ বিপদের মধ্যে নিয়ে না যান।

সাধনার দ্বারা এইরূপ বিবেকযুক্ত চিন্তার সাহায্যে ভোগের প্রতি যে বৈরাগ্য জন্মায়, তা হল সাধন দ্বারা হওয়া বৈরাগ্য। এইরূপ বৈরাগী ব্যক্তির সংসারে স্ত্রী-পুত্র-মান-মর্যাদা-অর্থ-সম্পদ ইত্যাদি সবই তেমনই অর্থহীন ও নীরস বলে মনে হয়, যেমন আলোকিত সূর্যদেব উদয় হলে চাঁদকে ম্লান মনে হয়।

পরমাত্মতত্ত্বের জ্ঞানদ্বারা হওয়া বৈরাগ্য— সাধকের যখন পরমাত্মতত্ত্ব উপলব্ধি হয় তখন সংসারের সমস্ত পদার্থ তাঁর স্বতঃই রসহীন এবং মায়ামাত্র বলে মনে হয়। তখন ভগবৎতত্ত্ব ব্যতীত তাঁর নিকট অন্য কিছুই সার বলে মনে হয় না। যেমন মৃগতৃষ্ণার জলকে মরীচিকা জেনে গেলে তাকে আর জল মনে হয় না, যেমন ঘুম ভেঙে গিয়ে স্বপ্নকে স্বপ্ন জানলে স্বপ্নের সংসারের কথা চিন্তা করলেও তাতে সত্যতা থাকে না, তেমনই তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির জগতের পদার্থে সার ও অস্তিত্ব প্রতীত হয় না। চতুর বাজীগরের নির্মিত সুন্দর মায়াকাননে অন্য সকলেই মোহিত হয়ে থাকেন, কিন্তু তার মর্মজ্ঞ তত্ত্ব জানা ব্যক্তি যেমন তাকে মায়াবী ও অসার জেনে মোহগ্রস্ত হন না, (যদিও নিজ মায়াপতি মালিকের লীলা দেখে আহ্লাদিত হন), তেমনই এই শ্রেণীর বৈরাগী পুরুষ বিষয়-ভোগে মায়ামুগ্ধ হন না।

এইরূপ বৈরাগী ব্যক্তির সংসারের কোনো ভোগপদার্থে কোনো আস্থা থাকে না। তাহলে তাতে তাঁর রমণীয়তা ও সুখের ভ্রম কীভাবে থাকতে পারে? এরূপ ব্যক্তিই পরমাত্মার পরমপদের অধিকারী হন। একেই বলা হয় পরবৈরাগ্য বা দৃঢ় বৈরাগ্য।

বৈরাগ্য প্রাপ্তির উপায়

উপরোক্ত কথায় চিন্তা-ভাবনা করে সাধকের উচিত যে শুরুতেই সাংসারিক বিষয় পরিণামে ক্ষতিকর মেনে নিয়ে এবং তা দুঃখরূপ জেনে সযত্নে তা ত্যাগ করা। বারংবার বৈরাগ্যের চিন্তা করলে, ত্যাগের মহত্ত্ব মনন করলে, জগতের প্রকৃত অবস্থা ভেবে দেখলে, মৃত ব্যক্তিদের, শূন্য মহল, ভাঙাচোরা অট্টালিকা— সেইসব দেখলে-শুনলে, প্রাচীন রাজাদের অন্তিম জীবন লক্ষ্য করলে এবং অনাসক্ত, চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সঙ্গ করলে, এরূপ চিন্তা স্বতঃই হৃদয়ে জেগে ওঠে এবং বিষয়াদির প্রতি বিরাগ উৎপন্ন হয়। পুত্র-পরিবার, অর্থ-সম্পদ, মান-মর্যাদা, কীর্তি-যশ ইত্যাদি সমস্ত পদার্থে নিরন্তর দুঃখ ও দোষ চিন্তা করে তার থেকে মন সরিয়ে নিতে হয়। ভগবান বলেছেন—

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।

(গীতা ১৩।৮-৯)

ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত ভোগে আসক্তির অভাব এবং অহংকারেরও অভাব আর জন্ম-মৃত্যু-জরা-রোগ ইত্যাদিতে বারংবার দুঃখ-শোকের বিচার করা এবং স্ত্রী-পুত্র, গৃহ-সম্পদে আসক্তি ও মমত্ববোধ দূর করা।

বিচার করলে এমন আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যাবে, যাতে জগতের সমস্ত পদার্থ দুঃখরূপ বলে মনে হবে।

যোগদর্শনের সূত্র হল—

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ।

(সাধনপাদ ১৫)

পরিণামদুঃখ, তাপদুঃখ, সংস্কারদুঃখ এবং দুঃখ মিশ্রিত তথা গুণ-বৃত্তি-বিরোধ হওয়ায় বিবেচক মানুষের দৃষ্টিতে সমস্ত বিষয় সুখ দুঃখেরই রূপ হয়ে থাকে। এবার এখানে এর কিছু ব্যাখ্যা করে বলা হচ্ছে—

পরিণামদুঃখতা— যে সুখ আরম্ভে সুখের বলে মনে হয় তা পরিণামে মহাদুঃখরূপ হয়, সেই সুখকে পরিণামদুঃখ বলা হয়। যেমন আসক্তিবশতঃ রোগীর জিভের স্বাদের জন্য কুপথ্য গ্রহণ। চিকিৎসক নিষেধ করলেও ইন্দ্রিয়াসক্ত রোগী আপাত-সুখকর পদার্থ স্বাদবশতঃ খেয়ে শেষকালে কষ্ট পায়, কাঁদে, চেঁচায় ; তেমনই বিষয়সুখ শুরুতে রমণীয় ও সুখের মনে হলেও পরিণামে মহাদুঃখদায়ক হয়। ভগবান বলেছেন—

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যৎ তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥

(গীতা ১৮।৩৮)

'বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোগে যে সুখ হয়, ভোগের সময় যদিও তা অমৃতের মতো মনে হয়, কিন্তু পরিণামে তা (বল-বীর্য-অর্থ-উৎসাহ ও পরলোকনাশক হওয়ায়) বিষসদৃশ হয়। তাই এই প্রকার সুখকে রাজসিক সুখ বলা হয়।'

দাদের ঘা চুলকালে তা খুবই আরামদায়ক। কিন্তু পরে যখন তাতে জ্বালা ধরে, সেইটাই মহা দুঃখদায়ক হয়ে ওঠে। বিষয়-সুখেরও সেই একই পরিণাম। ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত বিষয়-সুখই পরিণাম দুঃখদায়ক হয়। বহু বহু পুণ্যসঞ্চয় করলে মানুষ স্বর্গলাভ করে কিন্তু '**তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি**।' তাঁর সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করে পুণ্য ক্ষয় হলে পুনরায় ইহলোক প্রাপ্ত হন। তাই গোঁসাই তুলসীদাস মহারাজ শ্রীরামচরিতমানসে বলেছেন—

এহি তন কর ফল বিষয় ন ভাঈ।
স্বর্গউ স্বল্প অন্ত দুখদাঈ॥

তাপদুঃখতা—স্ত্রী-পুত্র-স্বামী-অর্থ-সম্পদ ইত্যাদি সকল পদার্থ সবসময় কষ্ট দেয় জ্বালাতন করে। এমন কোনো বিষয় নেই যাকে চিন্তা করলে কষ্টদায়ক মনে না হয়। এছাড়া মানুষ যখন নিজের থেকে অন্য কাউকে কোনো বিষয়ে সমৃদ্ধশালী দেখে, তখন নিজের অল্প সুখের জন্য তার হৃদয়ে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিষয়-প্রাপ্তি, তার সংরক্ষণ ও নাশ হওয়াতেও সর্বদা ক্ষোভ বজায়

থাকে। বলা হয় যে—

অর্থানামর্জনে দুঃখং তথৈব পরিপালনে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান্ ক্লেশকারিণঃ ॥

অর্থ অর্জন করতে কষ্ট, উপার্জন হলে তার সংরক্ষণে কষ্ট, কোথাও কিছুতে নষ্ট না হয়, তারজন্য সর্বদা চিন্তা, খরচ হলে চিন্তা, তা রেখে মরে যেতেও দুশ্চিন্তা, অর্থাৎ এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল দুশ্চিন্তাই বজায় থাকে। তাই একে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। পুত্র-মান-মর্যাদারও সেই একই ব্যাপার। সমস্ত বিষয়েই প্রাপ্তির ইচ্ছা থেকে বিয়োগ পর্যন্ত সেই একই সন্তাপ বজায় থাকে। এমন কোনো বিষয়সুখ নেই যা সন্তাপ প্রদান করে না।

সংস্কারদুঃখতা—আজ স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-পরিবার, অর্থ-সম্মানের যে বিষয় প্রাপ্ত হয়েছে তার সংস্কার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়েছে, তাই সেগুলি না থাকলে সংস্কারের জন্য সেইসব বস্তুর অভাব মহাদুঃখদায়ক হয়। আমি কেমন ছিলাম, আমার পুত্র কত সুন্দর ও অনুগত ছিল, আমার পত্নী কতো সুশীল ছিল, আমার পিতার কাছে আমি কত সুখী ছিলাম, জগতে আমার কত মান-সম্মান ছিল, আমার কত অর্থসম্পদ ছিল। কিন্তু আজ আমি কী হয়েছি ! আমি সর্বপ্রকারে দীন-হীন হয়ে গেছি। যদিও জগতে তাঁর মতো বহু মানুষ শুরু থেকে এমনই বিষয়রহিত ছিল, কিন্তু তারা এমন দুঃখী নয়। যাঁর বিষয়-ভোগের বাহুল্যতায় সুখের সংস্কার হয়, তাঁরই এমন অভাব প্রতীতি হয়। অভাবের প্রতীতিতে দুঃখ ভরে থাকে। একেই বলে সংস্কারদুঃখতা।

এছাড়া সর্বদা একথাও স্মরণে রাখা উচিত যে জগতের সমস্ত বিষয়-সুখ সর্বাবস্থাতেই দুঃখমিশ্রিত থাকে।

গুণ-বৃত্তির বিরোধজনিত দুঃখ—ধরুন, একজন ব্যক্তির কিছু মিথ্যা কথা বললে বা কপটতা ছলনা, বিশ্বাসঘাতকতা করলে দশ হাজার টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তখন তাকে তার সাত্ত্বিক বৃত্তি বলে 'পাপ করে টাকার দরকার নেই, তার থেকে ভিক্ষা করা বা মরে যাওয়াও ভালো, কিন্তু পাপ করা উচিত নয়।' অন্যদিকে লোভী রাজসিক বৃত্তি বলে 'ক্ষতি কী ? একবার একটু মিথ্যা বলায় আপত্তি কী ? সামান্য ছলনা বা কপট আচরণ ও বিশ্বাসঘাতকতা করলে

কী হবে ? একবার এই কাজ করে দারিদ্রতা মিটিয়ে নিই, ভবিষ্যতে আর একাজ করব না।'

এইভাবে সাত্ত্বিক ও রাজসিক বৃত্তির মধ্যে মহাযুদ্ধ বেধে যায়। এতে চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ওঠে। বিষাদ এবং উদ্বিগ্নতার কোনো সীমা থাকে না।

এইভাবে রাজসিক ও তামসিক বৃত্তিরও মতভেদ হয়। একজন মানুষ তাস বা দাবা খেলতে থাকে। ওদিকে সময়মত না যাওয়ায় গৃহের আবশ্যক কর্ম হয় না। কর্মে প্রবৃত্তকারী রাজসিক বৃত্তি বলে—'ওঠো, চলো, ঘরের কাজ করো, নাহলে ক্ষতি হয়ে যাবে।' অন্যদিকে প্রমাদরূপী তামসিক বৃত্তি তাকে বারংবার খেলাতে আকর্ষণ করতে থাকে, সেই বেচারী এই দ্বিধায় পড়ে নানা অশান্তিতে ভোগে।'

উদাহরণের জন্য দুটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

এইভাবে বিবেচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে জগতে সবই সুখ ও দুঃখের রূপ। সুতরাং এর থেকে মন সরিয়ে নেবার জন্য খুবই চেষ্টা করতে হবে।

উপরোক্ত ভয় ও চিন্তা থেকে হওয়া উভয় প্রকারের বৈরাগ্য লাভ করার এই হল উপায়। এই উপায় পূর্বাপেক্ষা উত্তম-শ্রেণীর বৈরাগ্য-সম্পাদনেও অবশ্যই সহায়ক হয়। কিন্তু পরবর্তী দুটি বৈরাগ্য প্রাপ্তিতে নিম্নলিখিত সাধন বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে।

পরমাত্মার নাম-জপ ও সর্বদা তাঁর স্বরূপ চিন্তা করতে থাকলে হৃদয়ের কলুষ যেমনই দূর হতে থাকবে, তেমনই তাতে উজ্জ্বলতা আসবে। এরূপ উজ্জ্বল ও শুদ্ধ হৃদয়ে বৈরাগ্যের তরঙ্গ ওঠে, যার ফলে বিষয়ানুরাগ স্বতঃই দূর হয়ে যায়। এই অবস্থায় বিশেষ চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন থাকে না। যেমন ধূলি ধূসরিত আয়নাকে কাপড় দিয়ে মুছলে তা যেভাবে পরিষ্কার হয়ে চমকিত হতে থাকে এবং তাতে মুখের ছবি স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, তেমনই পরমাত্মার ভজন-ধ্যানরূপ কাপড়ের মোছাতে অন্তঃকরণরূপ দর্পণের ময়লা দূর হয়ে তা উজ্জ্বল হয় এবং তাতে সুখস্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এরূপ অবস্থায়

যে সামান্য বিষয়-মল থেকে যায়, তা সাধকের মনে শূলের মতো বিঁধতে থাকে। তখন সাধক সেই বিষয়-মলের দাগ দূর করার জন্য ভজন-ধ্যানে মগ্ন হয়ে সেটি দূর করেই ক্ষান্ত হন। ভজন-ধ্যানে যেমন যেমন অন্তরের দর্পণ পরিষ্কার হয়, সাধকের আশা ও উৎসাহ তেমনই বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেসব ব্যক্তি ভজন-ধ্যানরূপ সাধন-তত্ত্ব বোঝেন না তাঁদের কাছে এগুলি ভার বলে প্রতীত হয়। যাঁর এই তত্ত্ব-জ্ঞান হতে থাকে, তিনি উত্তরোত্তর এই আনন্দ উপলব্ধি করে পূর্ণানন্দ লাভের জন্য ভজন-ধ্যানের বৃদ্ধি করতে থাকেন। তাঁর দৃষ্টিতে বিষয়াদিতে প্রতিভাত হওয়া বিষয়-সুখের কোনো অস্তিত্বই থাকে না। ফলে তিনি অত্যন্ত শীঘ্রই দৃঢ় বৈরাগ্য লাভ করেন। ভগবান এই দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের সাহায্যে অহং, মমত্ব ও বাসনারূপ দৃঢ় মূলসম্পন্ন সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে ছেদন করতে বলেছেন।

'অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা।' (গীতা ১৫।৩)

সাংসারিক চিত্র সর্বতোভাবে দূর করাই হল এই অশ্বত্থ-বৃক্ষ ছেদন করা। দৃঢ় বৈরাগ্যের সাহায্যে এ কাজ সহজেই হতে পারে।

ভগবান বলেছেন—

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥

(গীতা ১৫।৪)

এর পরে সেই পরমপদরূপ পরমেশ্বরকে ভালোভাবে অনুসন্ধান করা উচিত (সেই পরমাত্মার বিজ্ঞান আনন্দঘন **'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'**-এর বারংবার চিন্তা করাই হল তাঁর অনুসন্ধান করা) যাতে যাওয়ার পর পুরুষ আর সংসারে পুনরাবর্তন করেন না এবং যে পরমেশ্বর দ্বারা এই পুরাতন সংসার-বৃক্ষের প্রবৃত্তি বিস্তার লাভ করেছে। আমি সেই আদিপুরুষ নারায়ণের শরণাগত (সেই পরমপদের স্বরূপকে চেনা—তাতে স্থিত হয়ে যাওয়াই হল তাঁর শরণগ্রহণ করা) এই প্রকারে শরণ নিলে—

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥

(গীতা ১৫।৫)

'মান এবং মোহ যাঁরা জয় করেছেন, আসক্তি জয় করে যাঁরা পরমাত্মার স্বরূপে নিত্য স্থিতি লাভ করেছেন, যাঁদের কামনা সম্পূর্ণভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে, সেই সব সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্ব বিমুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি এই অবিনাশী পরম পদ প্রাপ্ত হন।'

বৈরাগ্যের ফল

শুধুমাত্র এইরূপ এক অভিন্ন পরমাত্মার জ্ঞান থাকাই হল অটল সমাধি বা জীবন্মুক্ত অবস্থা, এটি তারই লক্ষণ। তারপর এরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষ —ভগবানের ভক্ত জগতে কীভাবে বিচরণ করেন, তাঁর কেমন স্থিতি হয়, তার বিবরণ গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ থেকে ঊনবিংশ শ্লোক পর্যন্ত নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত আছে, ভগবান তার লক্ষণ জানিয়ে বলেছেন—

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণং এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ ১৩ ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৪ ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫ ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৭ ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥ ১৮ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১৯ ॥

'এই শান্তিপ্রাপ্ত পুরুষ যিনি সর্বভূতে দ্বেষভাব রহিত, স্বার্থপরতা বর্জিত, সর্বভূতে প্রেমভাবাপন্ন, হেতু ব্যতীতই দয়ালু, মমত্বরহিত, নিরহঙ্কার, সুখে-দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল অর্থাৎ অপরাধীকেও যিনি অভয় প্রদান করেন।

যিনি ধ্যানযোগে সমাহিত চিত্ত, লাভ-ক্ষতিতে সন্তুষ্ট , মন-ইন্দ্রিয়াদি সহ সংযত স্বভাব, দৃঢ় নিশ্চয়যুক্ত, যাঁর মন-বুদ্ধি আমাতে সমর্পিত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত। যিনি কোনো জীবকে উদ্বিগ্ন করেন না, যিনি স্বয়ং কারো দ্বারা উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, যিনি হর্ষ-অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ রহিত, তিনিই আমার প্রিয় ভক্ত। যিনি আকাঙ্ক্ষা রহিত, বাহ্যাভ্যন্তরে শুচি, দক্ষ অর্থাৎ যে কাজ করেন তা পরিপাটিভাবে সম্পন্ন করেন, পক্ষপাত শূন্য, দুঃখ-ভয় মুক্ত এবং সর্ব কর্মারম্ভ ত্যাগী অর্থাৎ কায়-মনো-বাক্যে প্রারব্ধের দ্বারা হওয়া সমস্ত স্বাভাবিক কর্মের কর্তৃত্বের অহঙ্কার ত্যাগ করা ব্যক্তি আমার প্রিয়। যিনি কখনও হৃষ্ট হন না, দ্বেষ করেন না, শোক করেন না, কামনা করেন না এবং শুভাশুভ সমস্ত কর্মের ফলত্যাগী, সেই ভক্তিমান পুরুষ আমার প্রিয়। যিনি শত্রু-মিত্রে, মান-অপমানে, শীত ও গ্রীষ্মে এবং সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্বে নির্বিকার এবং সংসারে আসক্তি বর্জিত, যিনি নিন্দা ও স্তুতিতে সমবুদ্ধি বিশিষ্ট, মননশীল অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ সর্বদা মননকারী এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য যা পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট ও গৃহাদিতে মমতাশূন্য—এইরূপ স্থির ভক্তিমান পুরুষ আমার প্রিয়।'

সুতরাং এই অসার জগৎ-সংসার থেকে মন সরিয়ে ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত ভোগে বৈরাগ্যবান হয়ে সকলকেই পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত।

~~o~~

(১৪) জ্ঞানীর অনির্বচনীয় স্থিতি (অবস্থান)

অসত্য, হিংসা ও মৈথুন ইত্যাদি কর্ম বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চিতভাবে খারাপ জেনেও মন তাকে ত্যাগ করে না, সেইভাবেই বুদ্ধি ও বিচারের সাহায্যে সংসারকে কল্পিত বলে জানলেও মন একথা মেনে নেয় না। সাধকের এমন এক অবস্থা হয় এবং সেই অবস্থাকে এইভাবে বর্ণনা করা হয় যে 'আমার

বুদ্ধির বিচারে জগৎ-সংসার কল্পিত' তার পরে মন যখন এই কথা মেনে নেয় তখন সংসার যে কল্পনা সেইভাব দৃঢ় হয়। কিন্তু এও শুধুই কল্পনা। এরপরে অভ্যাস করতে করতে যখন এই স্থিতি প্রত্যক্ষবৎ হয়ে ওঠে, তখন সাধকের কোনো কোনো সময় জগৎ-সংসারের ছবি 'আকাশে স্ফুলিঙ্গের মতো' ভেসে ওঠে, কোনো সময় তা-ও হয় না। আকাশে স্ফুলিঙ্গ দর্শনকারীদের যেমন এই জ্ঞান থাকে যে 'আকাশে প্রকৃতপক্ষে কোনো বিকার নেই ; কোনো কিছু ছাড়াই এটি এমন ভাসিত দেখায়' তেমনই সাধকেরও কোনো কিছু ভাসিত হওয়া বা না হওয়ায় একই ভাব থাকে, তাঁর নিকট জগতের অস্তিত্ব কোনো কালে এবং কোনো প্রকারেই সত্য বলে উদ্ভাসিত হয় না। এই অবস্থাকে 'অকল্পিত স্থিতি' বলা হয়। সাধকের এই অবস্থা জ্ঞানের তৃতীয় ভূমিকাতে হয়, কিন্তু এই অবস্থাতেও এই স্থিতির জ্ঞাতা এক ধর্মী থেকে যান। এই তৃতীয় ভূমিকাতে সাধনে প্রগাঢ়তার কারণে সাধকের ব্যবহারিক কার্যে ভুল হওয়া সম্ভব। কিন্তু ভগবদ্প্রাপ্তিরূপ চতুর্থ ভূমিকাতে সাধকের প্রায়শঃ ভুল হয় না, সেই অবস্থায় তাঁর দ্বারা সমস্ত কর্ম ন্যায়যুক্তভাবে সুচারুরূপে বিনা সঙ্কল্পে স্বাভাবিকভাবে হয়ে যায়। শ্রীভগবান গীতায় যেমন বলেছেন—

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥

(গীতা ৪।১৯)

'যার সমস্ত কর্ম কামনা ও সঙ্কল্পবর্জিত, এরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা ভস্মিভূত ব্যক্তিকে, জ্ঞানী ব্যক্তিরাও পণ্ডিত বলেন।' পঞ্চম ভূমিকায় ব্যবহারিক কর্মে ভুল হতে পারে, কিন্তু তৃতীয় ভূমিকার অবস্থা হল সাধনরূপা এবং পঞ্চম ভূমিকা প্রাপ্ত তাঁর স্থিতি হল স্বাভাবিক। তৃতীয় ভূমিকার পরে 'সাক্ষাৎকার' হয়, তাকে বলা হয় মুক্তি। কিন্তু জৈন ইত্যাদি মতাবলম্বীগণ মৃত্যুর পরে মুক্তি হয় বলে মনে করেন, কিন্তু আমাদের বেদান্তের সিদ্ধান্তে জীবন্মুক্তিও মানা হয়েছে, মৃত্যুর পূর্বেও জ্ঞান হওয়া সম্ভব। এই অবস্থায় তাঁর শরীর এবং শারীরিক কাজকর্ম শুধুমাত্র লোকেদের দৃষ্টিতে কার্যকর মনে হয় বাস্তবে তাতে কোনো 'ধর্মী' থাকে না। যদি কেউ বলেন যে তাতে যদি চেতনই

না থাকে, তবে কর্ম কীকরে হয় ? তার উত্তরে বলা যায় যে, সমষ্টি-চেতন তো নষ্ট হয় না, ব্যষ্টি ভাব থেকে সরে গিয়ে তার স্থিতি শুদ্ধ চেতনে থেকে যায়। সমষ্টি-চেতনের অস্তিত্ব-স্ফূর্তিতে ক্রিয়া হয়ে থাকে, তাতে কোনো বাধা আসে না। তাতে যদি কেউ বলেন যে চেতন তো জড় পদার্থ এবং তা মৃতদেহেও থাকে, তাহলে তাতে কেন কোনো ক্রিয়া হয় না ? তার উত্তর হল যে সেটিতে ক্রিয়া না হবার কারণ হল তাতে অন্তঃকরণের অভাব। যদি যোগীব্যক্তি এক চিত্তের একাধিক কল্পনা করে মৃতদেহে বা জড়পদার্থে চিত্তকে প্রবেশ করিয়ে দেন, তাহলে তাতেও ক্রিয়াদি হওয়া সম্ভব।

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন জ্ঞানী কে ? তার উত্তরে কিছুই বলা সম্ভব নয়। শরীরকে যদি জ্ঞানী বলা হয়, তাহলে জড় শরীরের জ্ঞানী হওয়া সম্ভব নয়, যদি জীবকে জ্ঞানী বলা হয়, তাহলে জ্ঞানোত্তরকালে সেই চেতনের 'জীব' সংজ্ঞা থাকে না আর যদি শুদ্ধ চেতনকে জ্ঞানী বলা হয়, তবে শুদ্ধ চেতন তো কখনও অজ্ঞানী হয়ইনি। তাই এটি কখনও বলা সম্ভব নয় যে জ্ঞানী কে ?

জ্ঞানীর কল্পনা অজ্ঞানীর অন্তঃকরণে থাকে, শুদ্ধ চেতনের দৃষ্টিতে তো অন্য কোনো পদার্থই থাকে না। জ্ঞানীর যখন কোনো দৃষ্টিই না থাকে, তাহলে সৃষ্টি কোথায় থাকে ? অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ এইভাবে কল্পনা করেন যে, এই শরীরে যে জীব ছিল, সে সমষ্টি-চেতনে মিশে গেছে, সমষ্টি-চেতনের যে অংশে অন্তঃকরণের অধ্যারোপ থাকে, সেই অন্তঃকরণসহ ঐ চেতন অংশের নাম জ্ঞানী। বাস্তবিকভাবে জ্ঞানী কার সংজ্ঞা, কেউই তা বাক্যের সাহায্যে বলতে পারেন না ; কারণ জ্ঞানীর দৃষ্টিতে জ্ঞানীভাব নেই। জ্ঞানী এবং অজ্ঞানীর সংজ্ঞা শুধুমাত্র লোকশিক্ষার জন্য এবং অজ্ঞানীদের মধ্যেই তার কল্পনা থাকে। যেমন, গুণাতীতের 'লক্ষণ' বলা হয় কিন্তু যিনি ত্রিগুণাতীত তাঁর আবার 'লক্ষণ' কীসের ? লক্ষণ তো অন্তঃকরণে হয়ে থাকে আর অন্তঃকরণের হওয়া ক্রিয়া হল ত্রিগুণাত্মিকা। ব্যাপার হল যে গুণাতীতকে বোঝার জন্য অন্তঃকরণের ক্রিয়াসমূহের লক্ষণগুলি বর্ণনা করা হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যেমন বলা হয়েছে—

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥
(১৪।২২)

এর আগে ২৩, ২৪ এবং ২৫ তম শ্লোকসমূহেও গুণাতীতের লক্ষণ বলা হয়েছে। উপরোক্ত ২২তম শ্লোকে 'প্রকাশ' শব্দ দ্বারা অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়াদিতে চেতনা, প্রবৃত্তির দ্বারা চেষ্টা, মোহ দ্বারা নিদ্রা অথবা সাংসারিক জ্ঞানে সুষুপ্তিবৎ অবস্থা বোঝা উচিত। চিত্তে কোনো 'ধর্মী' না থাকায় 'দ্বেষ' ও 'আকাঙ্ক্ষা' কার হবে ? রাগ-দ্বেষ ও হর্ষ-শোক না হওয়ায় প্রমাণিত হয় যে তাতে কোনো 'ধর্মী' নেই। জড় অন্তঃকরণের সঙ্গে যদি সমষ্টি-চেতনের লিপ্তভাব হত তাহলে জড়-অন্তঃকরণে রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ ইত্যাদি বিকার হওয়া সম্ভব হত। কিন্তু সমষ্টি-চেতনের অন্তঃকরণের সম্বন্ধ হয় না, শুধু তার অস্তিত্ব-স্ফূর্তি দ্বারা চেষ্টা হয়ে থাকে। সেইসব লক্ষণও সেই পর্যন্ত থাকে, যে পর্যন্ত সংসারের চিত্র থাকে এবং তা হল সাধকের পক্ষে আদর্শ উপায় স্বরূপ, তাই শাস্ত্রে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

গুণাতীতের বাস্তবিক অবস্থা অন্য কেউ জানতেও পারেন না এবং তিনি জানাতেও পারেন না, এটি হল স্বসংবেদ্য স্থিতি। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি পরীক্ষা করতে চান যে আমার মধ্যে জ্ঞানীর কোনো লক্ষণ কি আছে ? তাহলে জানতে হবে যে তাঁর জ্ঞান হয়নি ; লক্ষণের অনুসন্ধানের দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় যে তাঁর স্থিতি শরীরে রয়েছে এবং তার সত্তা (অস্তিত্ব) ব্রহ্ম থেকে পৃথক, নাহলে অনুসন্ধানকারী কে এবং স্থিতি কার ? যদি অনুসন্ধান করতেই হয় তাহলে শরীরেই কেন, পাষাণ বা বৃক্ষাদিতে কেন খোঁজা নয় ? শুধুমাত্র শরীরে খুঁজলে তো তার শরীরে অহংভাব আছে—এটিই প্রমাণিত হয়। তাতে সে তো নিজেই ক্ষুদ্র হয়ে রয়েছে। কিন্তু সাধক যদি নিজ শরীর থেকে পৃথক হয়ে (দ্রষ্টার মতো হয়ে) পাথর ও বৃক্ষের সঙ্গে নিজ শরীরের সাদৃশ্য করে বিচার করেন তাহলে তাঁর লাভ হতে পারে। শ্রীগীতায় যেমন বলা হয়েছে—

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥ (১৪।১৯)

'দ্রষ্টা যখন তিনগুণ ব্যতীত অন্য কাউকে কর্তারূপে দেখেন না অর্থাৎ গুণই গুণাদিতে প্রবৃত্ত হয় বলে মনে করেন এবং ত্রিগুণের অতীত সচ্চিদানন্দঘন স্বরূপ আমাকে পরমাত্মারূপে তত্ত্বতঃ জানতে পারেন, তখন সেই ব্যক্তি আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন।'

কিন্তু যিনি বলেন 'আমার জ্ঞান হয়নি' তিনি জ্ঞানী নন ; কারণ তিনি তো স্পষ্টভাবে জানাচ্ছেন। যিনি বলেন যে 'আমার জ্ঞান হয়েছে, তাঁকেও জ্ঞানী বলে মানা উচিত নয় ; কারণ একথা বলায় জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় তিনটি ভিন্ন প্রমাণিত হয় এবং যিনি বলেন যে 'জ্ঞান হয়েছে কি না, আমি জানি না' তিনিও জ্ঞানী নন, কারণ জ্ঞানোত্তর কালে এইরূপ সন্দেহ থাকতে পারে না। তাহলে জ্ঞানী কে ? তার উত্তর পাওয়া যায় না। সেইজন্যই এই স্থিতি বা অবস্থাকে '**অনির্বচনীয়**' বলা হয়েছে।

~~○~~

(১৫) জ্ঞানের দুর্লভতা

কোনো শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তির সামনে প্রকৃতভাবে মহাপুরুষের এ কথা বলা যায় না যে 'আমি জ্ঞানলাভ করেছি' ; কারণ এই কথায় জ্ঞানে দোষ হয়। পূর্ণ শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রকৃতপক্ষে এই কথা বলা সাজে না যে 'আপনি কি জ্ঞানী ?' যেখানে এরূপ প্রশ্ন করা হয় সেখানে শ্রদ্ধায় ত্রুটি আছে বলে বুঝতে হবে এবং মহাপুরুষকে এরূপ প্রশ্ন করলে প্রশ্নকর্তার কিছু ক্ষতিও হয়ে থাকে। মহাপুরুষ যদি বলেন যে 'আমি জ্ঞানী নই' তাহলে তাঁর প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা কমে যায় আর তিনি যদি বলেন যে 'আমি জ্ঞানী' তবে তাঁর মুখে এই কথা শুনেও শ্রদ্ধা কম হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে আমি অজ্ঞানী না জ্ঞানী—এই দুটির কোনো কথাই মহাপুরুষের পক্ষে ব্যক্ত করা উপযুক্ত হয় না, তিনি যদি নিজেকে অজ্ঞানী বলেন তবে মিথ্যাচারের দোষ হয় এবং যদি জ্ঞানী বলেন তো নানাত্বের। তাই তিনি এমন কথাও বলেন না যে আমি ব্রহ্মকে জানি এবং

একথাও বলেন না যে আমি ব্রহ্ম জানি না। তিনি যে ব্রহ্মকে জানেন একথাও বাক্যে প্রকাশ হয় না। কিন্তু তিনি যে জানেন না তা-ও নয়।

শ্রুতিতে বলা হয়েছে—

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥
যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥

(কেনোপনিষদ্ ২।২-৩)

তাই একে বলা হয় অনির্বচনীয় স্থিতি ; তাই বেদে দুই প্রকারের কথা দেখা যায় এবং সেজন্যই মহাপুরুষ বলেন না যে আমার প্রাপ্তি লাভ হয়েছে। এই সম্বন্ধে তিনি নিজের সম্পর্কে কিছু না বলে বেদ-শাস্ত্রাদির দিকে সঙ্কেত করিয়ে দেন। আর একথাও বলেন না যে আমার প্রাপ্তি হয়নি। উত্তম আচরণকারী আচার্য বা শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির এরূপ বলাও ঠিক নয় ; কারণ তাতে তাঁদের অনুগামীদের ব্রহ্ম-প্রাপ্তি অত্যন্ত কঠিন মনে করে নিরাশ হয়ে যাওয়া সম্ভব হতে পারে। যেমন এখন যদি কোনো পরম সম্মানীয় কোনো মহাপুরুষ বলেন যে 'আমার প্রাপ্তি হয়নি, আমি প্রাপ্তি লাভের জন্য স্বয়ং উৎসুক হয়ে আছি' তাহলে তাঁর অনুগামী ভক্তগণ ভেবে বসেন যে ইনিই যখন প্রাপ্তি লাভ করেননি তাহলে আমাদের কীকরে প্রাপ্তি হবে অথবা তাঁরা মনে করবেন যে সম্মানীয় ব্যক্তির বাক্যের এই অংশটুকু যথার্থ নয় কিংবা প্রকৃত অবস্থা না জানাবার জন্য এইকথা বলছেন, এইরূপ কথায় অনুগামী ভক্তদের শ্রদ্ধা স্বাভাবিকভাবেই কম হয়ে যেতে পারে। সুতরাং এই বিষয়ে মৌন থাকাই উত্তম। এইসব বিষয় বিচার করলে প্রমাণিত হয় যে মহাপুরুষের পক্ষে জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কোনো কথাই তাঁর মুখে শোভা পায় না। তা সত্ত্বেও মহাপুরুষ যদি অজ্ঞ সাধককে বোঝাবার জন্য তাঁকে জ্ঞানের উপদেশ দেবার সময় তাঁর ভাবনার অনুসারে নিজেকে জ্ঞানী কল্পনা করে জ্ঞানী শব্দ দিয়ে সম্বোধন করেন তাহলে কোনো ক্ষতি নেই, কারণ প্রকৃতপক্ষে তাঁর এভাবে বলা ঐ সাধকের কাছেই সম্ভব হয়, যিনি পূর্ণ শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং পরম বিশ্বাসী, যিনি মহাপুরুষের কথা

শুনে সেইরকম হতে থাকেন এবং যে স্থিতির বর্ণনা মহাপুরুষ করেন এবং সেই স্থিতিতেই স্বয়ং স্থিত হয়ে যান। এতে বলা যেতে পারে যে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস পূর্ণভাবে থাকলেও এমন স্থিতি হয় না, তাহলে সেই বেচারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন সাধক কী করবেন ? এ কথা ঠিক হলেও সাধকের জন্য অত্যন্ত জরুরী বিষয় হল যে, তিনি শ্রবণ অনুযায়ী অন্ততপক্ষে ব্রহ্মে বিশ্বাসযুক্ত হয়ে তাঁকে প্রাপ্তি করার জন্য সম্পূর্ণভাবে যেন তৎপর হয়ে ওঠেন, যতক্ষণ প্রাপ্তি লাভ না হয়, ততক্ষণ তিনি তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকবেন। যেমন কোনো ব্যক্তি এক ব্যক্তির দ্বারা তাঁর গৃহে ধন প্রোথিত আছে জেনে তা খুঁড়ে বার করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, যদি সেই সময় তাঁর কাছে কোনো বাইরের লোক থাকেন তখন তিনি মনে মনে চাইবেন যে সেই ব্যক্তি কখন চলে যাবেন এবং তিনি একাই সেই প্রোথিত ধন উদ্ধার করে হস্তগত করবেন। তেমনই সাধক এই কথা ভাবেন যে আমার সাধনায় বাধাপ্রদানকারী আসক্তি ও অজ্ঞতা দোষ কবে দূর হবে এবং আমি আমার পরমধন পরমাত্মাকে কবে প্রাপ্ত করব ! যত দেরী হয় ততই তাঁর ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি সেই বিলম্ব যেন আর সহ্য করতে পারেন না। এইরূপ সাধকের কাছে মহাপুরুষ যদি স্পষ্ট ভাষায় নিজেকে জ্ঞানী বলে স্বীকার করেন, তাতে কোনো ক্ষতি হয় না, কিন্তু তার থেকে নিম্নশ্রেণীর সাধক বা অপূর্ণ প্রেমিক ভক্তদের কাছে এই কথা বললে মহাপুরুষের তো কোনো ক্ষতি হয় না কিন্তু অনধিকারী হওয়ায় সেই শ্রবণকারীদের পারমার্থিক বিষয়ে ক্ষতি হতে পারে। যদি এই বিষয় স্পষ্ট ভাবে সকলকে বলার হত, তাহলে শাস্ত্রে একে পরম গোপনীয় বলা হত না এবং শুধুমাত্র অধিকারী ব্যক্তির নিকটই বলা উচিত—এরূপ বিধানও করা হত না।

কেউ কেউ বলেন যে মহাপুরুষের পরীক্ষা কী করে নেওয়া যায় আর যদি বিনা পরীক্ষাতে কোনো অযোগ্য ব্যক্তিকে গুরু বা উপদেষ্টা মেনে নেওয়া হয়, তাহলে শাস্ত্রে বলা আছে যে তাতে উল্টে ক্ষতিই হয়। এর উত্তরে বলা যায় যে, এই প্রশ্ন এবং শাস্ত্রের বচন তো ঠিকই কিন্তু যাঁর সংস্পর্শে থাকলে পরমাত্মাতে, ঐ মহাপুরুষে এবং শাস্ত্রাদিতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তাঁকে গুরু বা উপদেষ্টা মানাতে কোনো ক্ষতি নেই। যদি কেউ পূর্ণ নাও হন তাহলেও তাঁর যতদূর গতি, ততদূর তো তিনি পৌঁছে দেবেন, (এই দৃষ্টিতে মহাপুরুষের

সংস্পর্শে থাকা সাধকদের সঙ্গও উত্তম এবং লাভপ্রদ হয়)। পরে স্বয়ং পরমাত্মা তাঁর ব্যবস্থা করে থাকেন। সাধকের প্রয়োজন হল পরমাত্মা পরায়ণ হওয়া। শ্রীপরমাত্মার শরণ গ্রহণ করলেই সব কিছু হওয়া সম্ভব। ভগবান গীতায় বলেছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

(গীতা ৯।২২)

অর্থাৎ যে ভক্তগণ সর্বদা অনন্যভাবে নিষ্কামভাবে আমার ভজনা করেন, সেই নিত্য একভাবে আমাতে সমাহিত ভক্তদের যোগক্ষেম আমি বহন করি। জগৎ-সংসারেও এটিই দেখা যায় যে, যদি কেউ কারও পরায়ণ (মুখাপেক্ষী) হয়, তাহলে তিনিই তার সমস্ত কিছু সামলে রাখেন। যেমন শিশু যতক্ষণ তার মায়ের মুখাপেক্ষী থাকে, ততক্ষণ মা তার রক্ষার এবং সবকিছু সামলানোর ভার নিজে নিয়ে থাকেন। যতক্ষণ যে বড় হয়ে স্বাধীন না হয়, যতদিন সে মাতা-পিতার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে এবং যতদিন সে স্বাবলম্বী না হয় ততদিন মাতা-পিতার ওপর তার সমস্ত ভার থাকে। তেমনই শুধুমাত্র পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করলেই সমস্ত কাজ সিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু সাধকের কাজ হল শরণ গ্রহণ করা। শরণাগত হলে প্রভু স্বয়ং তাঁর সমস্ত ভার নিজে বহন করেন। সুতরাং কল্যাণকামী প্রত্যেক সাধকের পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করা উচিত।

~~O~~

(১৬) ভ্রম অনাদি এবং সান্ত

আত্মা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় জ্ঞান প্রাপ্তি করতে হয় না এবং তার প্রাপ্তি র জন্য কোনো পরিশ্রম অথবা যত্নেরও প্রয়োজন হয় না। কোনো অপ্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্ত করার জন্য পরিশ্রম ও চেষ্টা করতে হয়, কিন্তু এই স্থানে শুধু নিত্য প্রাপ্ত ব্রহ্মে অপ্রাপ্তির যে ভ্রম হয়, সেই ভ্রম দূর করাই হল আসল কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে এই ভ্রম ব্রহ্মের নয়। সেই ভ্রম তাঁরই, যিনি এই জগৎ-সংসারের

বিকারকে নিত্য বলে মেনে থাকেন। বাস্তবে ব্রহ্মে ভুল না হওয়ায় তা দূর করার জন্য পরিশ্রম করাও একপ্রকার ভ্রম, কিন্তু যতক্ষণ ভুল থাকে ততক্ষণ তা দূর করার জন্য সাধনা করা উচিত। অবশ্যই সেই সব ব্যক্তিরা সাধনা করবেন, যাঁরা ভুল করেন। যাঁরা একে ভুল বলে মানেন তাঁদের কাছে তো এটি অনাদিকাল থেকে চলছে। এরূপ বলা হয় যে, অনাদিকাল থেকে হয়ে যাওয়া বস্তুর অন্ত হয় না। কিন্তু তা ঠিক নয় ; কারণ ভুল হয় মিটিয়ে ফেলার জন্যই। ভুল যদি হয় তাহলে তার অন্তও প্রয়োজন। যদি মেনে নেওয়া যায় যে এটি সান্ত নয় তাহলে কারোরই এটি 'প্রাপ্তি' করা সম্ভব হয় না। সুতরাং এটি অবশ্যই অনাদি ও সান্ত। যদি মনে করা হয় যে এই ভুল অনাদিকাল থেকে নেই, পরে হয়েছে, তাহলে এতে তিনটি দোষ আসে—প্রথমে 'প্রাপ্ত' পুরুষের পুনর্বার ভুলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে, দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের ওপর দোষ বর্তায়, তৃতীয়তঃ নতুন জীব হওয়া সম্ভব হয়। এই হেতুতেই এটি অনাদি ও সান্ত প্রমাণিত হয়। প্রকৃতপক্ষে কালের কল্পনাও মায়াতেই হয় ; কারণ ব্রহ্ম হলেন শুদ্ধ এবং কালাতীত।

বেদ, শাস্ত্র ও তত্ত্ববিদ মহাপুরুষদের বক্তব্য এটিই যে, এক শুদ্ধবোধ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা ব্রহ্মের অতিরিক্ত আর কিছুই নেই, কিন্তু যে কোনো ব্যক্তির দ্বারা 'সংসার অসৎ' এরূপ বলা ঠিক নয়, কারণ বাস্তবে তার এই কথা বলা সাজে না। সংসারকে অসৎ মনে করলে জগতের রচয়িতা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, বিধি-নিষেধ সংবলিত শাস্ত্র, লোক-পরলোক ও পাপ-পুণ্য ইত্যাদি সবই ব্যর্থ বলে প্রতিভাত হয় এবং এসবকে ব্যর্থ বলা বা মনে করা অনধিকার চর্চা। বাস্তবিক পক্ষে যেখানে শুদ্ধ ব্রহ্মের অতিরিক্ত অন্যের আত্যন্তিক অভাব থাকে, সেক্ষেত্রে কিছু বলা যায় না। সেখানেই বলা যায় যেখানেই অজ্ঞতা থাকে, আর যেখানে বলা যায় সেখানে সৃষ্টির রচয়িতা, সংসার, শাস্ত্র ইত্যাদি সব সত্য এবং এই সবকে সত্য মেনেই শাস্ত্রানুকূল আচরণ করা উচিত। সাত্ত্বিক আচরণ ও ভগবানের বিশুদ্ধ ভক্তির সাহায্যে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে যখন ভ্রম দূর হয়, সাধক তখন কৃতকৃত্য হয়ে ওঠেন। এই হল পরমাত্মপ্রাপ্তি।

~~○~~

(১৭) নিরাকার-সাকার-তত্ত্ব

শুদ্ধ ব্রহ্মের অতিরিক্ত যা কিছু ভাসিত হয়, বাস্তবে তা নেই, সেসব শুধু স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয়। বেদ, বেদান্ত এবং উপনিষদের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তই হল তাই। স্বামী শ্রীশঙ্করাচার্যেরও এই অভিমত এবং এটিই হল বাস্তবে ন্যায়সিদ্ধ সিদ্ধান্ত, কিন্তু এই বিষয় এতো উচ্চপর্যায়ের এবং গোপনীয় যে এটি অতি সহজে, হঠাৎ করে প্রকাশ করা উচিত নয়। এই সিদ্ধান্তের বক্তা এবং শ্রোতা সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প হন। এটি বলার একমাত্র তিনিই অধিকারী যিনি এই স্থিতিতে স্থিত হন। যাঁরা এই প্রকারের নন, তাঁদের বলার বা শোনার অধিকার থাকে না। যাঁর রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ আছে, যিনি সাংসারিক লাভ-ক্ষতিতে আনন্দিত ও দুঃখিত হন, যিনি দুঃখ-সুখ বিভিন্ন রূপে অনুভব করেন এবং যিনি বিষয়াসক্ত ও ইন্দ্রিয়সুখে আগ্রহী, এইসব ব্যক্তির এই সিদ্ধান্তের উপদেশে ক্ষতি হতে পারে। তাঁরা মনে করতে পারেন যে, এই জগৎ-সংসার যখন স্বপ্নবৎ, তাহলে অসত্য, ব্যভিচার, হিংসা ও ছল-কপটের মতো পাপও স্বপ্নবৎ। তাই যা কিছুই করো, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। সেই কথা মনে করে তাঁরা পরিশ্রমসাধ্য সৎকর্ম পরিত্যাগ করে বিভিন্নভাবে পাপকর্ম করতে থাকেন। তাই শাস্ত্র-নির্দেশ হল অনধিকারীদের এই সিদ্ধান্তের উপদেশ না দেওয়া। কারণ অনধিকারী ব্যক্তিগণ এই সিদ্ধান্তের প্রকৃতরূপ না বুঝে সৎকর্ম ত্যাগ করেন, তাই জ্ঞানপ্রাপ্তি না করে তাঁরা উভয়ভ্রষ্ট হয়ে যান। এই দোহা তাই প্রসিদ্ধ—

ব্রহ্মজ্ঞান উপজ্যো নহীঁ, কর্ম দিয়ে ছিটকায়।
'তুলসী' ঐসী আত্মা, সহজ নরকমেঁ জায়॥

তাই শ্রীভগবান গীতাতেও বলেছেন—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

(৩।২৬)

'জ্ঞানী মহাপুরুষগণের উচিত কর্মে আসক্তিসম্পন্ন অজ্ঞানী ব্যক্তিদের

বুদ্ধিভেদ অর্থাৎ কর্মে অশ্রদ্ধা উৎপন্ন না করা। কিন্তু তিনি নিজে পরমাত্মার স্বরূপে স্থিত হয়ে শাস্ত্রবিহিত সর্ব কর্ম সুচারুভাবে সম্পন্ন করবেন এবং তাদের দ্বারাও সেইভাবে করাবেন।'

জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী ব্যক্তিদের কর্মে এই পার্থক্য থাকে যে জ্ঞানীর কর্ম অনাসক্তভাবে করা হয়ে থাকে আর অজ্ঞানীর কর্ম আসক্তিসহ হয়ে থাকে। গীতায় বলা হয়েছে—

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥

(গীতা ৩।২৫)

'হে ভারত ! কর্মে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেমনভাবে কর্ম করেন, অনাসক্ত জ্ঞানী ব্যক্তিগণও লোকশিক্ষার্থে সেইভাবে কর্ম করবেন।'

একথা বলার তাৎপর্য হল যে শুধুমাত্র অধিকারীগণের মধ্যেই ব্রহ্মের চর্চা হওয়া উচিত।

লোকে একথা বলতে পারেন যে যখন একমাত্র শুদ্ধ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নেই, তাহলে এর দ্বারা সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরেরও না থাকাই সিদ্ধ হয় আর যদি তাই হয় তবে এইসব প্রতিপাদনকারী প্রমাণ সাপেক্ষ শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষরূপে প্রতিভাত সৃষ্টির কী অবস্থা হবে ? তার উত্তর হল, আকাশ যেমন নিরাকার, আকাশের কোনো আকার নেই, কিন্তু কখনও কখনও সেখানে মেঘ দেখা যায়, যেগুলি আকাশেই ঘনীভূত হয়, সেখানেই দেখা যায়, শেষে সেখানেই মিলিয়ে যায়। আকাশের প্রকৃত অবস্থানের কোনো পার্থক্য হয় না, কিন্তু আকাশের যতটুকু স্থান মেঘে ঢাকা পড়ে, সেই অংশ এক বিশেষ রূপ ধারণ করে এবং তাতে বৃষ্টি ইত্যাদির ক্রিয়াও হয়ে থাকে।

এইরূপ একই অনন্ত শুদ্ধ ব্রহ্মে যে অংশ মায়াদ্বারা আচ্ছাদিত বলে প্রতিভাত হয়, সেই অংশ হল সগুণ ঈশ্বর। প্রকৃতপক্ষে এই সগুণ ঈশ্বর শুদ্ধ ব্রহ্ম থেকে কখনও কোনো দ্বিতীয় বস্তু নয়, কিন্তু মায়াবশতঃ ভিন্ন বলে প্রতিভাত হওয়ায় লোকে সগুণ ঈশ্বরকে ভিন্ন বলে মনে করেন। এইরূপই ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান সগুণ চৈতন্য, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর ; এঁকেই আদিপুরুষ, পুরুষোত্তম ও

মায়াবিশিষ্ট ঈশ্বর বলা হয়। আকাশের একাংশে মেঘের ন্যায় এই সগুণ চৈতন্যে যে এই সৃষ্টি দৃষ্টিগোচর হয়, তা মায়ারই কাজ। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের এই শক্তির নাম মায়া। যেমন অগ্নি এবং তাঁর দাহিকা শক্তি থাকে, সেইরূপ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর আর তাঁর এই শক্তি হল মায়া। একেই প্রকৃতি বলা হয় এবং এরই নাম অজ্ঞান।

মায়া কী এবং কীভাবে তা উৎপন্ন হয় ? এ এক ভিন্ন বিষয়, তাই এই বিষয়ে এখানে কিছু না বলে মূল বিষয়েই আলোকপাত করা হচ্ছে। এই বর্ণনা দ্বারা এই কথাই বুঝতে হবে যে নিরাকার আকাশের ন্যায় এই সর্বব্যাপী অনন্ত চেতনের নাম শুদ্ধ ব্রহ্ম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আকাশের দৃষ্টান্তও একপেশে ; কারণ আকাশের সীমা আছে এবং এর কোনো আকার না থাকলেও এতে শব্দরূপ এক গুণও আছে, কিন্তু শুদ্ধ ব্রহ্ম অসীম, অনন্ত, নির্গুণ এবং শুধুমাত্র একই, তাই তা হল অনির্বচনীয় এবং সেজন্যই তার উপদেশ শুধু সেই অধিকারীকেই দেওয়া যায়, যাঁরা তা ধারণ করতে সক্ষম, এ হল শুদ্ধ ব্রহ্মের কথা।

এই শুদ্ধ ব্রহ্মের যতটা অংশ (আকাশে মেঘাবৃত অংশের ন্যায়) আলাদা দেখায়, সেটিই হল মায়াবিশিষ্ট সৃষ্টিকর্তা সগুণ ঈশ্বর এবং সেই পরমাত্মার একাংশে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থান।

এরপর সাকার ঈশ্বর অর্থাৎ অবতারের বিষয়ে বলা হচ্ছে। সগুণ ঈশ্বর যখন প্রয়োজন মনে করেন, তখনই তিনি নিজ মায়াকে অধীন করে যেরূপে কার্য করা আবশ্যক, সেই রূপে প্রকটিত হন। কখনও মানবরূপে, কখনও বরাহরূপে, কখনও নৃসিংহরূপে, কখনও আবার মৎস্য বা কচ্ছপ, হংস বা অশ্বরূপে অবতরণ করেন। এইভাবে প্রয়োজনানুসারে ঈশ্বর নানারূপে জনসমক্ষে অবতীর্ণ হয়ে লোকেদের দর্শন দান করে কৃতার্থ করেন। কিন্তু তাঁর এই জগৎ- সংসারে অবতীর্ণ হওয়া প্রাকৃত জীবেদের মতো হয় না। ঈশ্বরের অবতীর্ণ হওয়ার সময় এবং হেতু শ্রীভগবান গীতায় জানিয়েছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

(৪।৭-৮)

'হে অর্জুন ! যখনই ধর্মের হানি এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখনই আমি আমার নিজ রূপ প্রকাশ করি। সাধু ব্যক্তিদের উদ্ধার করার জন্য এবং দুষ্কর্মকারীদের বিনাশের জন্য ও ধর্ম স্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে থাকি।'

এখন পৃথিবীতে এমন কোনো অবতার দেখা যায় না যে তিনি বলেন 'আমি সাধুদের উদ্ধার করার জন্য অবতার গ্রহণ করেছি।' জগতে সাধু অনেক পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাঁদের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হওয়ার মতো কাউকে দেখা যায় না, যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতো বলতে পারেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

(গীতা ১৮।৬৬)

'সর্ব ধর্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র আমার, (বাসুদেবেরই) অনন্যরূপে শরণাগত হও, আমি তোমাকে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত করব, তুমি চিন্তা কোরো না।'

একমাত্র তাঁর শরণাগত হলেই মুক্ত করে দেবেন, এরূপ আশ্বস্তকারী এমন কোনো অবতার জগতে এখন দেখা যায় না।

কিছু দিন আগে জনৈক সজ্জন ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, পৃথিবীতে পাপ তো অনেক বেড়ে গেছে, ভগবানের অবতার গ্রহণের সময় এখনও কি আসেনি ? যদি এসে থাকে তাহলে ভগবান অবতাররূপে কেন আসছেন না ? আমি তাঁকে বলি, আমি জানি না। এমন কোনো কথা নেই যে আমি সব জানব। ভগবান কেন অবতার হয়ে আসছেন না, তা শুধু তিনিই জানেন। তবে কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ভগবান অবতারগ্রহণ করলে তুমি প্রসন্ন হবে কি না, তাহলে আমি বলব যে, ভগবান অবতাররূপ গ্রহণ করলে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হব ; কারণ এখন যদি তিনি অবতার হয়ে

আসেন, তাহলে আমি তাঁর দর্শনলাভ করতে পারব। কেউ যদি সরলতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন যে তোমার কী অনুমান, ভগবানের অবতারত্ব গ্রহণের সময় হয়েছে কি না ? তাহলে আমি অনুমান করে বলব যে, সম্ভবতঃ সে সময় এখনও আসেনি, কারণ সময় হলে ভগবান অবশ্যই অবতীর্ণ হতেন। কলিযুগে যেমন হওয়ার কথা, এখনও তেমন বেশি কিছু হয়নি। ভগবানের অন্যান্য অবতারত্ব গ্রহণের সময় অত্যাচার যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল, ধর্ম এবং ধর্মপ্রাণ ঋষিদের যেরূপ দুর্দশা হয়েছিল, এখন অবস্থা তেমন হয়নি। ভগবান শ্রীরামের সময় রাক্ষসদের অত্যাচারে ঋষিদের হাড়ের পাহাড় তৈরি হয়েছিল।

প্রশ্ন— ঋষিদের কি রাক্ষস-বধ করার শক্তি ছিল না, যদি শক্তি ছিল, তাহলে তাঁরা কেন রাক্ষসদের বধ করেননি ?

উত্তর—ঋষিদের রাক্ষস বধের সামর্থ্য থাকলেও, তাঁরা নিজ তপোবল ক্ষীণ করতে চাননি। শ্রীবিশ্বামিত্র যখন জনক রাজ দশরথের কাছে এসে যজ্ঞ রক্ষার জন্য শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে চেয়েছিলেন, তখন তিনি একথাই বলেছিলেন যে, 'যদিও আমি নিজেই রাক্ষস-বধ করতে সক্ষম, কিন্তু তাতে আমার তপ ক্ষয় হয়ে যাবে, যা আমি চাই না। শ্রীরাম-লক্ষ্মণের দ্বারা রাক্ষস বধ হলে আমার যজ্ঞ রক্ষাও হবে এবং তপোবলও সুরক্ষিত থাকবে। আমি জানি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সহজেই এই রাক্ষসদের মারতে সক্ষম, তুমি জানো না।' মহারাজ দশরথ মায়ায় মোহাবৃত হয়ে শ্রীরাম লক্ষ্মণকে সাধারণ বালক মনে করে অপত্য-স্নেহের বশ হয়ে বিশ্বামিত্রকে বলেন— 'মুনিবর ! আমি নিজে আপনার সঙ্গে যেতে রাজী আছি, এক রাবণকে বাদ দিয়ে সমস্ত রাক্ষসদের আমি বধ করতে পারি। আপনি রাম-লক্ষ্মণকে না নিয়ে আমাকে নিয়ে চলুন।' রাজাকে এইভাবে মোহগ্রস্ত দেখে মহারাজ শ্রীবশিষ্ঠ, যিনি ভগবান শ্রীরামের প্রভাব তত্ত্বতঃ জানতেন, দশরথকে বুঝিয়ে বললেন—'রাজন্! তুমি কোনো চিন্তা কোরো না, শ্রীরাম সাধারণ বালক নয়, এঁদের কোনো ভয় নেই, তুমি প্রসন্ন মনে এঁদের শ্রীবিশ্বামিত্রের সঙ্গে যেতে দাও।' এই প্রসঙ্গে জানা যায় যে ঋষিগণ শক্তিসম্পন্ন হলেও, তপোবলের সাহায্যে রাক্ষস বধ করতে চাননি।

কলিযুগে এখনও পর্যন্ত এমন সময় উপস্থিত হয়েছে বলে মনে হয় না

যাতে ভগবানকে অবতারত্ব গ্রহণ করতে হয়, আর ভগবান এমনিও হঠাৎ করে অবতরণ করেন না। প্রথমে তিনি কারক পুরুষকে তাঁর অধিকার সমর্পণ করে পাঠান, মালিক যেমন তাঁর দোকান সামলানোর জন্য তাঁর কর্মচারীকে পাঠান। তারপর তিনি যখন দেখেন যে, কর্মচারী ঠিক মতো কার্যসিদ্ধি করতে পারছে না, তিনি ছাড়া কার্যোদ্ধার হবে না ; তখন তিনি নিজে আসেন ; তেমনই যখন কারক পুরুষকে পাঠাবার পরেও তাঁর অবতার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা পড়ে, তখন তিনি স্বয়ং উপস্থিত হন। কারক পুরুষ তাঁকে বলা হয় যে যিনি ভগবৎ কৃপায় নিজ পুরুষার্থ দ্বারা এই শ্লোক অনুসারে—

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥

(গীতা ৮।২৪)

বিভিন্ন দেবতাদের দ্বারা ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে শেষকালে ভগবানের সত্যলোকে পৌঁছান। এই লোকে যাওয়া মহাত্মাদের স্বাগত করার জন্য ভগবানের পার্ষদ (অমানব পুরুষ) বিমান নিয়ে আসেন এবং তাঁদের অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে ভগবানের পরমধামে নিয়ে আসেন। প্রলয়কালেও সেই ধাম বিনাশ হয় না, সেখানে কোনোপ্রকার শোক বা দুঃখ থাকে না। যিনি একবার সেই ধামে পৌঁছে যান, তাঁকে আর কর্ম-বন্ধনযুক্ত জন্মগ্রহণ করতে হয় না। সম্ভবতঃ এই লোককে শ্রীবিষ্ণুর উপাসকগণ 'বৈকুণ্ঠ' শ্রীকৃষ্ণের উপাসকগণ 'গোলোক' এবং শ্রীরামের উপাসকগণ 'সাকেতলোক' বলেন। এই লোকে পৌঁছে মহাত্মারা মহাপ্রলয় পর্যন্ত সুখে সেখানে নিবাস করেন এবং শেষকালে শুদ্ধব্রহ্মে শান্ত (লীন) হয়ে যান। এইসব পুরুষদের মধ্যে যদি কোনো মহাপুরুষ সৃষ্টিকর্তা ভগবানের প্রেরণায় অথবা নিজ ইচ্ছায় শুধুমাত্র জগতের হিতের উদ্দেশ্যে সংসারে আসেন, তবে তাঁকে বলা হয় কারক পুরুষ। এরূপ পুরুষদের দর্শন, স্পর্শ, ভাষণ ও চিন্তা দ্বারাও শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিগণ উদ্ধার লাভ করতে পারেন। শ্রীবশিষ্ঠ এবং শ্রীবেদব্যাস ছিলেন এইরকমই মহাপুরুষ। এঁদের জগতে আগমন হয় শুধুমাত্র জগতের উদ্ধারের জন্যই। যেমন কোনো কারাগারে বন্দী কয়েদীকে মুক্ত করার জন্য কোনো বিশেষ অবকাশে রাজার

প্রতিনিধি এসে সেখানকার বন্দী কয়েদীদের মুক্ত করে স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে ফিরে আসেন। জেলে কয়েদীরাও যায়, রাজ প্রতিনিধিও যান ; পার্থক্য হল এই যে কয়েদীরা তাদের দুষ্কর্মের ফল ভোগ করার জন্য বাধ্য হয়ে জেলে যায় আর রাজ প্রতিনিধিগণ স্বাধীনভাবে দয়াবশতঃ কয়েদীদের মুক্ত করার জন্য জেলে যান। সেইরকম কারক পুরুষেরাও জগতে বন্ধনগ্রস্ত জীবেদের মুক্ত করার জন্যই প্রকটিত হন। অবতার এবং কারক পুরুষের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে অবতার কখনও জীবভাব প্রাপ্ত হন না এবং কারক পুরুষ কোনোকালে জীবভাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন, ভগবৎ-কৃপায় নিজ নিজ পুরুষার্থ দ্বারা ক্রমমুক্তির সাহায্যে তাঁরা শেষকালে এই স্থিতি লাভ করেছেন। এখন তো অবতার ও কারক পুরুষ জগতে দেখা যায় না, জীবন্মুক্ত মহাত্মার সাক্ষাৎ অবশ্য পাওয়া যেতে পারে।

মুক্তি দুপ্রকারের—সদ্যোমুক্তি এবং ক্রমমুক্তি। যিনি এই দেহে অজ্ঞতা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে নিত্য, সত্য, আনন্দবোধ স্বরূপে স্থিতিলাভ করেন, যাঁর সমস্ত কর্ম জ্ঞানাগ্নির দ্বারা ভস্মীভূত হয়েছে এবং যাঁর দৃষ্টিতে এক অনন্ত ও অসীম পরমসত্তা ব্যতীত জগতের অন্য অস্তিত্বের সর্বতোভাবে অভাব হয়ে যায়, তেমন মহাপুরুষকে জীবন্মুক্ত বলা হয়, তাকেই বলা হয় সদ্যোমুক্তি। আর যিনি উপরোক্ত ক্রমে লোকান্তর হয়ে পরমধামে পৌঁছান, তাঁকে বলা হয় ক্রমমুক্ত। এই মুক্তির চারটি বিভেদ আছে, যেমন—সামীপ্য, সারূপ্য, সালোক্য এবং সাযুজ্য। ভগবানের সমীপে নিবাস করাকে বলা হয় সামীপ্য, ভগবানের সমান স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়াকে বলা হয় সারূপ্য, ভগবানের সমান লোকে বাস করাকে বলা হয় সালোক্য এবং ভগবানকে প্রাপ্ত করার নাম সাযুজ্য। যিনি দাস-দাসী বা মাধুর্যভাবে ভগবানে ভক্তি করেন, তাঁর সামীপ্য-মুক্তি লাভ হয়, যিনি মিত্রভাবে ভজনা করেন, তাঁর হল সারূপ্য মুক্তি, যিনি বাৎসল্যভাবে ভজনা করেন, তাঁর হয় সালোক্য মুক্তি আর যিনি শত্রুভাবে অথবা জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তিদ্বারা ভগবানের উপাসনা করেন তিনি সাযুজ্য-মুক্তি প্রাপ্ত হন।

এখন এই জগতে এমন মহাপুরুষও আছেন। জীবন্মুক্ত তাঁকেই বলা হয় যিনি প্রথমে জীবভাব প্রাপ্ত ছিলেন, পরে পুরুষার্থের সাহায্যে মুক্ত হয়েছেন।

যেমন শ্রীশুকদেব এবং রাজা জনক ইত্যাদি।

জীবেদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে কিছু এমন মহাপুরুষ আছেন, যাঁরা জীবভাব থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন। দ্বিতীয়তঃ এমন ব্যক্তিও এই সময় দেখা যেতে পারে, যাঁরা দৈবী সম্পত্তির আশ্রয় গ্রহণ করে মুক্তি মার্গে স্থিত আছেন এবং মুক্তির অত্যন্ত কাছে পৌঁছে গেছেন। সম্ভবতঃ তাঁরা ইহজন্মেই মুক্তিলাভ করবেন অথবা কারোকে হয়তো আর এক জন্মধারণ করতে হবে। এরূপ পুরুষদেরও জীবন্মুক্ত পুরুষদের ন্যায় কাম-ক্রোধ , আনন্দ-শোকের অধীন প্রায়শঃই হতে দেখা যায় না।

প্রশ্ন—প্রাচীন কালে ঋষি ও মহাত্মাগণের হর্ষ ও শোক হয়েছে, গ্রন্থাদিতে এমন উল্লেখ পাওয়া যায়। তার কারণ কী ?

উত্তর—রাগ-দ্বেষাদির জন্য যাঁর হর্ষ-শোক বিকার হয় তাঁকে জীবন্মুক্ত বলে মনে করা হয় না। কিন্তু যদি কর্তব্যবশতঃ লোকমর্যাদার জন্য কখনও কখনও মহাত্মাদের মধ্যে হর্ষ-শোকের ব্যবহার দেখা যায়, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। ভগবান শ্রীরাম সীতা হরণের পরে এবং লক্ষ্মণের শক্তির আঘাত লাগায় অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, এমনভাবে তাঁর শোক প্রকট হয়েছিল যে, যা দেখে এবং শুনে অনেকেই মোহমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তা ছিল ভগবানের লোক ব্যবহার আর এতে আরও এক বিশেষ কথা আছে। ভগবান শ্রীরাম সীতাদেবী ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের জন্য ব্যাকুলভাবে বিলাপ করে জগৎকে মহান প্রেমিক এবং তাঁর মৃদু স্বভাবের অতি উচ্চ শিক্ষা প্রদান করেছেন। গীতায় ভগবান তাঁর স্বভাবের কথা জানিয়েছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাস্তথৈব ভজাম্যহম্॥

'যিনি আমাকে যেভাবে ভজনা করেন, আমিও তাঁকে সেভাবেই ভজনা করি।' সেই অনুসারে ভগবান শ্রীরাম সীতাদেবীর জন্য বিলাপ করতে করতে বৃক্ষ-শাখা-লতা-পাতাকে তাঁর সংবাদ জানাবার জন্য জিজ্ঞাসা করে এই প্রমাণ করেছিলেন যে, রাবণের হাতে বন্দী সীতাদেবী যেভাবে রামের প্রেমে মগ্ন হয়ে 'রাম রাম' বলে বিলাপ করছিলেন, শ্রীরামও সেইভাবে সীতাদেবীর প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে প্রেমে বিহ্বল হয়ে 'সীতা সীতা' বলে বিলাপ

করছিলেন। তেমনই ভ্রাতা লক্ষ্মণের জন্য বিলাপ করে এই প্রমাণ করেছিলেন যে শ্রীরামের জন্য ভ্রাতা লক্ষ্মণ যেমন ব্যাকুল ছিলেন, শ্রীরামও ভ্রাতার জন্য তেমনই ব্যাকুল ছিলেন। এর দ্বারা আমাদের এই শিক্ষাই গ্রহণ করা উচিত যে ভগবানকে আমরা যে ভাবে ভজনা করব, ভগবানও আমাদের সেইভাবে ভজনা করতে প্রস্তুত। এতো হল ভগবানের কথা, কিন্তু ঋষি-মহাত্মাদেরও লোক-ব্যবহার সাধারণের হর্ষ-শোকের মতো হতে পারে।

জীবন্মুক্ত ও মুক্তির সন্নিকটে পৌঁছানো ব্যক্তিদের কথা বলা হল। জগতে এমন সকাম পুণ্যাত্মা যোগীও আছেন যিনি—

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে॥

(গীতা ৮।২৫)

এই শ্লোক অনুসারে বিভিন্ন দেবতাদ্বারা অগ্রসারিত হয়ে চন্দ্রের জ্যোতি প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গে নিজ শুভ-কর্মের ফল ভোগ করে ফিরে আসে।

পূর্বকালে এমন যোগীও ছিলেন, যাঁরা অষ্ট সিদ্ধি অথবা তার কোনো কোনো সিদ্ধি প্রাপ্ত করে থাকতেন, বর্তমানে এই বিদ্যা লুপ্ত প্রায় হয়ে গেছে। বাস্তবে শুধুমাত্র সিদ্ধিপ্রাপ্তির দ্বারা পরমকল্যাণও হয় না। সিদ্ধিদ্বারা সাংসারিক সুখ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু মোক্ষ লাভ হয় না, তাই শাস্ত্রজ্ঞরা এই সিদ্ধিকে মোক্ষের বাধক এবং জাগতিক সুখের সাধক বলে মনে করেন। সিদ্ধিপ্রাপ্তকারী যোগীগণ প্রায়শঃ সিদ্ধিতেই আটকে থাকেন। কিন্তু উপরে উল্লিখিত মুক্তিমার্গে অবস্থিত যোগীগণ মোক্ষরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করেন, তাই তাঁদের স্থান এঁদের থেকে উর্ধ্বে।

প্রশ্ন—অষ্ট সিদ্ধি কাকে বলে, কীভাবে প্রাপ্তি হয় এবং তার দ্বারা কী কী কাজ হয় ?

উত্তর—সিদ্ধিগুলির নাম হল অণিমা, গরিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব ও বশিত্ব। অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনের দ্বারা এর প্রাপ্তি হয় এবং এই সিদ্ধির সাহায্যে এই প্রকার কার্য হতে পারে—

অণিমা—নিজ স্বরূপকে অণুর ন্যায় করে নেওয়া, যেমন শ্রীহনুমান লঙ্কায় প্রবেশের সময় হয়েছিলেন।

গরিমা— শরীরকে অত্যন্ত ভারী ওজন সম্পন্ন করা, যেমন কর্ণ বান চালানোর সময় অর্জুনকে বাঁচাবার জন্য সারথিরূপে উপবিষ্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ করেছিলেন—সেই ভারী ওজনের সাহায্যে ঘোড়া সহ রথকে মাটিতে বসিয়ে দিয়েছিলেন।

মহিমা—শরীরকে মহা বিশাল বানানো, যেমন ভগবান শ্রীবামন করেছিলেন।

লঘিমা—শরীরকে অত্যন্ত হালকা করে তোলা।

প্রাপ্তি —ইচ্ছানুসার পদার্থ প্রাপ্তি করা, যেমন শ্রীভরদ্বাজ মুনি ভরতের আতিথ্যের সময় করেছিলেন।

প্রাকাম্য—কামনা অনুযায়ী কাজ হয়ে যাওয়া।

ঈশিত্ব—ঈশ্বরের সমান সৃষ্টি রচনা করার সামর্থ্য হয়ে যাওয়া।

বশিত্ব—নিজ প্রভাবে ইচ্ছামতো কারোকে নিজ বশে আনয়ন করা।

এই হল অষ্ট সিদ্ধি, এখন এই সিদ্ধিপ্রাপ্ত পুরুষ দৃষ্টিগোচর হয় না। সত্য-ভাষণ দ্বারা বাক্য-সত্য হওয়া ইত্যাদি উপসিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া পুরুষ মাঝে-মধ্যে দেখা যায়।

প্রশ্ন—সত্যবাক্য বলা পুরুষের সব শব্দই কী সত্য হয়ে যায় ?

উত্তর—অবশ্যই হয়। উপনিষদ ও পুরাণে এর নানা প্রমাণ আছে, যাতে সিদ্ধ হয় যে প্রাচীনকালে এমনই হোত। ছোট ঋষিকুমার রাজা পরীক্ষিৎকে শাপ দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে ঠিক সময়ে সাপ এসে পরীক্ষিৎকে দংশন করে। রাজা নহুষ যখন ইন্দ্রপদে আরূঢ় হয়ে ঋষিদের নিজ পালকীতে ব্যবহার করেন এবং কামান্ধ হয়ে ইন্দ্রাণীর কাছে যেতে থাকেন এবং 'শীঘ্রং সর্প' বলে ঋষিকে অবহেলা করেন, তখন ঋষি বলেন 'তুমি সাপ হয়ে যাও' সেই অনুসারে নহুষ তখনই সাপ হয়ে যান। প্রার্থনা করায় আবার তাঁকে এই বর প্রদান করেন যে, 'দ্বাপরযুগে ভীমকে ধরলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হবে, তখন তোমার উদ্ধার প্রাপ্তি হবে ; এই বচনও সত্য হয়েছিল।'

সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, সত্যবাদীর মুখনিঃসৃত প্রতিটি শব্দই সত্য হয়। তবে যদি কোনো সত্যবাদী কখনও জেনে-বুঝে অসত্য কথা বলেন, তাহলে সেই শব্দটুকু সত্য হয় না, যেমন মহারাজ যুধিষ্ঠির জেনে-বুঝে অশ্বত্থামার মৃত্যুর সন্দেহের কথা বলেছিলেন, কিন্তু অশ্বত্থামার তখন মৃত্যু হয়নি, কিন্তু যদি কেউ কেবল সত্যই বলেন তাহলে তাঁর বাণীর সত্য হওয়াতে কোনো সন্দেহ থাকে না।

আজকাল এমন কিছু ব্যক্তিও আছেন, যাঁরা মন ও ইন্দ্রিয়াদি প্রায় বশীভূত করেছেন। যাঁরা মাসাধিককাল পত্নীর সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করলেও কামাসক্ত হন না, যেমনই আহার সামগ্রী সামনে থাকুক তাতে মন আকৃষ্ট হয় না, ক্রোধ ও শোকের যত বড় কারণই হোক, ক্রোধ বা শোক হয় না। কিন্তু এমন কোনো মহাপুরুষকে আমি দেখিনি, যাঁর দর্শন, স্পর্শ, ভাষণ বা চিন্তা দ্বারা উদ্ধার লাভ হয়। যেমন শ্রীনারদের দর্শন ও উপদেশে লক্ষ লক্ষ প্রাণী উদ্ধার পেয়েছিল। শ্রীশুকদেবের উপদেশে লক্ষ লক্ষ লোকের কল্যাণ হয়েছিল, জীবন্মুক্ত আচার্যদের চিন্তাদ্বারা বহু শিষ্য উদ্ধার লাভ করেছেন এবং বঙ্গদেশের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন, স্পর্শ এবং উপদেশে হাজার হাজার ব্যক্তির কল্যাণ হয়েছে। একথা অবশ্যই বলা যায় যে, মানুষ চাইলে সে এমনই হতে পারে, যার দর্শন, স্পর্শ ও ভাষণ এবং চিন্তাদ্বারা লোকে উদ্ধার পেতে পারে।

~~○~~

(১৮) কল্যাণের তত্ত্ব

সর্বপ্রকার দুঃখ থেকে, বিকার থেকে, গুণ ও কর্ম থেকে চিরকালের জন্য মুক্তিলাভ করে পরম বিজ্ঞান আনন্দময় কল্যাণস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করাই হল পরম কল্যাণ। একেই কেউ বলেন মুক্তি, কেউ পরম পদ-প্রাপ্তি, কেউ নির্বাণপদ-প্রাপ্তি এবং কেউ মোক্ষ বলে থাকেন। মনুষ্যমাত্রেরই এই স্থিতি প্রাপ্ত করার অধিকার আছে।

শ্রীভগবান বলেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥

(গীতা ৯।৩২)

'আমার শরণ গ্রহণকারী নারী, বৈশ্য, শূদ্র ও পাপযোনি (অন্ত্যজ ইত্যাদি) যে কেউই হোক (সকলেই) পরম গতি প্রাপ্ত হয়।' অতএব যে ব্যক্তি পরমাত্মার ধ্যান-ভজনের সাহায্যে এইভাবে সংসার থেকে মুক্ত হয়ে পরমপদ লাভ করেন, তাঁর মানব-জীবন কৃতার্থ হয়ে যায়।

এই বিষয়ে লোকে বিভিন্ন প্রকারের ভ্রমাত্মক কথা বলে থাকেন, যার মধ্যে প্রধানতঃ এই তিনটি—

১) 'বর্তমান দেশ-কালে বা এই পৃথিবীতে মুক্তি সম্ভব নয় এবং গৃহস্থ ও নীচবর্ণের মুক্তি হয় না।'

২) 'মুক্ত পুরুষ দীর্ঘকাল অবধি মুক্তি সুখ ভোগ করার পুনরায় জগতে জন্মগ্রহণ করে থাকেন।'

৩) 'মুক্তি হয় জ্ঞানের দ্বারা। কাম, ক্রোধ, মিথ্যা, চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি বিকার থাকলেও মানুষের জ্ঞান লাভ হলে জীবন্মুক্ত হওয়া সম্ভব। উপরোক্ত বিকার হল অন্তঃকরণের ধর্ম ; যতক্ষণ অন্তঃকরণ আছে, প্রারব্ধানুসারে এই বিকারাদি থাকাও অনিবার্য।'

এই তিনটি বিষয়ই বাস্তবে সত্যও নয় এবং লাভপ্রদ অথবা যুক্তিযুক্তও নয়। এগুলি মেনে নিলে অত্যন্ত ক্ষতি হয় ও লোকের মনে ভ্রম উৎপাদন করে, তাই এখানে এই বিষয়ে ক্রমশঃ আলোচনা করা হচ্ছে।

১) মুক্তির কারণ হল আত্মজ্ঞান এবং সেই আত্ম সাক্ষাৎকারের জন্য নিষ্কাম কর্মযোগ, ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি সকল দেশ-কালের উপযোগী সুসাধ্য উপায় বেদ ও শাস্ত্রাদিতে জানানো হয়েছে।

কোনো বিশেষ যুগ, দেশ, বর্ণ বা আশ্রমই মুক্তির কারণ বলে মনে করা হয় না। সাধন সম্পন্ন হলেই প্রত্যেক দেশ-কালে ও প্রত্যেক বর্ণ আশ্রমেই মুক্তি লাভ করা সম্ভব। উপরোক্ত গীতার শ্লোকেও এই কথাই বলা হয়েছে।

শ্রুতি বা স্মৃতিতে কোথাও কখনই কলিযুগ, ভারত-ভূমি বা কোনো বর্ণাশ্রমকে নিষিদ্ধ বলা হয়নি। এখন পর্যন্ত সাধু-মহাত্মাদের জীবন-চরিত্রেও প্রমাণিত হয় যে, যে কোনো দেশ, ভূমি, বর্ণ ও আশ্রমে সাধনা করলে মুক্তিলাভ সম্ভব। বিষ্ণুপুরাণে একটি প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে—

'এমন সময় কখন— যখন ধর্মের সামান্য অনুষ্ঠানও মহৎ ফল প্রদান করে', এই বিষয় নিয়ে নিয়ে ঋষিগণের মধ্যে একবার বিবাদ হয়েছিল, শেষে তাঁরা সকলে একত্রে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাবার জন্য ভগবান বেদব্যাসের কাছে যান। শ্রীব্যাসদেব তখন ভগবতী ভাগীরথীতে স্নান করছিলেন। ঋষিগণ তাঁর জন্য জাহ্নবী তীরে বৃক্ষের ছায়ায় অপেক্ষা করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে ব্যাসদেব গঙ্গা থেকে উঠে মুনিদের শুনিয়ে বলতে লাগলেন 'কলিযুগই সাধু', 'হে শূদ্র ! তুমিই সাধু, তুমিই ধন্য !' 'হে নারীসকল ! তোমরা ধন্য, তোমাদের থেকে বেশি ধন্য আর কে আছে ?' মুনিরা এই শুনে অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন, তাঁরা কৌতূহলবশতঃ ব্যাসদেবের কাছে এই কথার মর্ম জিজ্ঞাসা করেন। ব্যাসদেব বলেন এই হল তোমাদের বিবদমান প্রশ্নের উত্তর। এই তিন শ্রেণীর মানুষ অল্প আয়াসেই পরমগতি লাভ করতে সক্ষম। অন্য যুগে, অন্য বর্ণে এবং অন্যান্য পুরুষের ক্ষেত্রে অনেক সাধনা করলে কিছু হতে পারে, কিন্তু—

স্বল্পনৈব প্রযত্নেন ধর্মঃ সিদ্ধ্যতি বৈ কলৌ।
নরৈরাত্মগুণাম্ভোভিঃ ক্ষালিতাখিলকিল্বিষৈঃ॥
শূদ্রৈশ্চ দ্বিজশুশ্রূষাতৎপরৈর্মুনিসত্তমাঃ।
তথা স্ত্রীভিরনায়াসং পতিশুশ্রূষয়ৈব হি॥
ততস্ত্রিতয়মপ্যেতন্মম ধন্যতমং মতম্।

(বিষ্ণুপুরাণ ৬।২।৩৪-৩৬)

'হে মুনিগণ ! কলিযুগে মানুষ সদ্‌বৃত্তি অবলম্বন করে অল্প প্রয়াসেই সমস্ত পাপমুক্ত হয়ে ধর্মসিদ্ধি প্রাপ্ত করে। শূদ্র দ্বিজ সেবার দ্বারা এবং নারীগণ পতিসেবার দ্বারা অতি অল্প আয়াসেই উত্তমগতি লাভ করতে পারেন। তাই আমি এই তিনেদের ধন্যতম বলেছি।' এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বর্তমান দেশ-

কালে নারী ও শূদ্রদের জন্য মুক্তির পথ আরও সুগম।

কিছুক্ষণের জন্য যদি একথা মেনে নেওয়া যায় যে বর্তমান দেশ-কালে এবং প্রত্যেক বর্ণাশ্রমে মুক্তি হয় না, মানুষ ভ্রমবশতঃই উৎসাহপূর্বক মুক্তির জন্য সাধনে সংযুক্ত রয়েছে, তাহলেও একথা মেনে নেওয়া যায় না যে, এই ভুলের জন্য তারা নিজেদের কোনো ক্ষতি করে। মুক্তি না হোক, সাধনের কিছু ফল তো অবশ্যই পাওয়া যাবে ! সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাবে, অন্তঃকরণের শুদ্ধি হবে এবং দৈবী গুণ বিকাশ লাভ করবে। যদি মুক্তি নাই হয়, তবে তা সাধক ও অসাধক উভয়েরই হবে না, কিন্তু সাধকের সাধন দ্বারা সদ্‌গুণাদি বৃদ্ধি পাবে এবং সাধনহীন ব্যক্তি কিছুই পাবে না। এর অন্যথা যদি বর্তমান দেশ-কালে প্রত্যেক মানুষের মুক্তি হয়, তাহলে সাধকের তো হবেই, কিন্তু সাধন না করা ব্যক্তি সর্বতোভাবে বঞ্চিত থেকে যাবেন। তিনি যদি সাধনে প্রবৃত্তই না হন, তাহলে মুক্তি কেমন করে হবে ? সুতরাং সেই হতভাগ্য ভ্রমবশতঃ এই পরমলাভে বঞ্চিত হয়ে বারংবার জগতের আসা-যাওয়া চক্রে আবর্তিত হতে থাকবেন। সুতরাং এই যুক্তিতেও প্রত্যেক দেশ, কালে এবং প্রত্যেক বর্ণাশ্রমে মুক্তিকে সুগম বলে মনে করা উচিত, এটি শ্রেয়স্কর ও তর্কসিদ্ধ।

২) শ্রুতি, স্মৃতি ও উপনিষদ্ ইত্যাদি সদ্গ্রন্থে কোথাওই মুক্ত পুরুষদের পুনরাগমন-সম্বন্ধীয় প্রমাণ পাওয়া যায় না। পুনরাগমন সেই সকাম পুণ্যাত্মা পুরুষের হয় যিনি নিজ পুণ্য বলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত করেন। ভগবান বলেছেন—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্দিবি দেবভোগান্॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥

(গীতা ৯।২০-২১)

'মুক্ত পুরুষের সম্পর্কে শ্রুতি-স্মৃতিতে স্থানে স্থানে তাঁর পুনরায় জগৎ-সংসারে না আসারই প্রমাণ পাওয়া যায়।'

শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

(গীতা ৮।১৬)

'হে অর্জুন ! ব্রহ্মলোক থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত লোকই পনুরাবর্তনশীল, কিন্তু হে কৌন্তেয় ! আমাকে প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম হয় না।'

'ন চ পুনরাবর্ততে ন চ পুনরাবর্ততে' (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৮।১৫।১)

'ইমং মানবমাবর্তং নাবর্তন্তে' (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৪।১৫।৬)

'তেষামিহ ন পুনরাবৃত্তিঃ' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৬।২।১৫)

ইত্যাদি শ্রুতি প্রসিদ্ধ। এই সকল শাস্ত্রবচন দ্বারা একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে মায়ামুক্ত জীবগণ কখনও পুনরাগমন করেন না। লোকদৃষ্টিতে জীবনমুক্ত পুরুষদের দ্বারা যথাযোগ্য কর্ম সম্পাদিত হয় মনে হলেও, বাস্তবে তাঁদের ঐসকল কর্মের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকে না।

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥

(গীতা ৪।১৯)

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥

(গীতা ১৮।১৭)

এতদ্ব্যতীত সেই মুক্ত পুরুষের দৃষ্টিতে এক বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-আনন্দঘন পরমাত্ম-তত্ত্ব ব্যতীত অন্য কিছুই থাকে না—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

(গীতা ৭।১৯)

তিনি মনে করেন সবকিছুই বাসুদেব। তাই তাঁকে মুক্ত বলা হয়। এরূপ পুরুষের কোনো কালেও এই মায়াময় জগৎ-সংসারের সঙ্গে পুনরায় সম্পর্ক হয় না। কারণ তাঁর দৃষ্টিতে সংসারের চিরকালের মতো আত্যন্তিক অভাব হয়ে যায়। এই অবস্থায় তাঁর পুনরাগমন কীকরে সম্ভব হয় ?

এই নিয়ে যদি কোনো ব্যক্তি কুতর্ক করেন যে, মুক্ত জীবের যদি পুনরাগমন না হয়, তাহলে মুক্ত হতে হতে জগতের সমস্ত জীবই যদি মুক্ত হয়ে যায়, তাহলে তো সৃষ্টির অস্তিত্বই আর থাকবে না। এর উত্তর হল যে প্রথমতঃ তেমন হওয়া সম্ভব নয় কারণ—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

(গীতা ৭।৩)

'হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কোনো এক ব্যক্তি আমাকে পাবার জন্য চেষ্টা করেন, সেই যোগী ব্যক্তিদের মধ্যে হয়তো কোনো ব্যক্তি আমাকে (পরমাত্মাকে) তত্ত্বতঃ জানতে পারেন।' এই অবস্থায় সকল জীবের মুক্ত হওয়া অসম্ভব, কারণ জগতে জীব অসংখ্য। তবুও যদি মানা হয় যে, যদি কখনও 'সমস্ত জগতের সকল জীব যদি কোনোভাবে মুক্ত হয়ে যায়' তাহলে তাতে ক্ষতি কী ? আজ পর্যন্ত বহু শ্রেষ্ঠ পুরুষ এর পূর্বে চেষ্টা করেছেন, মহাত্মাগণ এখনও চেষ্টা করেন এবং পরেও করবেন। যদি কোনো দিন এঁদের পরিশ্রম সফল হয় এবং সমগ্র বিশ্বের জীব উদ্ধার লাভ করে, তবে তা অতি উত্তম ব্যাপার, এতে জগতের কী ক্ষতি ?

তর্কের খাতিরে যদি মেনে নেওয়া যায় যে মুক্ত পুরুষের পুনর্জন্ম হয় এবং যাঁরা পুনর্জন্ম মানেন না তাঁরা ভুল করেন, কিন্তু এই ভুলে তাঁদের কী ক্ষতি হয় ? এই সিদ্ধান্ত অনুসারে পুনরাগমন যাঁরা মানেন, তাঁরাও ফিরে আসবেন এবং যাঁরা মানেন না তাঁরাও। ফল দুয়েরই এক। কিন্তু কখনও এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয় যে 'মুক্ত পুরুষের পুনরাগমন হয় না' তাহলে যাঁরা ভ্রমবশতঃ পুনরাগমন মানেন, তাঁদের অত্যন্ত ক্ষতি হবে ; কারণ যদি পুনরাগমন না হয়

তাহলে সেই পুনরাগমন মানা ব্যক্তিদের মুক্তিপ্রাপ্তি হবে না, তাঁরা নিজেদের ভুলের জন্য এই পরমলাভ থেকে বঞ্চিত হবেন এবং যাঁরা পুনরাগমন না মানেন, তাঁরা মুক্ত হয়ে যাবেন। এই সিদ্ধান্তেই পুনরাগমন মেনে না নেওয়াই যুক্তিযুক্ত লাভজনক ও সর্বোত্তম বলে প্রমাণিত হয়।

৩) শ্রুতি-স্মৃতি ও উপনিষদ্ ইত্যাদি কোনো প্রামাণিক সদ্গ্রন্থ দ্বারা এটি প্রমাণিত হতে পারে না যে কাম-ক্রোধ বিকারসমূহ থাকতে জীবন্মুক্তি হওয়া সম্ভব। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্পষ্ট ভাষায় কাম-ক্রোধ-লোভকে নরকের দ্বার বলা হয়েছে—

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ॥

(১৬।২১)

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রশ্নোত্তরে এবিষয় স্পষ্টভাবে জানা যায় যে সমস্ত পাপের মূল কারণ হল 'কাম', সেই কামকে আত্মজ্ঞানের সাহায্যে বিনাশ করেই সাধক মুক্ত হতে পারেন। তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৬ তম শ্লোক থেকে ৪৩ তম শ্লোক পর্যন্ত এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। যতক্ষণ কাম-ক্রোধ ও হর্ষ-শোক ইত্যাদি বিকার থেকে মানুষ মুক্ত না হয়, ততক্ষণ তার মুক্তিলাভ কীকরে সম্ভব ? প্রকৃতপক্ষে মুক্ত পুরুষের সংসারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না। গীতায় বলা হয়েছে—

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥

(৩।১৭-১৮)

তাঁর অন্তঃকরণ মন-বিক্ষেপ এবং আবরণ থেকে সর্বদা রহিত হয়ে শুদ্ধ হয়ে ওঠে। এই স্থিতিতে কাম-ক্রোধ এবং হর্ষ-শোক ইত্যাদি তাঁর মধ্যে কীভাবে থাকতে পারে ? ভগবান বলেছেন—

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্॥

(গীতা ৫।২৫-২৬)

'হর্ষশোকৌ জহাতি', 'তরতি শোকমাত্মবিৎ' ইত্যাদি শ্রুতিসকলও এর প্রমাণে প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রাদিতে যেখানেই দেখা যায় সর্বত্রই এর সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীপরমাত্মার সাক্ষাৎলাভ হলে যখন সমস্ত বিকারের জড় (মূল) আসক্তি দূর হয়ে যায় তখন তার কার্যরূপ অন্যবিকার কীভাবে থাকতে পারে ? এই শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জীবন্মুক্তের শুদ্ধ অন্তঃকরণে বিকারাদির অস্তিত্ব মানা কখনোই উচিত নয়।

যদি এটি মেনে নেওয়া হয় যে জীবন্মুক্তির পরও কাম-ক্রোধ-বিকারাদির লেশ থেকে যায় ; এবং যাঁরা লেশ থেকে যাওয়া মানেন না, তাঁরা ভ্রমবশতঃই কাম-ক্রোধ বিকারাদিকে মূল থেকে দূর করার চেষ্টা করেন, তাহলে চিন্তা করতে হবে যে এই ভ্রমের জন্য তাঁদের কী কোনো ক্ষতি হয় ? নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে কাম-ক্রোধ-বিকারাদি নাশের উপায় যাঁরা করেন না, তাঁদের থেকে যাঁরা এর নাশের উপায় করেন, তাঁরা বেশি বুদ্ধিমান ; কারণ প্রযত্ন করলে তাঁদের বিকারাদি বেশি করে বিনাশ হবে এবং তাঁরা জীবন্মুক্তদের মধ্যে কমপক্ষে উত্তম বলে বিবেচিত হবেন। একজন ব্যক্তি অত্যন্ত রাগী এবং কামাসক্ত আর অন্যজন এই দুটি থেকে মুক্ত, এই সিদ্ধান্ত অনুসারে এঁরা উভয়েই জীবন্মুক্ত। এই অবস্থায় এটাই স্বাভাবিক যে এঁদের মধ্যে কাম- ক্রোধ পরায়ণ ব্যক্তির থেকে কাম-ক্রোধরহিত জীবন্মুক্ত ব্যক্তি বেশি সম্মানীয় হবেন। এই দৃষ্টিতেও কাম-ক্রোধাদি বিকার নাশ করাই উচিত বলে প্রমাণিত হয়। যদি কখনও এই কথা সত্য হয় যে জীবন্মুক্তের অন্তঃকরণে কোনো বিকার অবশিষ্ট থাকে না, তাহলে বিকারের অবশিষ্ট থাকা যারা মানেন সেই মেনে নেওয়া ব্যক্তিদের শুধু মুক্তি হবে না এমন নয়, বরং তাঁদের আরও ক্ষতি

হবে ; কারণ তাঁরা মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারা (গীতা ১৮।২২ শ্লোক অনুযায়ী)ই নিজেকে জ্ঞানী ও মুক্ত মনে করে নিজ চরিত্র শোধরানোর কাজ থেকে বঞ্চিত থেকে যান এবং কাম-ক্রোধ বিকারাদি মোহময় জালে আবদ্ধ হয়ে নানাপ্রকার নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে (গীতা ১৬।১৬-২০ শ্লোক অনুসারে) সর্বসময় সংসার চক্রে আবর্তিত হন। তাই সর্বোপরি এই সিদ্ধান্তই মেনে নেওয়া উচিত যে জীবন্মুক্তের অন্তরে কাম-ক্রোধ এবং হর্ষ-শোক-বিকার অবশিষ্ট থাকে না।

এতদ্ব্যতীত মুক্তির সম্পর্কে লোকে আরও নানাপ্রকার আশঙ্কা করে থাকে, কিন্তু লেখার বিষয় বেড়ে যাবার জন্য সেসব নিয়ে আলোচনা করা হল না।

এই লেখার দ্বারা পাঠক হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে মুক্ত পুরুষ সর্বদা ত্রিগুণের অতীত হন (গীতা ১৪ অধ্যায়ের ১৯ তম এবং ২২ থেকে ২৫ তম শ্লোক পর্যন্ত এর বর্ণনা আছে), তার দ্বারা তাঁর অন্তঃকরণে কোনো বিকার বা কোনো কর্মের অবশেষ থাকে না এবং সেইজন্যই তাঁর পুনর্জন্মও হয় না। গুণাদির সঙ্গ-ই হল পুনর্জন্মের কারণ। ভগবান বলেছেন—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু॥

(গীতা ১৩।২১)

পাঠক নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে বর্তমান দেশ-কালে মুক্তি লাভ করা কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়, সুতরাং শীঘ্রই সাবধান হয়ে কর্তব্যে ব্যাপৃত হওয়া উচিত। আলস্যে এখনও পর্যন্ত বহু সময় নষ্ট হয়েছে। এবার সচেতন হওয়া প্রয়োজন। মানব-জীবনের একটিও অমূল্য ক্ষণ ব্যর্থ হতে দেওয়া উচিত নয়। যে সময় চলে যায়, তা আর ফিরে আসে না। তাই জন্য যথাসম্ভব শীঘ্র সৎসঙ্গের সাহায্যে নিজ কল্যাণের পথ জেনে তাতে আরূঢ় হওয়া উচিত।

—এই হল কল্যাণের তত্ত্ব।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।

~~○~~

(১৯) কল্যাণ প্রাপ্তির উপায়

মুক্তিকে কল্যাণ বলা হয়, এই শব্দটি পরমপদ বা পরমগতির বাচক। কল্যাণ প্রাপ্তি করার তিনটি প্রধান উপায় আছে—নিষ্কাম কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ অর্থাৎ সাংখ্যযোগ এবং ভক্তিযোগ অর্থাৎ ধ্যানযোগ। এরমধ্যে ভক্তির সাধন স্বতন্ত্রভাবে করা যায় এবং নিষ্কাম কর্মযোগ এবং সাংখ্যযোগেরও সঙ্গে করা যায়।

নিষ্কাম কর্মযোগের বিস্তারিত বর্ণনা শ্রীমদ্‌ভগবদগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯তম শ্লোক থেকে ৫৩ তম শ্লোক পর্যন্ত আছে এবং নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত পুরুষদের লক্ষণ এই অধ্যায়ের ৫৪ তম থেকে ৭২তম শ্লোক পর্যন্ত বর্ণিত।

জ্ঞানযোগের বিস্তারিত বর্ণনা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১তম থেকে ৩০ তম শ্লোক পর্যন্ত আছে এবং সেই অনুসারে তৃতীয় অধ্যায়ের ২৮ তম ; পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টম এবং নবম ও চতুর্দশ অধ্যায়ের ১৯তম শ্লোকে জ্ঞানযোগীর কর্ম করার নিয়ম বলা হয়েছে। এছাড়া পঞ্চম অধ্যায়ের ১৩ তম থেকে ২৬ তম শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞান এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৯তম থেকে ৫৫তম শ্লোক পর্যন্ত উপাসনাসহ জ্ঞানযোগের বর্ণনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের ২৭তম থেকে ২৯তম, ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১১তম থেকে ৩২ তম ; অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চম থেকে ২২ তম ; নবম অধ্যায়ের ৩০তম থেকে ৩৪ তম, দশম অধ্যায়ের অষ্টম থেকে ১২তম, একাদশ অধ্যায়ের ৩৫তম থেকে ৫৫তম এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্লোক পর্যন্ত ধ্যানযোগ বা ভক্তিযোগের বর্ণনা আছে, বাস্তবে ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগ একই। এইভাবে গীতার অন্যান্য স্থানেও তিন সাধনের ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণনা আছে। এই সবেতে বর্তমান সময়ের জন্য কল্যাণপ্রাপ্তির সর্বাপেক্ষা সহজ এবং উত্তম উপায় হল ভক্তিসহ নিষ্কাম কর্মযোগ। এর অত্যন্ত সুন্দর উপদেশ অষ্টাদশ অধ্যায়ের নিম্নলিখিত ১১ শ্লোকে আছে—

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ৫৬ ॥
চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥ ৫৭ ॥
মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥ ৫৮ ॥
যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥ ৫৯ ॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥ ৬০ ॥
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ৬১ ॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ ৬২ ॥
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩ ॥
সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ ৬৪ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ৬৫ ॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬ ॥

'আমার পরায়ণ নিষ্কাম কর্মযোগী সমস্ত কর্ম সর্বদা করতঃ আমার কৃপায় সনাতন অবিনাশী পরমপদ প্রাপ্ত হন। অতএব হে অর্জুন! তুমি সমস্ত কর্ম মন থেকে আমাকে সমর্পণ করে আমার পরায়ণ হয়ে সমত্ববুদ্ধিরূপ নিষ্কাম কর্মযোগ অবলম্বন করে সর্বদা আমাতে চিত্তসম্পন্ন হও।'

'এইভাবে তুমি নিরন্তর আমাকে মন সমর্পণ করে আমার কৃপায় জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি সঙ্কট থেকে অনায়াসে পার হয়ে যাবে আর যদি অহঙ্কারবশতঃ আমার বচন না শোনো তাহলে নাশ হবে অর্থাৎ তুমি পরমার্থ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে।'

'তুমি যে অহঙ্কারবশতঃ মনে করছ যে আমি যুদ্ধ করব না, তোমার এই পণ মিথ্যা ; কারণ ক্ষত্রিয়তার স্বভাবই তোমাকে জোর করে যুদ্ধে নিয়োগ করবে।'

'হে অর্জুন ! যে কর্ম তুমি মোহবশতঃ করতে চাইছ না, তোমার পূর্বকৃত স্বাভাবিক কর্মবন্ধনে পরবশ হয়ে বাধ্য হয়ে তা তুমি করবে।'

'কারণ হে অর্জুন ! শরীররূপ যন্ত্রে আরূঢ় হয়ে সমস্ত প্রাণীর অন্তর্যামী পরমেশ্বর তাঁর মায়াদ্বারা তাঁদের কর্মানুসারে চালিত করে সকল প্রাণীর হৃদয়ে স্থিত আছে। সুতরাং হে ভারত ! তুমি সর্বতোভাবে সেই পরমেশ্বরেরই শরণাগত হও এবং তাঁর কৃপাতেই পরম শান্তি ও সনাতন পরমধাম প্রাপ্ত হবে।'

'এইভাবে গুহ্য হতে অতি গুহ্য জ্ঞান আমি তোমাকে জানালাম। এই রহস্যযুক্ত জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে বিচার করে তুমি যেমন চাও, তেমনই করো অর্থাৎ যা তোমার ইচ্ছা হয়, তা-ই করো।'

'হে অর্জুন ! সর্বাপেক্ষা গোপনীয় থেকেও অতি গোপনীয় আমার পরম রহস্যময় বচন শোনো ; কারণ তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। তাই এই পরম হিতকারী বাক্য তোমাকে আবার বলব।'

'হে অর্জুন ! তুমি শুধু সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেব পরমাত্মা আমাতেই অনন্য প্রেমে নিত্য-নিরন্তর অচল মনযুক্ত হও এবং পরমেশ্বর আমাকেই শ্রদ্ধা-ভক্তিসহ নিষ্কামভাবে নাম-গুণ ও প্রভাব শ্রবণ-কীর্তন মনন এবং পঠন-পাঠন দ্বারা নিরন্তর ভজনা করো এবং আমার (শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এবং কিরীট, কুণ্ডলাদি ভূষণযুক্ত পীতাম্বর, বনমালা ও কৌস্তভমণি ধারী বিষ্ণুকে) কায়-মনো-বাক্যে সর্বস্ব অর্পণ করে অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি ও প্রেমে বিহ্বলতাপূর্বক পূজন করো এবং আমার সর্বশক্তিমান, বিভূতি, বল, ঐশ্বর্য, মাধুর্য, গাম্ভীর্য, ঔদার্য, বাৎসল্য ও সৌহার্দ ইত্যাদি গুণসম্পন্ন সকলের আশ্রয়রূপ বাসুদেবকে

বিনয়ভাবে ভক্তিসহ সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করো, এরূপে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে, আমি একথা তোমায় সত্যপ্রতিজ্ঞাপূর্বক জানাচ্ছি, কারণ তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় সখা।'

'অতএব সর্ব ধর্ম অর্থাৎ সমস্ত কর্মের আশ্রয় ত্যাগ করে একমাত্র আমি অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেব পরমাত্মারই অনন্য শরণ লাভ করো, আমি তোমাকে সর্বপাপ থেকে মুক্ত করব, তুমি শোক কোরো না।'

কী দিব্য উপদেশ ! এতদ্‌ব্যতীত ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগ সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদির মধ্যে পাতঞ্জলযোগদর্শন ধ্যানযোগের এবং নারদসূত্র ও শাণ্ডিল্যসূত্র — যা ভক্তিযোগের প্রধান গ্রন্থ, এতে অবশ্যই কিছু মতভেদ আছে, কিন্তু এইসব গ্রন্থে ভক্তিযোগেরই প্রতিপাদন আছে। এই গ্রন্থসমূহ মনন করলে ভক্তিযোগের অনেক কিছুই জানা যায়।

বিস্তারিতভাবে না লিখে আমি গীতার কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করে এবং কয়েকটির সংখ্যা জানিয়ে পাঠকদের সঙ্কেত করেছি। যদি কোনো সৎপুরুষ এই শ্লোকগুলির অর্থ মনন করে সেই অনুসারে জীবনধারণ করেন, তাহলে আমার মনে হয় তাঁর পরম কল্যাণ এবং মোক্ষপ্রাপ্তি অতি সহজেই হতে পারে।

~~o~~

(২০) ভগবান কীরূপ ?

ভগবান কীরূপ ? এই সম্বন্ধে যা কিছু বলতে চাই তা আমার নিজের কথা, হতে পারে যে আমার সুনিশ্চিত চিন্তা ঠিক নয়। তবে অন্যের কথা ঠিক নয়, আমি একথাও বলছি না। কিন্তু আমার নিশ্চয়ে কোনো সংশয় নেই, এই বিষয়ে আমি সংশয়গ্রস্ত নই, তা সত্ত্বেও অন্যের কথা যে ভুল তা বলার আমার কোনো অধিকার নেই।

ভগবান কী ? এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ হল এই যে, একথার উত্তর

ভগবানই জানেন। এছাড়া ভগবানের বিষয়ে তাঁকে তত্ত্বতঃ জানা জ্ঞানী পুরুষ তাঁর তটস্থ অর্থাৎ নিকটস্থ কিছু ভাব জানাতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের স্বরূপ ভগবানই জানেন। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা সঙ্কেতের রূপে ভগবানের স্বরূপের কিছু বর্ণনা করতে পারেন, কিন্তু যা কিছু জানা বা বর্ণনায় আসে, বাস্তবে ভগবান তার থেকেও বহু গুণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বেদ, শাস্ত্র, মুনি, মহাত্মাগণ পরমাত্মার সম্পর্কে সর্বদা বলেই আসছেন, কিন্তু তাঁদের বক্তব্য এখনও পর্যন্ত শেষ হয়নি। এখনও পর্যন্ত তাঁদের সব কথা মিলিয়ে বা পৃথকভাবে, যদি কেউ পরমাত্মার বাস্তবিক স্বরূপ বর্ণনা করতে চান, তাহলে তাঁর দ্বারা পূর্ণ বর্ণনা সম্ভবপর নয়। তা অপূর্ণই থেকে যাবে। এই সিদ্ধান্তে এটিই নিশ্চিত হয় যে ভগবান অবশ্যই আছেন, তাঁর থাকা নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি ভগবানকে নিজ মনে যেভাবে সাধন করেন, তার পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই, তবে তাকে শুধরে নিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে সাধনকারীদের কেউই ভুল করেন না অথবা এক প্রকার সকলেই ভুল করেন। যিনি পরমাত্মার জন্য সাধন করেন, তিনি পরমাত্মার পথেই চলেন, তাই কোনো ভুল নেই আর ভুল এইজন্য হয় যে, যে যাকে তিনি সাধ্য ও ধ্যেয় মনে করে তিনি তার প্রাপ্তির জন্য সাধন করেন, সেই সাধ্য বা ধ্যেয় থেকে প্রকৃত পরমাত্মার স্বরূপ অত্যন্তই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যা জানা, মানা ও সাধন করা হয়, তা হল ধ্যেয় পরমাত্মার সাঙ্কেতিক লক্ষ্য। তাই যতক্ষণ সেই ধ্যেয়প্রাপ্তি না হয় তখন পর্যন্ত সবই ভুল করছে, এমন বলা হয়। কিন্তু তাতে একথা মানা উচিত নয় যে প্রথম ভুলকে ঠিক করে, তারপর সাধন করবে। ঠিক কেউই করতে পারেন না, তবে যথার্থ প্রাপ্তি হলে আপনিই সব ঠিক হয়ে যায়। এর আগে যা হয়, তা অনুমান হয় আর অনুমান দ্বারা যা হয় সেটিই হল প্রাপ্তির ঠিক উপায়। যেমন এক ব্যক্তি দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখেছেন, তিনি চাঁদ না দেখা অপর ব্যক্তিকে ইশারাতে বলেন যে তুমি আমার দৃষ্টিতে দেখ ঐ বৃক্ষের চার আঙুল উচ্চে চাঁদ আছে। এই কথায় তার লক্ষ্য বৃক্ষের দিকে হয়ে চাঁদের কাছে চলে যায় এবং সে চাঁদ দেখতে পায়। বাস্তবে সে তার চোখের মধ্যেও ঢুকেও দেখে না এবং চাঁদও ঐ বৃক্ষের চার আঙুল ওপরে থাকে না। যতো ছোট চন্দ্রমণ্ডল সে দেখে, চন্দ্রমণ্ডল ততো

ছোটও নয়। কিন্তু লক্ষ্য ঠিক করায়, সে চাঁদকে দেখে থাকে। কেউ কেউ দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখাবার জন্য অন্য কিছুর সাহায্য নেয়, কেউ তার থেকে বেশি নিশ্চিত করাবার জন্য চুণের দাগ দিয়ে বা ছবি এঁকে তাকে দেখায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রের বাস্তবিক স্বরূপ এর কোনোটিরই মতো নয়। এতে চন্দ্রের প্রকাশও নেই, ততো বড়োও নয় এবং এতে চন্দ্রের কোনো গুণও নেই। এই ভাবে লক্ষ্য করে দেখলে ভগবানকে দেখা বা জানা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্য ও প্রকৃত স্বরূপে এমনই পার্থক্য থাকে, যা চন্দ্র ও তার লক্ষ্যের মধ্যে থাকে। হয়তো কোনো যোগী চন্দ্রের স্বরূপ বলতেও পারেন, কিন্তু ভগবানের স্বরূপ কেউই বলতে পারেন না ; কারণ তা বাণীর বিষয় নয়। এটি যখন প্রাপ্ত করা হয়, তখনই জানা যায়। যিনি প্রাপ্ত করেন, তিনিও বুঝিয়ে দিতে পারেন না। এ হল প্রকৃত স্বরূপের কথা। এখন কথা হল যে, সাধকের জন্য এই ধ্যেয় বা লক্ষ্য কী প্রকার হওয়া উচিত এবং তা কীভাবে বোঝা যেতে পারে ? এই ব্যাপারে মহাত্মাদের কাছে শুনে এবং শাস্ত্র পড়ে আমার অনুভবে যে বিষয় নিশ্চিতরূপে মনে হয়, তা জানানো হচ্ছে। কারোর ইচ্ছা হলে তিনি তা কার্যকরী করতে পারেন।

পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপের ধ্যান তো প্রকৃতপক্ষে হতে পারে না। যতক্ষণ চোখে, মনে এবং বুদ্ধিতে পরমাত্মার স্বরূপ অনুভূত না হয়, ততক্ষণ যে ধ্যান করা হয়, তা অনুমানের দ্বারা হয়। মহাত্মাদের কাছে শুনে, শাস্ত্র পাঠ করে, চিত্র দেখে সাধন করলে সাধক পরমাত্মার দর্শন লাভ করতে পারেন। প্রথমে একথা বলা হয়েছে যে, যিনি যেভাবে পরমাত্মার ধ্যান করেন, তিনি সেভাবেই করতে থাকুন, পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। অবশ্যই কিছু শুধরে নেওয়ার আবশ্যকতা থাকে।

ধ্যান কীভাবে করা উচিত ?

কিছু মানুষ নিরাকার শুদ্ধ ব্রহ্মের ধ্যান করেন, কিছু সাকার দুবাহুসম্পন্ন এবং কিছু আবার চতুর্ভুজধারী ভগবান বিষ্ণুর ধ্যান করেন, বাস্তবে ভগবান বিষ্ণু, রাম ও কৃষ্ণ যেমন এক, তেমনই দেবী, শিব, গণেশ ও সূর্যও তার থেকে ভিন্ন নয়। এমন অনুমান করা হয় যে লোকেদের বিভিন্ন ধারণার

অনুসারে একই পরমাত্মাকে নিরূপণ করাবার জন্য শ্রীবেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করেন। যে দেবতার নামে যে পুরাণ রচনা করেন, তাতে তাঁকেই সবার ওপরে সৃষ্টিকর্তা ও সর্বগুণসম্পন্ন ঈশ্বর বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নাম-রূপের পার্থক্য দ্বারা সবেতেই সেই এক এবং অভিন্ন পরমাত্মার কথা বলা হয়েছে। সাধক নিজ ইচ্ছানুসারে নাম-রূপের চিন্তা করতে পারেন। যদি কোনো একটি স্তম্ভকেই পরমাত্মা মনে করে তার ধ্যান করা হয়, তাহলে সেটিও পরমাত্মার ধ্যান বলেই বিবেচিত হয়। অবশ্যই তাতে পূর্ণভাবে ঈশ্বর-ভাব হওয়া চাই।

সাকার ও নিরাকারের ধ্যানে সাকারের থেকে নিরাকারের ধ্যান কিছু কঠিন, যদিও ফল উভয়েরই এক, কেবল সাধনে পার্থক্য থাকে। সুতরাং নিজের ভালো লাগা অনুসারে সাধক সাকার বা নিরাকারের ধ্যান করতে পারেন।

নিরাকারের উপাসক সাকারের ভাব সঙ্গে না রেখে শুধুমাত্র নিরাকারেরই ধ্যান যদি করেন, তাতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু সাকারের তত্ত্ব জেনে পরমাত্মাকে সর্বদেশী, বিশ্বরূপ বলে মেনে নিয়ে নিরাকারের ধ্যান করলে শীঘ্র ফল লাভ হয়। সাকারের তত্ত্ব না বুঝলে কিছু বিলম্বে সাফল্য হয়।

সাকারের উপাসকদের নিরাকার, ব্যাপক ব্রহ্মতত্ত্ব জানার প্রয়োজন, তাহলে তাঁরা শীঘ্রই সহজে সাফল্য লাভ করতে পারবেন। ভগবান গীতায় প্রভাব জেনে ধ্যান করার প্রশংসা করেছেন।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

(১২।২)

'হে অর্জুন ! আমাতে মন একাগ্র করে নিরন্তর আমার ভজন, ধ্যানে সংলগ্ন[১] যে ভক্তগণ, অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আমার সগুণরূপ পরমেশ্বরের ভজনা করেন, তাঁরা আমার নিকট যোগীদের মধ্যে অতি উত্তম যোগী বলে গণ্য হন অর্থাৎ তাঁদের আমি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি।'

বাস্তবে নিরাকারের প্রভাব জেনে যিনি সাকারের ধ্যান করেন, সেই

[১]অর্থাৎ গীতা অধ্যায় ১১।৫৫ অনুসারে নিরন্তর আমাতে সংলগ্ন।

সাধনই ভগবৎ প্রাপ্তিতে উত্তম ও সহজসাধ্য সাধন হয়। কিন্তু পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ এই দুটি থেকেই বিশিষ্ট হয়ে থাকে, যার ধ্যান করা যায় না। নিরাকারের ধ্যান করার কিছু যুক্তি আছে। যাঁর যেটি সহজ মনে হয়, তিনি তারই অভ্যাস করবেন। সবকিছুরই ফল এক। এখানে কয়েকটি যুক্তি বলা হচ্ছে।

সাধকের গীতার অধ্যায় ৬।১১ থেকে ১৩ অনুসারে, একান্ত স্থানে স্বস্তিক বা সিদ্ধাসনে উপবেশন করে, নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন করে বা নিজ ইচ্ছানুযায়ী চোখ বন্ধ করে প্রত্যহ নিয়ম করে কমপক্ষে তিনঘণ্টা ধ্যানাভ্যাস করা উচিত। কেউ যদি তিন ঘণ্টা না পারেন তাহলে দুই বা অন্ততঃ একঘণ্টা অবশ্যই ধ্যান করা উচিত। শুরুতে মন নিবিষ্ট না হলে ১৫।২০ মিনিট ধরে আরম্ভ করে ক্রমশঃ ধ্যানের সময় বাড়াতে হবে। অতি শীঘ্র প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকলে সাধকের তিন ঘণ্টা ধ্যানাভ্যাস করা অত্যন্ত জরুরী। ধ্যানে নাম-জপে অত্যন্ত সাহায্য পাওয়া যায়। ঈশ্বরের সকল নামই সমান, তবে নিরাকারের উপাসনায় ওঁ-কারই প্রধান। যোগদর্শনেও মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—

'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।'

(সা. পাদ ১।২৭-২৮)

তার বাচক হল প্রণব (ওঁ), সেই প্রণব জপ করা এবং তার অর্থরূপে (পরমাত্মা)-র ধ্যান করা উচিত।

এই সূত্রাদির মূল আধার হল—**'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা'** (যোগ. ১।২৩)। এতে ভগবানের শরণাগত হওয়ার ও দুইয়ের মধ্যে প্রথমে ভগবানের নাম জানিয়ে, দ্বিতীয়ঃ নাম-জপ ও স্বরূপের ধ্যান করার কথা বলা হয়েছে।

মহর্ষি পতঞ্জলির পরমেশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধীয় অপর চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে আমার এখানে কিছু বলার নেই। এখানে আমার অভিপ্রায় শুধু এই যে, ধ্যানের লক্ষ্য ঠিক করার জন্য পতঞ্জলির কথা অনুযায়ী স্বরূপের ধ্যান করতে করতে নাম-জপ করা উচিত। ওঁ-এর স্থানে যদি কেউ 'আনন্দময়' বা 'বিজ্ঞানানন্দঘন' ব্রহ্মের জপ করেন, তাতেও আপত্তি নেই। পার্থক্য শুধু নামেই, ফলে কোনো পার্থক্য থাকে না।

সব থেকে উত্তম জপ হল তাই, যা মন থেকে করা হয়, যাতে জিভ

নাড়ানো এবং ঠোঁট দিয়ে উচ্চারণ করার কোনো প্রয়োজন হয় না। এরূপ জপে ধ্যান ও জপ দুই-ই এক সঙ্গে হতে পারে। অন্তঃকরণের চারটি পদার্থের মধ্যে মন ও বুদ্ধি—এই দুটিই হল প্রধান। বুদ্ধি দ্বারা প্রথমে পরমাত্মার স্বরূপ স্থির করে তাতে বুদ্ধি স্থির করবে, পরে মনের সাহায্যে সেই সর্বত্র পরিপূর্ণ আনন্দময়ের বারংবার আবৃত্তি করতে থাকবে। এতে জপ এবং ধ্যান একসঙ্গে হয়। বাস্তবে আনন্দময়ের জপ ও ধ্যানে কোনো বিশেষ পার্থক্য নেই। দুই কাজই একসঙ্গে করা সম্ভব।

দ্বিতীয় যুক্তি হল শ্বাসের দ্বারা জপ করার। শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার সময় কণ্ঠ দ্বারা নামজপ করবে, জিভ ও ঠোঁট বন্ধ করে শ্বাসের সঙ্গে নাম আবৃত্তি করতে থাকবে, একেই বলে প্রাণজপ, একে বলা হয় প্রাণের সাহায্যে উপাসনা। এই জপও উচ্চ শ্রেণীর। এটি করতে না পারলে মনের সাহায্যেই ধ্যান করবে এবং জিভ দিয়ে উচ্চারণ করবে, কিন্তু আমার মনে হয় সাধকের জন্য বেশি সহজ ও লাভপ্রদ হল শ্বাসদ্বারা করা জপ। এ হল জপের কথা, প্রকৃতপক্ষে জপ নিরাকার ও সাকার দুপ্রকারের ধ্যানেই হওয়া উচিত। এবার নিরাকারের ধ্যান সম্বন্ধে কিছু বলা হচ্ছে—

একান্ত স্থানে স্থির আসনে একাগ্র চিত্তে বসে এইভাবে অভ্যাস করবে। যে বস্তু ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা প্রতীত হয় তাকে কল্পিত মনে করে ত্যাগ করবে। যা সব প্রতীত হয়, তা নেই। স্থূল শরীর, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি কিছুই নেই, এইভাবে সবকিছুর না থাকা চিন্তা করতে করতে, অভাবকারী পুরুষের সেই বৃত্তি (যাকে জ্ঞান বিবেক ও প্রত্যয়ও বলা হয়, এ সবই শুদ্ধ বুদ্ধির কার্য, এখানে বুদ্ধিই তার অধিকরণ, যার দ্বারা পরমাত্মার স্বরূপ মনন করা হয় এবং প্রতীত হতে যাওয়া প্রত্যেক বস্তুতে এটি নেই, এটি নেই বলে না থাকা প্রতীয়মান হয়, একে বেদাদিতে 'নেতি-নেতি' এরূপ নয়, এরূপ নয়—বলা হয়েছে অর্থাৎ দৃশ্যের অভাবকারী বৃত্তিও শান্ত হয়ে যায়। সেই বৃত্তিকে ত্যাগ করতে হয় না, তা স্বয়ংই শান্ত হয়ে যায়। ত্যাগ করলে তো ত্যাগকারী, ত্যাজ্য বস্তু এবং ত্যাগ এই তিনটি বিষয় এসে পড়ে। তাই ত্যাগ করার দরকার হয় না, ত্যাগ স্বতঃই হয়ে যায়। ইন্ধনের অভাবে যেমন অগ্নি স্বতঃই শান্ত হয়ে যায়,

তেমনই বিষয়ের অভাবে বৃত্তিসমূহ সর্বতোভাবে শান্ত হয়ে যায়। পরে যা বাকী থাকে, সেটিই হল পরমাত্মার স্বরূপ। একেই বলা হয় নির্বীজ সমাধি।

'তস্যাপি নিরোধে সর্বনিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ।' (যোগ. ১।৫১)

এখানে প্রশ্ন থাকে যে ত্যাগের পরে ত্যাগী থাকেন। তিনি অল্প, পরমাত্মা মহান্, তাহলে থেকে যান যিনি তাঁকে কীকরে পরমাত্মার স্বরূপ বলা যায় ? কথাটা ঠিকই কিন্তু তিনি ততক্ষণই অল্প যতক্ষণ তিনি এক সীমাবদ্ধ স্থানে থেকে অপর সমস্ত জায়গাতে অন্য কিছুতে পরিপূর্ণ বলে মনে করেন। অন্য সব বস্তুর অভাব হলে, শেষকালে একমাত্র তত্ত্ব থাকে, সেটিই 'পরমাত্মতত্ত্ব'। সংসারকে সমূলে উপড়ে ফেলে দিলে পরমাত্মা স্বতঃই বিরাজ করেন। সমস্ত উপাধির বিনাশ হলে সর্ব পার্থক্য দূর হয়ে অপার একরূপ পরমাত্মার স্বরূপ থেকে যায়, তিনিই সর্বত্র পরিপূর্ণ ও সর্ব দেশ-কালে পরিব্যাপ্ত। দেশ-কালও প্রকৃতপক্ষে তাতে কল্পনা করা হয়। তিনি তো একই পদার্থ, যা আপনাতে আপনি স্থিত, অনির্বচনীয় এবং অচিন্ত্য। যখন চিন্তা সর্বতোভাবে ত্যাগ হয়ে যায়, তখনই সেই অচিন্ত্য ব্রহ্মের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়, সাধক তাতে লীন হয়ে যান। যতক্ষণ অজ্ঞতার বাঁধনে অন্য পদার্থ ভর্তি থাকে, ততক্ষণ এই ভাণ্ডার অদৃশ্য থাকে। অজ্ঞান দূর হলে একটি বস্তুই থেকে যায়, তখন তাতে মিশে যাওয়া অর্থাৎ সমস্ত বৃত্তি শান্ত হয়ে একটি বস্তু থেকে যাওয়া নিশ্চিত হয়।

মহাকাশ থেকে ঘটাকাশ ততক্ষণ পৃথক যতক্ষণ ঘড়া ভেঙে না যায়। ঘড়া ভেঙে গেলেই অজ্ঞানের নাশ হয়, কিন্তু এই দৃষ্টান্তও পূর্ণভাবে খাটে না। কারণ ঘড়া ভেঙে গেলে তার ভাঙা টুকরো আকাশের কিছু অংশ ঢেকে থাকে কিন্তু এই অজ্ঞানরূপ কলস ভেঙে গেলে জ্ঞানের কোনো অংশ ঢাকার জন্যই একটি টুকরোও অবশিষ্ট থাকে না। ভ্রম দূর হতেই জগতের সবকিছু উদাহরণ দ্বারা বলা যায় ঘটাকাশ হল জীব আর মহাকাশ পরমাত্মা। উপাধিরূপী ঘট নষ্ট হয়ে গেলে দুটি একরূপ হয়ে যায়। একরূপ তো আগেও ছিল, শুধু উপাধির পার্থক্যে আলাদা বলে প্রতীত হত।

বাস্তবে আকাশের দৃষ্টান্ত পরমাত্মার পক্ষে সর্বদেশীয় নয়। আকাশ জড়, পরমাত্মা জড় নয়। আকাশ দৃশ্য, পরমাত্মা দৃশ্য নয়। আকাশ বিকারশীল আর

পরমাত্মা বিকারশূন্য। আকাশ অনিত্য, মহাপ্রলয়ে এর নাশ হয়, পরমাত্মা নিত্য। আকাশ শূন্য, তাতে সব কিছু ভরে যায়, পরমাত্মা ঘন, তাতে কিছু ধরানো সম্ভব নয়। আকাশের থেকে পরমাত্মা অত্যন্ত বিশিষ্ট। ব্রহ্মের এক অংশে মায়া, যাকে অব্যাকৃত প্রকৃতি বলা হয়, তার এক অংশে মহত্তত্ত্ব (সমষ্টি -বুদ্ধি) থাকে, যে বুদ্ধির সাহায্যে সকলের বুদ্ধি হয়, সেই বুদ্ধির এক অংশে অহঙ্কার থাকে, সেই অহঙ্কারের একাংশে আকাশ, আকাশে বায়ু, বায়ুতে অগ্নি, অগ্নিতে জল, জলেতে পৃথিবী। এরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড মায়ার এক অংশে স্থিত, সেই মায়া পরমাত্মার এক অংশে থাকে, এই বিচারে আকাশ তো পরমাত্মার তুলনায় অত্যন্তই অল্প, কিন্তু এই স্বল্পতা জানা যায় পরমাত্মাকে জানলে পরই। যেমন, এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখেন। তাঁর স্বপ্নে দিক্, কাল, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, দিন, রাত ইত্যাদি সমস্ত দৃশ্য ভেসে থাকে, অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে দেখা যায়। কিন্তু চক্ষু খুলতেই সেই সমস্ত সৃষ্টি অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন মনে হয় যে এই সৃষ্টি নিজ সংকল্প দ্বারা নিজেরই অন্তরে ছিল, সেটি অবশ্যই আমার থেকে ছোট ছিল, আমি তো তার থেকে বড়। বাস্তবে তা তো ছিলই না, এ শুধু কল্পনাই ছিল, কিন্তু যদি থেকেও থাকে তো অতি অল্প ছিল, আমার এক অংশে ছিল, আমারই সঙ্কল্প ছিল অতএব আমার থেকে কোনো ভিন্ন বস্তু ছিল না। চোখ খুললে—জেগে উঠলে তবেই এই জ্ঞান হয়, এইরূপ পরমাত্মার সত্য স্বরূপে জাগ্রত হলে এই জগতও আর থাকে না। যদি মেনে নেওয়া যায় যে কোথাও থাকে, তবে তা মহাপুরুষদের কথা অনুযায়ী পরমাত্মার এক ক্ষুদ্র অংশে এবং তাঁর সঙ্কল্পমাত্রে থাকে।

তাই আকাশের দৃষ্টান্ত পরমাত্মাতে পূর্ণরূপে সাজে না। এতটুকু অংশে হয় যে মানুষের দৃষ্টিতে আকাশ যেমন নিরাকার, ব্রহ্মও বাস্তবে তেমনই নিরাকার। মানুষের দৃষ্টিতে আকাশ যেমন নিরাকার রূপে দৃষ্ট হয় ব্রহ্মও সেইরূপে দৃষ্ট হন। মানুষের দৃষ্টি দিয়ে বোঝানোর জন্য আকাশের উদাহরণ দেওয়া হয়। এই সব বস্তু না থাকলে প্রাপ্ত হওয়া বস্তু কেমন হয়, তার স্বরূপ কেউ বলতে পারে না, তা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সূক্ষ্মভাবের তত্ত্বজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মাগণ তাকে

'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' বলেন। তিনি অপার, অসীম, চেতন, জ্ঞাতা, ঘন, আনন্দময়, সুখরূপ, সৎ ও নিত্য। এইরূপ বিশেষণদ্বারা তাঁরা সেই বিশেষ বস্তুর নির্দেশ করেন। তার প্রাপ্তি হলে আর কখনও পতন হয় না। দুঃখ, ক্লেশ, দুর্গুণ, শোক, অল্পতা, বিক্ষেপ, অজ্ঞান, পাপ ইত্যাদি সমস্ত বিকার চিরদিনের মতো নিবৃত্ত হয়ে যায়। এক সত্য, জ্ঞান, বোধ, আনন্দরূপ ব্রহ্মের বাহুল্যের জাগৃতি থাকে। এই জাগৃতিও কেবলমাত্র বোঝানোর জন্য হয়। বাস্তবে কিছুই বলা যায় না।

'অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে।' (গীতা ১৩।১২)

সেই আদিরহিত পরব্রহ্ম অকথনীয় হওয়ায় তাকে সৎও বলা যায় না আবার অসৎও বলা যায় না।

যদি জ্ঞানের ভোক্তা বলা হয়, তবে কোনো ভোগ নেই। যদি জ্ঞানরূপ বা সুখরূপ বলা হয়, তাহলে কোনো ভোক্তা নেই। ভোক্তা, ভোগ, ভোগ্য সব কিছুই এক থেকে যায়, এ এক এমনই বস্তু যাতে ত্রিপুটী থাকে না। এই হল নিরাকারের ধ্যানের এক বিধি।

ধ্যানের দ্বিতীয় বিধি

নির্জন স্থানে বসে চক্ষু মুদিত করে ভাবতে হবে যে সৎ-চিৎ-আনন্দঘন-রূপ সমুদ্রে বিশাল জোয়ার এসেছে এবং আমি তাতে গভীরভাবে ডুবে গিয়েছি। অনন্ত বিজ্ঞানানন্দঘন সমুদ্রে নিমগ্ন। সমস্ত জগৎ-সংসার পরমাত্মার সঙ্কল্পে ছিল, তিনি সঙ্কল্প ত্যাগ করেছেন, তাতে আমি ব্যতীত সমস্ত জগৎই অদৃশ্য হয়ে গিয়ে, সর্বত্র এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাই বিরাজ করছেন। আমি পরমাত্মার ধ্যান করছি, তাই আমি পরমাত্মার সঙ্কল্পে আছি, আমি ছাড়া আর সবই অদৃশ্য হয়ে গেছে। পরমাত্মা যখন আমার সঙ্কল্প ছেড়ে দেবেন, তখন আমিও থাকব না, শুধুমাত্র পরমাত্মাই বিরাজ করবেন। পরমাত্মা যদি আমার সঙ্কল্প ত্যাগ না করে আমাকে স্মরণে রাখেন, তা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। এইভাবে ভেদ-সহ নিরাকারের উপাসনা করতে হয়।

এতে সাধনাকালে ভেদ ও সিদ্ধকালে অভেদ থাকে, পরমাত্মা সঙ্কল্প ত্যাগ করেছেন, তাই এক পরমাত্মাই বিরাজ করছেন। এ হল একটি যুক্তি। এছাড়া

নিরাকারের ধ্যানের আরও কয়েকটি যুক্তি আছে, তার মধ্যে দুটি যুক্তি 'সত্য সুখ প্রাপ্তির উপায়' শীর্ষক লেখাতে বলা হয়েছে, সেই স্থানে দেখতে হবে। বলার অভিপ্রায় হল যে, নিরাকারের ধ্যান দুপ্রকারের ভেদ-সহ এবং অভেদ-সহ। উভয়েরই ফল এক অভেদ পরমাত্মাপ্রাপ্তি। যাঁরা সর্বদা জীবকে অল্প মনে করে পরমাত্মার সঙ্গে নিজেকে অভেদ বলে মনে করেন না, তাঁদের মুক্তিও সম্পূর্ণ হয় না, তাঁরা চিরদিনের জন্য মুক্ত হন না। তাঁদের প্রলয়কালের পরে আবার ফিরে আসতে হয়, এই মুক্তিবাদে তাঁরা ব্রহ্মপ্রাপ্ত করেও পৃথক থেকে যান।

এবার সাকার ধ্যানের সম্বন্ধে কিছু জানানো হচ্ছে। সাকার উপাসনার ফল দুপ্রকার। সাধক যদি সদ্যোমুক্তি চান, শুদ্ধ ব্রহ্মের সঙ্গে একরূপে মিলে যেতে চান, তবে তিনি তাতে মিলে যান, তাঁর সদ্যোমুক্তি লাভ হয়। কিন্তু তিনি যদি এমন ইচ্ছা করেন যে আমি দাস, সেবক বা সখা হয়ে ভগবানের সমীপে বাস করে প্রেমানন্দ ভোগ করব বা পৃথকভাবে থেকে জগতে ভগবৎ-প্রেম-প্রচাররূপে পরম সেবা করব, তবে তাঁর সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য, সাযুজ্য ইত্যাদি মুক্তির মধ্যে যথারুচি যেকোনো এক-প্রকারের মুক্তি লাভ হবে এবং মৃত্যু হলে তিনি ভগবানের পরম নিত্যধামে গমন করেন। মহাপ্রলয় পর্যন্ত নিত্যধামে থেকে শেষে পরমাত্মাতে মিশে যান বা জগতের উদ্ধার করার জন্য কারক পুরুষ রূপে জন্ম নিতে পারেন। কিন্তু জন্ম নিলেও কোনো কিছুতে তাঁকে বন্দী করা যায় না। মায়া তাঁকে কোনোপ্রকার দুঃখ কষ্ট দিতে পারে না, তিনি নিত্যই মুক্ত থাকেন। এরূপ সাধক যে নিত্যধামে যান, সেই পরমধাম সবার ওপরে থাকে, সর্বশ্রেষ্ঠ হয়। এক সচ্চিদানন্দঘন নিরাকার শুদ্ধ ব্রহ্মের অতিরিক্ত আর কিছুই তার অতীত নয়। তিনি সর্বদা আছেন, সবলোক বিনাশ হলেও, তিনি সর্বদা অবস্থান করেন। তাঁর স্বরূপ কেমন ? এ বিষয় শুধু তিনিই জানেন, যিনি সেখানে পৌঁছতে পারেন। সেখানে গেলে সমস্ত ভ্রম দূর হয়। তাঁর সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা, সেখানে পৌঁছালে যথার্থ সত্যস্বরূপে পরিণত হয়ে যায়। মহাত্মাগণ বলেন যে সেখানে পৌঁছালে ভক্তগণ প্রায়শঃই সেই সব শক্তি ও সিদ্ধি প্রাপ্ত হন, যা ভগবানের আছে, কিন্তু সেই ভক্তগণ ভগবানের

সৃষ্টি কার্যের বিরুদ্ধে তা কখনও ব্যবহার করেন না। সেই মহামহিম প্রভুর দাস, সখা বা সেবক হয়ে সেই পরমধামে সর্বদা বাস করেন এবং সর্বদা তাঁর আদেশেই চলেন। গীতা ৮।২৪ শ্লোকটি সেই পরমধামে যাওয়া সাধকদের জন্যই। বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্য উপনিষদেও এই অর্চিমার্গের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এই নিত্যধামকেই সম্ভবতঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসক গোলোক, ভগবান শ্রীরামের উপাসক সাকেতলোক বলেন। বেদে একেই বলা হয় সত্যলোক এবং ব্রহ্মলোক। (সেই ব্রহ্মলোক নয়, যেখানে শ্রীব্রহ্মা নিবাস করেন, যার বর্ণনা গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ১৬তম শ্লোকের পূর্বার্ধে আছে)। ভগবান সাকার-রূপে নিজের এই নিত্যধামে বিরাজ করেন। সাকাররূপ মেনে নিয়ে নিত্য পরমধাম না মানা অত্যন্ত ভুল।

ভক্তদের জন্য ভগবান কীভাবে সাকার হন ?

পরমাত্মা সৎ-চিৎ-আনন্দঘন নিত্য অপাররূপে সর্বত্র পরিপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ অগ্নির কথা বলা যায়। অগ্নি নিরাকাররূপে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, প্রজ্বলন করার সামগ্রী একত্র করে প্রয়োগ করলেই অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। প্রকটিত হলে তার ব্যক্তরূপের আকার কাঠ ইত্যাদি পদার্থের সমান হয়। এইভাবে গুপ্তরূপে সর্বত্র ব্যাপক অদৃশ্য সূক্ষ্ম নিরাকার পরমাত্মাও ভক্তের ইচ্ছা অনুসারে সাকাররূপে দৃশ্যমান হন। বাস্তবে অগ্নির ব্যাপকতার উদাহরণও একদেশীয়, কারণ যেখানে শুধুমাত্র আকাশ ও বায়ুতত্ত্ব থাকে, সেখানে অগ্নি থাকে না, কিন্তু পরমাত্মা সর্বত্র পরিপূর্ণ, পরমাত্মার ব্যাপকতা সর্বশ্রেষ্ঠ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে পরমাত্মা নেই এবং জগতে এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে পরমাত্মার মায়া নেই। দেশ-কাল যেখানে থাকে, সেখানেই মায়া আছে। মায়ারূপ সামগ্রী নিয়ে পরমাত্মা যেস্থানেই চান আত্মপ্রকাশ করতে পারেন, যেখানে জল এবং শীতলভাব থাকে, সেখানেই বরফ জমতে পারে। যেখানে মাটি ও কুমোর থাকে সেখানেই কলসি তৈরি হতে পারে। সর্বত্র হয়তো জল বা মাটি পাওয়া যায় না, কিন্তু পরমাত্মা ও তাঁর মায়া জগতে সর্বত্রই বিদ্যমান। এরূপ অবস্থায় তাঁর প্রকট হওয়াতে বাধা কোথায় ? শুধুমাত্র ভক্তের প্রেম চাই।

হরি ব্যাপক সর্বত্র সমানা।
প্রেম তেঁ প্রগট হোহিঁ মৈঁ জানা॥

সকলেই তো নিরাকারের ব্যাপকতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন কিন্তু ভগবান তাঁর সাকাররূপ ভক্তকেই দেখান। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি যা চান তাই করতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করলে একজনকে, অনেকজনকে বা সকলকে একসঙ্গে দর্শন দিতে পারেন। অবশ্য তাঁর ইচ্ছা বালকদের ছেলে খেলার মতো উদ্দেশ্যহীন হয় না। তাঁর ইচ্ছা বিশুদ্ধ হয়ে থাকে। ভগবানের ভাব অনুসারেই ভক্তের ইচ্ছা হয়। ভগবান বলেন যে, আমি ভক্তের হৃদয়ে থাকি। সে কথা ঠিক। আমাদের সকলের শরীরে যেমন নিরাকাররূপে অগ্নি স্থিত, তেমনি ভগবানও নিরাকার সৎ-চিৎ-আনন্দঘনরূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন, ভক্তের হৃদয় শুদ্ধ হলে তাঁকে প্রত্যক্ষ দর্শন করা যায়, ভক্ত হৃদয়ের এই হল বৈশিষ্ট্য। সূর্যের প্রতিবিম্ব কাঠ, পাথর ও দর্পণের ওপর পড়ে কিন্তু স্বচ্ছ দর্পণে তাকে যেমন দেখা যায়, কাঠ বা পাথরে সেভাবে দেখা যায় না। এইভাবে ভগবান সকলের হৃদয়ে অবস্থান করলেও অভক্তদের কাষ্ঠসদৃশ অশুদ্ধ হৃদয়ে তা প্রতিভাত হয় না অর্থাৎ দেখা যায় না, ভক্তদের স্বচ্ছ-দর্পণ-সদৃশ শুদ্ধ হৃদয়ে তা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। ভক্ত ধ্যানে তাঁকে যেমন দেখেন, সেইভাবেই তিনি তাঁর হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন।

মহাত্মাগণ বলে থাকেন যেখানে কীর্তন হয়, ভগবান সেখানে স্বয়ং সাকাররূপে উপস্থিত থাকেন, কীর্তনকারী ভক্তকে সাকাররূপে দেখা দেন। এ শুধু ভক্তদেরই চিন্তা একথা মনে করা ঠিক নয়, বাস্তবিক তাকে তিনি সত্যরূপেই দেখেন। কেবল প্রতীত হওয়া তো মায়ার কাজ। ভগবান মায়াশক্তির প্রভু। মহাপুরুষদের এই মান্যতা খুবই যথার্থ।

'মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥' (আদিপুরাণ ১৯।৩৫)

এটি হতে পারে যে ভগবান সাকাররূপে কীর্তনে অবস্থান করলেও কেউ তাঁকে দেখতে পান না, কিন্তু তিনি স্বয়ং কীর্তনে উপস্থিত থাকেন, এই কথা বিশ্বাস করাই শ্রেয়।

ভগবান যখন যেখানে চান, ভক্তের ইচ্ছানুযায়ী রূপে দৃশ্যমান হতে

পারেন, তখন ভক্ত ভগবানকে যেরূপেই ধ্যান করুন, ফল একই হয়। ময়ূর-মুকুটধারী শ্যামসুন্দর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করুন বা ধনুর্বানধারী মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামেরই করুন ; শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করুন বা বিশ্বরূপ বিরাট পরমাত্মার—ফল একই হয়। যে রূপের ধ্যান করবেন তাঁকে পূর্ণ মনে করে করা উচিত। এইরূপ জপও নিজ রুচি অনুসারে ওঁ, রাম, কৃষ্ণ, হরি, নারায়ণ, শিব ইত্যাদি যে ভগবৎনামের করবেন, সবেরই ফল এক। সগুণ ধ্যানের কিছু নিয়ম 'প্রেমভক্তিপ্রকাশ' ও 'প্রকৃত সুখ লাভের উপায়'[১] শীর্ষক লেখায় আছে। তা দেখে নিতে হবে।

এবার এখানে ভগবানের বিশ্বরূপের সম্বন্ধে কিছু বলার আছে। ভগবান অর্জুনকে যে রূপ দেখিয়েছিলেন সেটিও বিশ্বরূপ ছিল এবং বেদবর্ণিত **ভূর্ভুবঃ স্বঃ** রূপ এই ব্রহ্মাণ্ডও ভগবানের বিশ্বরূপ। দুটি একই ব্যাপার। সমগ্র বিশ্বই স্বরূপ। স্থাবর-জঙ্গম সবেতেই সাক্ষাৎ পরমাত্মা বিরাজমান। সমগ্র বিশ্বকে পরমাত্মার সৎকার ও সেবা করা। বিশ্বে যে দোষ ও বিকার আছে, সেসব পরমাত্মার স্বরূপে নেই। এসব বাজীগরের লীলার সমান ক্রীড়ামাত্র। নামরূপ সব খেলা। ভগবান সর্বদাই নিজ স্বরূপে স্থিত। পরমাত্মা নিরাকাররূপে বরফে জলের মতো সর্বত্র পরিপূর্ণ, বরফে জল ব্যতীত অন্য কিছু থাকে না, জলের জায়গায় বরফের রাশি দেখা যায়, বাস্তবে কিছুই নেই, তেমনি সেই শুদ্ধ ব্রহ্মে এই জগৎ-সংসার প্রতিভাত হয়, বস্তুতঃ তা নেই।

সগুণরূপে অগ্নির ন্যায় অব্যক্ত হয়ে তিনি ব্যাপক, তাই যখনই চাইবেন সাকাররূপে প্রকট হতে পারেন—একথাই আগে বলা হয়েছে, এই ব্যাপক পরমাত্মাকে বিষ্ণু বলা হয়, বিষ্ণু শব্দের অর্থই হল ব্যাপক।

ভগবান গুণাতীত, ভালো-মন্দ সর্বগুণাদিযুক্ত এবং কেবল সদ্‌গুণসম্পন্ন

ভগবানের কোনো গুণ নেই, তিনি গুণাতীত, ভালো-মন্দ সবগুণই তাঁর

---

[১]'প্রেমভক্তিপ্রকাশ' এবং 'প্রকৃত সুখ লাভের উপায়' নামের লেখা দুটি গীতাপ্রেসে পুস্তকাকারে আলাদাভাবেও পাওয়া যায়।

আছে এবং তাঁর মধ্যে কেবল সদ্‌গুণই আছে, দুর্গুণ নেই। এই তিনটি কথাই ভগবানের সম্পর্কে বলা যায়। এই বিষয়ে কিছু বুঝতে হবে।

শুদ্ধ ব্রহ্ম নিরাকার চেতন বিজ্ঞানানন্দঘন সর্বব্যাপী পরমাত্মার প্রকৃতরূপ সমস্ত গুণাদি থেকে সর্বতোভাবে অতীত। জগতের সমস্ত গুণ-অবগুণ সত্ত্বঃ, রজ, তম থেকে উদ্ভূত হয়। এই তিন গুণ মায়ার অন্তর্গত, তাই এর নাম ত্রিগুণময়ী মায়া। এর মধ্যে সত্ত্বঃ উত্তম, রজ মধ্যম এবং তম অধম। পরমাত্মা এই মায়া থেকে অত্যন্ত বিশিষ্ট, সর্বতোভাবে অতীত এবং গুণরহিত, তাই তার নাম শুদ্ধ, অতএব তিনি গুণাতীত।

বাস্তবে মায়া বলে কিছু নেই। যদি মেনে নেওয়া যায়, তবে তা শুধুই কল্পনা। এই মায়ার কল্পনা পরমাত্মার একাংশে থাকে। গুণ-অবগুণ সব মায়াতে স্থিত। এই বিচারে সত্য, দয়া, ত্যাগ, বিচার, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি গুণ ও অবগুণে যুক্ত এই সমগ্র জগৎ সেই পরমাত্মাতেই অধ্যারোপিত। এইজন্যই সমস্ত সদ্‌গুণ ও দুর্গুণ তাঁতেই আরোপিত বলে মানা হয়। এই স্থিতিতে তিনি ভালো-মন্দ সর্বগুণ যুক্ত বলা যেতে পারে।

এই ব্রহ্মাণ্ড যাঁর অন্তর্গত, সেই মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর শুদ্ধ ব্রহ্ম থেকে পৃথক নয়, তিনি মায়াকে নিজ অধীন করে প্রাদুর্ভূত হন, সময়-সময়ে অবতাররূপ ধারণ করেন, তাই তাঁকে বলা হয় মায়াবিশিষ্ট।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হয়েছে—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়াং॥

যেমন অবতার প্রকটিত হন, তেমনই সৃষ্টির আদিতে মায়াকে নিজ অধীন করেই ভগবান আবির্ভূত হন। এঁরই নাম বিষ্ণু, এই আদিপুরুষ বিষ্ণু সর্বসত্ত্ব-গুণসম্পন্ন। সত্ত্বগুণের মূর্তি, সাত্ত্বিক তেজ, প্রভাব, সামর্থ্য, বিভূতি ইত্যাদি দ্বারা বিভূষিত। দৈবী সম্পদের গুণই সত্ত্বগুণ। শুদ্ধ সত্ত্বই তাঁর স্বরূপ। রজ ও তমতে দুর্গুণ থাকে। প্রেম সাদৃশ্যতা ও সমানতাতে হয়, তাই যে ভক্তের মধ্যে দৈবী সম্পত্তির গুণ থাকে, তিনিই ভগবানের দর্শনের উপযুক্ত পাত্র হন। মায়াবিশিষ্ট সগুণ ভগবান মায়াকে সঙ্গে নিয়ে সময়-সময়ে অবতাররূপ ধারণ

করেন। তিনি সর্বগুণসম্পন্ন। শুদ্ধ, স্বতন্ত্র, প্রভু এবং সর্বশক্তিমান। এমন কোনো কিছু নেই যা তিনি করতে পারেন না। তাই যদিও সেই শুদ্ধ সত্ত্বগুণ-রূপ সগুণ সাকার পরমাত্মাতে প্রকৃতপক্ষে রজ ও তম থাকে না, তবুও তিনি রজ-তমের কাজ করতে সক্ষম। ভগবান বিষ্ণুকে দুষ্টদলনরূপ হিংসাত্মক কার্য করতে দেখা যায়। মানব-দৃষ্টিতে তাঁর মধ্যে হিংসা ও তমরূপ দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর মধ্যে এই ব্যাপার নেই। ন্যায়পরায়ণ হওয়ায় তিনি যথাবশ্যক কার্য করে থাকেন। রাজা জনক ছিলেন মুক্ত পুরুষ, পরম সাত্ত্বিক, কিন্তু রাজা হওয়ার জন্য ন্যায়কার্য করা ছিল তাঁর অবশ্য কর্তব্য। তিনি চোরেদের সাজা দিতেন, তা কোনো দোষের কথা নয়। মাতা তাঁর প্রিয় সন্তানকে শিক্ষা দেবার জন্য কখনও ধমক দেন, প্রয়োজন হলে তার মঙ্গলের জন্য দুই একটি চড়-থাপ্পড়ও মারেন, কিন্তু এইসব কাজে তাঁর দয়া পূর্ণরূপেই থাকে। তেমনই দয়ানিধি ন্যায়পরায়ণ ভগবানের দণ্ডবিধানও দয়া যুক্ত হয়ে থাকে। ধর্মানুকূল কামও ভগবান। ভগবান বলেছেন—

'ধর্মাবিরুদ্ধ ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥' (গীতা ৭।১১)

আমি ধর্মযুক্ত কাম, কিন্তু পাপযুক্ত নয়। ভগবান সৎ, সাত্ত্বিক এবং শুদ্ধ, সত্ত্ব। তিনি মায়ার শুদ্ধ-সত্ত্ব বিদ্যা দ্বারা সম্পন্ন। জীব অবিদ্যাসম্পন্ন। বিদ্যায় জ্ঞান ও প্রকাশ থাকে, সেখানে অবগুণ ও অন্ধকার কী করে থাকবে ? অবগুণ থাকে অবিদ্যায়। ভগবান এই ন্যায়ের দ্বারাই সদ্‌গুণসম্পন্ন।

ওপরে আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে পরমাত্মা গুণাতীত, গুণাগুণযুক্ত এবং শুধুমাত্র সদ্‌গুণসম্পন্ন।

ভগবানের স্বরূপ এবং নিরাকার-সাকারের ঐক্য

শরীরের তিনটি ভাগ—স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ। যা দেখা যায় তা হল স্থূল, মৃত্যুর পর যা সঙ্গে যায়, তাকে বলে সূক্ষ্ম এবং যা মায়াতে লয় হয় সেটি হল কারণ। শরীরের এই তিনটি ভাগ নিত্যই দেখা যায়। জেগে থাকলে স্থূল শরীর কাজ করে, স্বপ্নে সূক্ষ্ম শরীর এবং সুষুপ্তিতে কারণ শরীর থাকে। এইভাবে পরমাত্মার তিন স্বরূপের কথা বলা হয়। মহাপ্রলয়ে থাকে পরমাত্মার কারণ স্বরূপ, সমগ্রে বিশ্ব তাতে লয় হয়ে যায়, সেইসময় তখন শুধু পরমেশ্বর এবং

তাঁর প্রকৃতি থাকে। সমস্ত জীব প্রকৃতির মধ্যে লয় হয়ে যায়। জীবের মধ্যেই প্রকৃতি-পুরুষ দুই এর অংশ থাকে। চৈতন্য পরমাত্মার অংশ এবং অজ্ঞান প্রকৃতির। মায়ার উপাধির জন্য মহাপ্রলয়েও জীব মুক্ত হয় না। এরপর সৃষ্টির আদিতে আবার ঘুম থেকে ওঠার মতো জীব তাদের নিজ নিজ কর্মফল অনুসারে নানা রূপে জেগে ওঠে। তাই মহাপ্রলয়ে পরমাত্মার রূপকে কারণ বলা যেতে পারে।

পরমাত্মার সূক্ষ্মরূপ সর্বত্র বিরাজমান, এঁরই নাম আদিপুরুষ, সৃষ্টির আদিকারণও তিনিই, এঁরই নাম পুরুষোত্তম, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর।

পরমাত্মা স্থূলরূপে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান বিষ্ণু, যিনি সদা নিত্যধামে বিরাজমান।

ভক্তের ভাবনা অনুসারে ভগবান সৃষ্ট হন। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরমাত্মার শরীর, তার মধ্যেই আমাদের শরীর রয়েছে, এইভাবে দেখলে আমরা সকলেই পরমাত্মার উদরে রয়েছি।

আরও একটি তত্ত্বের বিষয় বুঝতে হবে। যখন আকাশ নির্মল হয়, সূর্য উদিত হন, তখন সূর্য এবং নিজের মধ্যস্থলে আকাশে আর কোনো বস্তু দেখা যায় না, কিন্তু সেখানে জল থাকে। একথা মানতেই হবে যে সূর্য এবং নিজের মধ্যে জল থাকে, কিন্তু তা নজরে পড়ে না ; কারণ তা সূক্ষ্ম এবং জলীয় পরমাণুরূপে থাকে। যখন তা ঘন হয়, তখন ক্রমশঃ তার রূপ স্থূল হয়ে ব্যক্ত হতে থাকে। সূর্যদেবের তাপে জলীয় বাষ্প তৈরি হয়, সেই বাষ্প ঘন হয়ে মেঘের সৃষ্টি হয় ও তাতে জলের সঞ্চার হয়। জলের মেঘ পাহাড়ের ওপরে চলে যায়, সেই সময় কেউ যদি সেই পাহাড়ে যায়, তাহলে বৃষ্টি না হলেও তার কাপড় ভিজে যায়। মেঘে জলের ঘনত্ব বৃদ্ধি হলে তা বিন্দু হয়ে ওঠে এবং আরও ঘন হলে বরফ হয়ে ঝরতে থাকে। পরে সেই বরফ গরম হাওয়ায় গলে গিয়ে জল হয়ে যায়। পরে আরও গরম হলে তা আবার বাষ্প হয়ে যায়, সেই বাষ্প আকাশে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং শেষকালে জল আবার সেই পরমাণু অব্যক্তরূপে পরিণত হয়। এই পরমাণুরূপে অবস্থিত জলকে—অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরমাণুকে সহস্রগুণ স্থূলরূপে দেখানো যন্ত্র দ্বারা কেউ দেখতে পায় না।

কিন্তু জল অবশ্যই থাকে, না যদি থাকে তবে কোথা থেকে আসে ?

এই দৃষ্টান্ত অনুসারে পরমাত্মার স্বরূপ বুঝতে হবে। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ॥
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর॥

(অধ্যায় ৮। শ্লোক ৩-৪)

অর্জুনের সাতটি প্রশ্নের মধ্যে ছটি প্রশ্ন এই ছিল যে ব্রহ্ম কী, অধ্যাত্ম কী, কর্ম কী, অধিভূত কী, অধিদৈব কী এবং অধিযজ্ঞ কী ? ভগবান উপরোক্ত শ্লোকে এই উত্তর দিয়েছেন যে, অক্ষর ব্রহ্ম, স্বভাব অধ্যাত্ম, শাস্ত্রোক্ত ত্যাগ কর্ম, বিনাশশীল পদার্থ অধিভূত, সমষ্টি প্রাণরূপে হিরণ্যগর্ভ দ্বিতীয় পুরুষ অধিদৈব এবং নিরাকার ব্যাপক বিষ্ণুরূপে আমি অধিযজ্ঞ।

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তদ্বারা এর ব্যাখ্যা এইভাবে বোঝা যেতে পারে।

১) পরমাণুরূপ জলের স্থানে—

শুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন গুণাতীত পরমাত্মা, যাঁতে এই জগৎ কখনও ছিল না এবং না কখনও আছে, যিনি কেবল অতীত, পরম, অক্ষর।

২) বাষ্পরূপ জল—

তিনিই শুদ্ধ ব্রহ্ম অধিযজ্ঞ নিরাকাররূপে ব্যাপ্ত থাকা মায়াবিশিষ্ট ঈশ্বর।

৩) মেঘ—

অধিদৈব—সবকার প্রাণাধার হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা। সতেরো তত্ত্ব সমূহকে সূক্ষ্ম বলা হয়, এর মধ্যে প্রাণ প্রধান। সকলের প্রাণ মিলে সমষ্টিপ্রাণ হয়ে যায়, এই সমষ্টিপ্রাণ প্রলয়েও থাকে, মহাপ্রলয়ে নয়। এই সতেরো তত্ত্বসমূহ হল হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মের সূক্ষ্ম শরীর।

৪) জলের লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি বিন্দু—

জগতের সমস্ত জীব।

৫) বর্ষা—

জীবসমূহের ক্রিয়া।

৬) জলের বরফ অথবা শীল—

পঞ্চভূতাদির অত্যন্ত স্থূল সৃষ্টি।

এই সৃষ্টির স্বরূপ এতো স্থূল ও বিনাশশীল যে সামান্য তাপ লাগতেই কিছুক্ষণের মধ্যে বরফ গলে জল হওয়ার মতো তৎক্ষণাৎ গলে যায়। এখানে তাপ জ্ঞানাগ্নিরূপ সেই প্রকাশ, যা উদ্ভূত হতেই স্থূল-সৃষ্টিরূপ বরফ শীঘ্রই গলে যায়।

অজ্ঞান হল সর্দী। যতো অজ্ঞতা থাকে, ততোই স্থূলতা হয় এবং যতো জ্ঞান হয় ততোই সূক্ষ্মতা হয়। যে পদার্থ যতো ভারী হয়, তা ততোই নীচে পড়ে যায়, যত হালকা হয় ততোই ওপরে ওঠে। অজ্ঞতাই হল বোঝা, জল অত্যন্ত স্থূল হলে যখন বরফ হয়ে যায়, তখনি তাকে নীচে পড়তে হয়, এইরূপ অজ্ঞতার বোঝা স্থূল হয়ে গেলে জীবকে নীচে পড়তে হয়।

জ্ঞানরূপ তাপ প্রাপ্ত হলেই জগৎ সংসারের বোঝা নেমে যায় এবং যেমন তাপের দ্বারা গলে জল হয়ে আরও তাপ প্রাপ্ত হলে সেই জল বাষ্প হয়ে ওপরে জমা হয়, তেমনভাবে জীবও ওপরে উঠে যায়।

জীবাত্মা হল ঈশ্বরের সাক্ষাৎ স্বরূপ, কিন্তু জড়ত্ব ও অজ্ঞতার জন্য যখন সে স্থূল হয়ে যায়, তখনই তার পতন হয়। অজ্ঞানই অধঃপতনের কারণ আর জ্ঞান হল উত্থানের কারণ। জীবাত্মা একবার শেষ সীমায় পৌঁছালে আর তার পতন হয় না। তার জ্ঞানে সবকিছুই পরমেশ্বর হয়ে ওঠেন। বাস্তবে তত্ত্বতঃ উভয়ে একই। জলের পরমাণু, বাষ্প, মেঘ, জলবিন্দু, বরফ সবই তো জলই।

এই বিচারে সকল বস্তুই এক পরমাত্মতত্ত্ব, তাই ভগবান ইচ্ছা করলে যখন, যেখানে ইচ্ছা, যে কোনো রূপে প্রকট হতে পারেন। এই বিষয়ে জ্ঞান হলে সাধক সব জায়গাতেই ঈশ্বর দেখে থাকেন। জল তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হলে সর্বত্র জলই দেখা যায়, সেই পরমাণুতে, বরফে, অত্যন্ত সূক্ষ্মতেও সেই আবার অত্যন্ত স্থূলতেও সেই। এইভাবে সূক্ষ্ম এবং স্থূলে সেই একই পরমাত্মা

অবস্থিত। **'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'** এই হল নিরাকার ও সাকারের ঐক্যরূপ।

অজ্ঞানের দ্বারা অহঙ্কার বৃদ্ধি পায়। অহঙ্কার যতো বেশি হয় ততোই সেই ব্যক্তি সাংসারিক বস্তু বেশি গ্রহণ করে। সাংসারিক বোঝা যতো অধিক হবে ততোই সে নীচে নামবে। গুণ তিনপ্রকার, তার মধ্যে তমোগুণ সব থেকে ভারী, তাই তমোগুণী পুরুষ নীচে যায়। রজোগুণ সমান, তাই রজোগুণী পুরুষ মধ্যে মনুষ্যাদি থাকে। সত্ত্বগুণ হাল্কা, তাই সত্ত্বগুণী পুরুষ পরমাত্মার দিকে ওপরে ওঠে—

'উর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ'
'মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ'
'অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ'

হালকা বস্তু ওপরে ভেসে থাকে, ভারী ডুবে যায়। আসুরী সম্পদ তমোগুণের স্বরূপ, তাই এটি নীচে নিয়ে যায়, সত্ত্বগুণ হালকা হওয়ায় ওপরে ভেসে ওঠে। সত্ত্বগুণ হল দৈবী সম্পদ, এটিই হল ঈশ্বরের সম্পদ। এই সম্পদ যেমনই বৃদ্ধি পায়, তেমনই সাধকের ঊর্ধ্বগতি হতে থাকে, অর্থাৎ সাধক ঈশ্বরের সমীপে পৌঁছান।

এইরূপ স্থূল ও সূক্ষ্মতে সেই একই পরমাত্মাকে ব্যাপক বলে বুঝতে হবে।

পরমাত্মা ব্যাপকরূপে সবকিছু দেখেন ও জানেন।

সর্বতঃপাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

(গীতা অধ্যায় ১৩, শ্লোক ২৩)

সেই জ্ঞেয় কেমন ? সর্বদিকে হস্ত-পদসম্পন্ন, সর্বত্র নেত্র, মস্তক ও মুখ-কান বিশিষ্ট। এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে তিনি নেই, এমন কোনো শব্দ নেই যা তিনি শুনতে পান না, এমন কোনো দৃশ্য নেই, যা তিনি দেখতে পান না, এমন কোনো বস্তু নেই যা তিনি গ্রহণ করতে পারেন না এবং এমন কোনো স্থান নেই যেখানে তিনি পৌঁছতে পারেন না।

আমরা এখানে প্রসাদ উৎসর্গ করলে তিনি তৎক্ষণাৎ তা গ্রহণ করেন। আমরা এখানে তাঁর অর্চনা-স্তুতি করলে, তিনি তা শুনতে পান। আমাদের প্রত্যেক কাজ তিনি দেখতে পান, কিন্তু আমরা তাঁকে দেখতে পাই না। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, একই পুরুষের সর্বত্র সর্ব ইন্দ্রিয় কীভাবে থাকা সম্ভব ? চোখ যেখানে, সেখানে নাক কীভাবে থাকা সম্ভব ? এর উত্তরে একথা বলা যায় যে সেকথা ঠিক, কিন্তু পরমাত্মা অত্যন্ত বিশিষ্ট। তিনি এক অলৌকিক শক্তি, তাঁর দ্বারা সবকিছুই সম্ভব। মনে করুন, এক স্বর্ণ পিণ্ড, তাতে কণ্ঠহার, বাজুবন্দ ইত্যাদি সব গহনাই হয়। যেখানে ইচ্ছা হয় সেখান থেকে সব বস্তু পাওয়া যেতে পারে, তেমনি তিনি এমনই বস্তু যাঁতে সর্বত্র সববস্তু ব্যাপকভাবে থাকে, সবকিছুই তাঁর থেকে বার হতে পারে। তিনি সর্বস্থানের এবং সকল কথা একসঙ্গে শুনতে পারেন এবং সকলকে একসঙ্গে দেখতে পারেন।

স্বপ্নে চোখ, কান, নাক ইত্যাদি না থাকলেও অন্তঃকরণ নিজেই সকল কাজ করে এবং নিজেই তা দেখতে ও শুনতে পান। দ্রষ্টা, দর্শন এবং দৃশ্য সবই হয়ে যান, সেইরূপই ঈশ্বরীয় শক্তিও অত্যন্ত বিশিষ্ট, তা সর্বত্র সবকিছু করতে সর্বতোভাবে সক্ষম। এই হল তাঁর ঈশ্বরত্ব ও বিরাট স্বরূপ।

সাকাররূপ সেই পরমেশ্বরের সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তাঁর শরীর, যেমন বরফ জলের শরীর কিন্তু তার থেকে আলাদা নয়। সংসারও কী বস্তুতঃ তেমনই। শরীরও কী পরমাত্মা ?

এর উত্তরে বলা যায় হ্যাঁ এবং না। এই শরীরের কেউ সেবা করলে বা আরাম দিলে, তখন আমরা তাকে নিজের সেবা ও নিজের আরাম বলে মনে করি, কিন্তু আমি শরীর নই, আমি আত্মা। কিন্তু যতক্ষণ আমি এই সাড়ে তিনহাতের দেহকে 'আমি' বলে মেনে নিই, ততক্ষণ সেটি আমি। **এই অবস্থিতিতে চরাচর ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর, সকলকে তাঁর সেবা করতে হবে, চরাচর সকলের সেবা করাই হল ঈশ্বরের সেবা করা, জগৎ সংসারকে সুখী করাই হল পরমাত্মাকে সুখী করা** আর যখন আমি এই শরীর নয়, তখন এই ব্রহ্মাণ্ডরূপী শরীরও ঈশ্বর নন। এটি যখন আমার শরীর, তখনই এটি তাঁর শরীর। আমরা সকলে তাঁর অংশ, তিনি তো অংশী। বাস্তবে শেষকালে

আমরা আত্মা বলেই বিবেচিত হই, শরীর নয়। কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততক্ষণ এইভাবেই চলা উচিত। প্রকৃত জ্ঞান হলে একমাত্র শুদ্ধ ব্রহ্মই থেকে যাবেন।

এই বিচারে নিরাকার-সাকার সবই এক বস্তু। জগৎ পরমেশ্বরে অধ্যাপিত। মহাত্মাগণ এমনই বলে থাকেন, যেমন রজ্জুতে সর্প প্রতীতিমাত্র, বাস্তবে তা নয়। স্বপ্নের জগৎ নিজের মধ্যে প্রতীতিমাত্র হয়ে থাকে, মৃগতৃষ্ণার জল বা আকাশে শিশিরবিন্দু যেমন প্রতীত হয়, তেমনই পরমাত্মাতে জগৎ-সংসার প্রতীত হয়, মহাত্মাগণই এই বিষয় জানেন। ঘুমন্ত ব্যক্তি জেগে উঠলেই স্বপ্নের জগতের অসারতার প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন। যতক্ষণ এই বিষয় জানা না যায় ততক্ষণ উপায় করতে হবে। এই উপায় হল—

নিরাকার ও সাকার যে কোনো রূপের ধ্যান করলে যে একটি পরম বস্তু উপলব্ধ হয়, সর্বপ্রকারে সেই পরমেশ্বরের শরণাগত হয়ে ইন্দ্রিয় ও শরীর দ্বারা তাঁর সেবা করা, মন দিয়ে তাঁকে স্মরণ করা, শ্বাসের দ্বারা তাঁর নামোচ্চারণ করা, কান দিয়ে তাঁর প্রভাব শোনা এবং শরীর দ্বারা তাঁর ইচ্ছানুসারে চলা—এই হল তাঁর সেবা, এই হল প্রকৃত ভক্তি এবং এর দ্বারা শীঘ্রই আত্মার কল্যাণ লাভ করা সম্ভব।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

~~○~~

(২১) উপাসনার তত্ত্ব

শাস্ত্র এবং মহাত্মাগণের অনুভব দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয় যে সাকার ও নিরাকার দুই প্রকার উপাসকগণই পরমগতি প্রাপ্ত হতে পারেন। সাকারের উপাসক সগুণ ভগবানের দর্শনও লাভ করতে পারেন, নিরাকারের উপাসকের সেই ইচ্ছা না থাকায় তা হয় না। সাকার ঈশ্বরের উপাসনা ঈশ্বরের প্রভাব বুঝে করায় তাতে সাফল্য শীঘ্র আসে। সাকার ঈশ্বরের প্রভাব বোঝার তাৎপর্য হল

যে সাধক সেই ঈশ্বরকেই সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান বলে ভাবেন। যে শিব বা বিষ্ণুরূপের তিনি উপাসনা করেন তাতে তিনি যেন একথা মনে না করেন যে আমার ইষ্টদেব ঈশ্বর শুধু এই মূর্তিতেই অবস্থিত, অন্য কোথাও নেই। ঈশ্বরে এইরূপ পরিমিত বুদ্ধি হল একপ্রকার তামস জ্ঞান। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ২২তম শ্লোকে এর নিন্দা করা হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে মূর্তিপূজা করা উচিত নয় অথবা কোনো ব্যক্তি সরলভাবে তত্ত্ব না বুঝে কেবলমাত্র মূর্তিতে ঈশ্বর মনে করে তার উপাসনা করবেন না। কোনো প্রকারে উপাসনা আরম্ভ করা একেবারে উপাসনা না করার চেয়ে উত্তম, কিন্তু এই জ্ঞান অল্প হওয়ায় এর দ্বারা করা উপাসনার ফল বহু পরে পাওয়া যায়। অল্পজ্ঞানের উপাসনায় যদি কোনো ক্ষতি হয়, তাহল এর সাফল্যে বিলম্ব হওয়া ; কারণ এতে উপাসক উপাস্যের গুরুত্ব কম করে দেখে।

কোনো অগ্নির উপাসক যজ্ঞের জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত করে যদি মনে করেন যে, শুধু এতটুকু জায়গায় অগ্নি আছে, অন্য কোথাও নেই, তাহলে তিনি অগ্নির মহত্ত্ব কম করে ফেলেন, তিনি এক ব্যাপক বস্তুকে ছোট্ট সীমায় আবদ্ধ রাখেন। অপরদিকে যে উপাসক মনে করেন যে অগ্নি বাস্তবে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, কিন্তু অব্যক্ত হওয়ায় তা সর্বত্র পরিলক্ষিত হয় না। প্রকটিত হলেই দেখা যায় এবং অল্প আয়াসেই তা প্রকট করা যায়। যদি তা না হোত, তাহলে এটি যেকোনো স্থানে কোনো বস্তুতে কীভাবে প্রকটিত হোত ? যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি যজ্ঞকুণ্ডে দেখা গেলেও এটি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তেমনই ভগবানও নিরাকাররূপে সর্বত্র সমভাবে বিরাজিত। ভক্তের প্রেমে সাকাররূপে প্রত্যক্ষ হন। নিরাকারই সাকার এবং সাকারই নিরাকার। এই ভাবে জানাই হল সাকারের প্রভাব জানা। প্রকৃতপক্ষে অগ্নির সঙ্গে ঈশ্বরকে তুলনা করা উচিত নয়। এ শুধুমাত্র একটি দৃষ্টান্ত, কারণ অগ্নি পরমাত্মার মতো সর্বব্যাপী নয়। একটিমাত্র স্থানে পাঁচবস্তু সর্বব্যাপী হতে পারে না। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু সব নিজ নিজ রূপে অবস্থিত। পৃথিবীর প্রধান গুণ গন্ধ, অগ্নির রূপ, সর্বব্যাপী পরমাত্মা তো কারণেরও মহাকারণ, তাই তিনি সর্বত্র অধিষ্ঠিত। কার্য কখনও সর্বব্যাপী হয় না, ব্যাপক কারণ হয়। জগতের কারণ প্রকৃতি, কিন্তু পরমাত্মা

তারও কারণ হওয়ায় মহাকারণ। প্রকৃতি জড় হওয়ায় নিজের জড়কার্যের কারণ হতে পারে, কিন্তু তা চৈতন্য পরমাত্মার কারণ হতে পারে না। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু সব নিজ নিজ রূপে অবস্থিত। পৃথিবীর প্রধান গুণ গন্ধ, অগ্নির রূপ, সর্বব্যাপী পরমাত্মা তো কারণেরও মহাকারণ, তাই তিনি সর্বত্র অধিষ্ঠিত। কার্য কখনও সর্বব্যাপী হয় না, ব্যাপক কারণ হয়। জগতের কারণ প্রকৃতি, কিন্তু পরমাত্মা তারও কারণ হওয়ায় মহাকারণ। প্রকৃতি জড় হওয়ায় নিজের জড়কার্যের কারণ হতে পারে, কিন্তু তা চৈতন্য পরমাত্মার কারণ হতে পারে না। সুতরাং পরমাত্মাই সকলের মহাকারণ, তিনিই জড়-চেতন সর্বত্র সর্বদা পূর্ণরূপে অবস্থিত। সবকিছুর বিনাশ হলেও, তাঁর বিনাশ হয় না। তিনি নিত্য, অনাদি।

নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপ সৎ, বিজ্ঞান, অনন্ত, আনন্দঘন। তাকেই 'সৎ' বলা হয় যার কখনও অভাব বা পরিবর্তন হয় না, যাতে কখনও কোনো বিকার থাকে না এবং যা সর্বদা একরূপে থাকে। 'বিজ্ঞান' দ্বারা বোধ, চেতন, শুদ্ধ, জ্ঞান বুঝতে হবে। 'অনন্ত' তাকে বলা হয়, যার কোনো সীমা নেই, কোনো মাপ নেই, যার আদি-অন্ত নেই, যা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম এবং মহান থেকেও মহান, সমস্ত জগৎ যার একাংশে স্থিত। 'আনন্দঘন' কথার দ্বারা শুধু আনন্দই বুঝতে হবে, 'ঘন' কথাটির অর্থ হল এই যে তাতে আনন্দের থেকে ভিন্ন অন্য কোনো বস্তুর কোনোপ্রকার স্থান নেই, যেমন বরফে জল ঘন, তেমনই পরমাত্মা আনন্দঘন। বরফ হল সাকার জড় ও কঠিন, কিন্তু পরমাত্মা চেতন, জ্ঞানস্বরূপ, নিরাকার। এইরূপ নিরাকার পরমাত্মা সর্বত্র পরিপূর্ণ রয়েছেন।

পরমাত্মার আনন্দরূপের বর্ণনা করা সম্ভব নয়, তা অনির্বচনীয়। যদি আপনি কোনো সময়ে, কোনো কারণে মহাআনন্দ প্রাপ্ত হন, তখন তাঁকে স্মরণ করবেন। তার থেকে বড় আনন্দ হল তাই যা বিশুদ্ধ মনে করা সৎসঙ্গ, ভজন ও ধ্যানের দ্বারা উৎপন্ন হয়, যার বর্ণনা গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৩৬, ৩৭ শ্লোকে করা হয়েছে। এই সুখের কাছে ভোগসুখ সূর্যের সামনে জোনাকীর মতও নয়। কিন্তু এই সুখও সেই পরম আনন্দরূপ ব্রহ্মেরই এক অণু, কারণ ব্রহ্মানন্দ ব্যতীত অন্য কিছুই আনন্দঘন নয়। অন্য যা কিছু রয়েছে সবেরই সীমা আছে, তাতে অন্যের সুযোগ থাকে।

এই আনন্দরূপ পরমাত্মা সবেতে বিস্তারিত। এই পরমাত্মাতে জগৎ সেভাবেই অবস্থিত, যেভাবে দর্পণে প্রতিবিম্ব। বাস্তবে নেই, তার মধ্যে প্রতিফলিত বলে মনে হয়। দর্পণ তো জড় এবং কঠিন, কিন্তু পরমাত্মা পরম সুখরূপ হয়েও চেতন এবং এমন ঘনরূপে ব্যাপ্ত যে এঁকে অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। এর ঘনত্ব কোনো পাথর, শিলা, বরফ ইত্যাদির মতো নয়, এগুলিতে অন্য কোনো পদার্থের অবকাশ থাকলেও পরমাত্মায় কোনো কিছুর অবকাশ থাকে না। যেমন শরীরে 'আমি' (আত্মা) এতো সূক্ষ্ম ঘন যে তার মধ্যে অন্যের কখনও কোনো স্থান হয় না। শরীর, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির মধ্যে কোনো দ্বিতীয় কিছু প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু আত্মায় কারো কোনোভাবে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। এইরূপ এই সর্বব্যাপী নিরাকার পরমাত্মাও ঘন।

তাঁর চৈতন্যও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই শরীরের সমস্ত বস্তুই জড়, একে জানেন যিনি, তিনি চেতন। যে পদার্থকে কোনো কিছুর দ্বারা জানা যায়, তা হল জড়, দৃশ্য, সে আত্মাকে জানতে পারে না, হাত-পা আত্মাকে জানে না, কিন্তু আত্মা তাদের জানেন। তিনি সকলকে জানেন, জ্ঞানই তাঁর স্বরূপ, সেই জ্ঞানই পরমেশ্বর, যিনি সর্বত্র বিরাজিত। এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে তিনি নেই, তাই শ্রুতি তাঁকে বলেন—'**সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম**।'

এই ব্রহ্মই ভক্তদের প্রেমপরবশ হয়ে তাঁদের উদ্ধারের জন্য সাকাররূপে প্রকট হয়ে তাঁদের দর্শন দেন। তাঁর সাকাররূপে বর্ণনা করা মানুষের বুদ্ধির অতীত। কারণ তিনি অনন্ত। ভক্ত তাঁকে যেরূপে দেখতে চান, তিনি সেই রূপেই প্রকটিত হয়ে তাঁকে দর্শন দেন। ভগবানের সাকাররূপ ধারণ করা ভগবানের অধীন নয়, কিন্তু তা প্রেমিক ভক্তের অধীন। অর্জুন প্রথমে বিশ্বরূপ দর্শন করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন, পরে চতুর্ভুজের এবং তারপর দ্বিভুজের। ভক্তপ্রেমিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ইচ্ছানুযায়ী অল্প সময়ের মধ্যেই তিনরূপে দর্শন দান করেন এবং তাঁকে নিরাকারের ভাবও ভালোভাবে বুঝিয়ে দেন। এইরূপ পরমাত্মার যে ভক্ত তাঁকে যে রূপে উপাসনা করেন, তিনি সেই রূপেই ভগবানের দর্শন পেতে পারেন।

সুতরাং উপাসনার স্বরূপ পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। ভগবান বিষ্ণু,

রাম, কৃষ্ণ, শিব, নৃসিংহ, দেবী, গণেশ ইত্যাদি যাঁরই উপাসনা করা হোক, সব তাঁরই হয়। ভজনে কোনো কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। শুধু পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, যদি পরমাত্মাতে অল্পবুদ্ধি থাকে, তবে তারা ভক্তের নিজ ইষ্টদেবের উপাসনার সময় সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, আমি যে পরমাত্মার উপাসনা করছি, সেই পরমাত্মা নিরাকাররূপে চরাচরে সর্বত্র ব্যাপক ভাবে অবস্থিত, তিনি সর্বজ্ঞ, সবই তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বগুণসম্পন্ন, সর্বসমর্থ, সর্বসাক্ষী, সৎ-চিৎ, আনন্দঘন, আমার ইষ্টদেব পরমাত্মাই নিজ লীলায় ভক্তকে উদ্ধারের জন্য তাঁর ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন স্বরূপ ধারণ করে নানাপ্রকার লীলা করেন। এইভাবে তত্ত্বতঃ জানা ব্যক্তির কাছে পরমাত্মা কখনও অদৃশ্য হন না এবং সেই ভক্তও কখনও পরমাত্মার কাছে অদৃশ্য হন না।

শ্রীভগবান স্বয়ং বলছেন—

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

(গীতা অধ্যায় ৬, শ্লোক ৩০)

'যে ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীতে সবার আত্মারূপে বাসুদেব আমাকে ব্যাপকভাবে দেখেন এবং সমস্ত প্রাণীকে আমি বাসুদেবের অন্তর্গত দেখেন, তাঁর কাছে আমি কখনও অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার কাছে অদৃশ্য হন না ; কারণ তিনি একীভাবে আমাতেই স্থিত।' নিরাকার ও সাকারে কোনো পার্থক্য নেই, যে ভগবান নিরাকার তিনিই সাকার রূপ ধারণ করেন।

ভগবান বলেন—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

(গীতা অধ্যায় ৪, শ্লোক ৬)

'আমি অবিনাশীস্বরূপ অজ এবং সর্বভূতপ্রাণীদের ঈশ্বর হয়েও নিজ প্রকৃতিকে অধীন করে যোগমায়াদ্বারা প্রকটিত হই।' কেন প্রকটিত হন ? ভগবান নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

(গীতা অধ্যায় ৪, শ্লোক ৭-৮)

'হে ভারত ! যখন যখনই ধর্মের হানি ও অধর্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখন তখনই আমি নিজ রূপে প্রকটিত হই। সাধু ব্যক্তিদের উদ্ধার এবং দুষ্কর্মকারীদের বিনাশ ও ধর্মস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে প্রকটিত হয়ে থাকি।'

অবিনাশী নির্বিকার পরমাত্মা এইভাবে জগতের উদ্ধারের জন্য ভক্তদের প্রেমবশতঃ নিজ ইচ্ছায় অবতীর্ণ হন। তিনি প্রেমের সাগর, তাঁর প্রতিটি ক্রিয়া প্রেম ও দয়ায় পরিপূর্ণ। তিনি যাকে সংহার করেন তাকেও উদ্ধারই করেন। তাঁর সংহার কর্মও পরম প্রেমেরই উপহার, কিন্তু অজ্ঞ জগৎ তাঁর দিব্য জন্ম-কর্মের লীলারহস্য ঠিকমতো না জেনে নানাপ্রকার সন্দেহ করে থাকে। ভগবান বলেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥

(গীতা অধ্যায় ৪, শ্লোক ৯)

'হে অর্জুন ! যেসব পুরুষ আমার জন্ম ও কর্ম দিব্য বলে জানেন, তাঁরা দেহত্যাগ করে পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করেন না, তাঁরা আমাকে প্রাপ্ত হন।'

সর্বশক্তিমান সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা অজ, অবিনাশী এবং সর্বভূতের পরমগতি ও পরম আশ্রয়, তিনি শুধুমাত্র ধর্মস্থাপন ও জগৎ উদ্ধারের জন্যই নিজ যোগমায়ার সাহায্যে সগুণরূপে আবির্ভূত হন। সুতরাং সেই পরমেশ্বরের মতো সুহৃদ্, প্রেমিক ও পতিতপাবন আর কেউ নেই, একথা জেনে যে ব্যক্তি তাঁকে অনন্য প্রেমে চিন্তা করেন, আসক্তিরহিত হয়ে জগতে বিচরণ করেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে তাঁকে জানেন। এরূপ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষকে এই দুঃখরূপ জগৎ-সংসারে আর কখনই ফিরে আসতে হয় না।

ভগবানের জন্ম-কর্ম কীরূপ দিব্য—যিনি এই তত্ত্ব বুঝে যান, তিনিই প্রকৃত

ভাগ্যবান পুরুষ। উজ্জ্বল, প্রকাশসম্পন্ন, বিশুদ্ধ, অলৌকিক ইত্যাদি শব্দ দিব্যের পর্যায়বাচী। ভগবানের জন্ম-কর্মে এই সবই সংঘটিত হয়। তাঁর কর্ম জগতে বিস্তৃত হয়ে সকলের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে, কর্মের কীর্তি ব্রহ্মাণ্ডে ছেয়ে যায়, যাঁরা তাঁর স্মরণ কীর্তন করেন তাঁদের হৃদয়ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাই তাঁরা উজ্জ্বল। তাঁর লীলা যত অধিক বিস্তারলাভ করে, ততই অন্ধকারের বিনাশ হয়। যেখানে সর্বদা হরি-লীলা-কথা-কীর্তন হয়, সেখানে জ্ঞান-সূর্য প্রকাশিত হয় এবং পাপ-তাপরূপ অন্ধকার নাশ হয়, তাইজন্য তিনি প্রকাশময়। তাঁর কর্মে কোনোপ্রকার স্বার্থ বা তাঁর নিজের কোনো প্রয়োজন নেই, কোনো কামনা নেই, পাপের লেশমাত্র নেই, মলবর্জিত, তাই তিনি শুদ্ধ। তাঁর মতো কর্ম জগতে কেউ করতে পারে না, ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদিও তাঁর কর্ম দেখে মোহমুগ্ধ হয়ে যান। জগতের লোক যা কল্পনাও করতে পারেন না, যা একেবারেই অসম্ভব, তিনি সেসবও সম্ভব করে দেন। অঘটন ঘটিয়ে দেন। জীবন্মুক্ত বা কারকপুরুষ, সকলের থেকে তিনি অদ্ভুত তাই তিনি অলৌকিক। তাঁর অবতার সর্বতোভাবে শুদ্ধ। নিজ লীলার দ্বারাই তিনি প্রকটিত হন। প্রেমরূপ হয়েই তিনি সগুণরূপে প্রকাশিত হন। প্রেমই তাঁর মহিমাপূর্ণ মূরতি, তাই প্রেমিক পুরুষই তাঁকে জানতে পারেন। এই তত্ত্ব বুঝে যিনি প্রেমের সঙ্গে তাঁর উপাসনা করেন, সেই ভাগ্যবান পুরুষ অতি শীঘ্রই সেই প্রেমময়ের প্রেমপূর্ণ চরণকমল দর্শন করে কৃতার্থ হন। সুতরাং কায়মনোবুদ্ধিআত্মা—সবই তাঁর চারু চরণে সমর্পণ করে দিন-রাত তাঁরই চিন্তায় ব্যাপৃত থাকতে হবে। তার প্রেমপূর্ণ আদেশ ও আশ্বাস স্মরণ করুন—

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ॥

(গীতা অধ্যায় ১২, শ্লোক ৮)

'আমাতে মন নিবিষ্ট করো, আমাতে বুদ্ধি সমর্পণ করো, এরূপ করলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে, এতে কিঞ্চিৎমাত্র সংশয় নেই।'

~~o~~

(২২) ঘরে ঘরে ভগবানের আরাধনা

ভগবান কখনও সাকাররূপে প্রকটিত হয়ে আমাকে দর্শন দান করেছেন, একথা বলতে অসমর্থ হলেও আমি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এই বিশ্বাস দিতে পারি যে যদি কোনো ব্যক্তি ভগবদ্‌পরায়ণ হয়ে নিষ্কাম প্রেমে ভগবানে ভক্তি করেন, তবে ভগবান অবশ্যই তাঁকে সাক্ষাৎ দর্শন দান করবেন। ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥

(গীতা অধ্যায় ১১, শ্লোক ৫৪)

'হে অর্জুন ! অনন্য ভক্তিদ্বারা (ভক্ত) এইভাবে আমার সাকাররূপে প্রত্যক্ষ দর্শন, তত্ত্বতঃ জানা ও প্রবেশ অর্থাৎ অভেদভাবে প্রাপ্ত হতে সমর্থ হয়।'

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে অনন্য ভক্তির সাহায্যে ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ সম্ভব। অনন্য ভক্তির জন্য অভ্যাসের প্রয়োজন। যদি সবসময় ভগবানের নামজপ ও হৃদয়ে তাঁকে স্মরণ করতে করতে সংসারের সব কাজ তাঁর নিমিত্তে করা যায় তাহলে পরমাত্মাতে অনন্য ভক্তি হয়। অনন্য ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি স্বয়ং পবিত্র হন, তাতে আর বলার কী আছে, তিনি তাঁর নিজ ভক্তিভাবে জগৎকে পবিত্র করতে সক্ষম। গৃহে যদি একজন ব্যক্তিও অনন্য ভক্তির সাহায্যে পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করেন, তাহলে তাঁর সমস্ত কুল পবিত্র হয়। বলা হয়—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপারসংবিৎসুখসাগরেঽস্মিঁল্লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥

(স্কন্দপুরাণ, মাহে. খ. কৌ. খ. ৫৫।১৪০)

'যাঁর চিত্ত সেই অপার বিজ্ঞানানন্দঘন সমুদ্ররূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে লীন হয়েছে, তাঁর দ্বারা কুল পবিত্র, মাতা কৃতার্থ এবং পৃথিবী পুণ্যবতী হয়ে যায়।'

ভগবান নারদ বলেছেন—

কণ্ঠাবরোধরোমাঞ্চাশ্রুভিঃ পরস্পরং লপমানাঃ পাবয়ন্তি কুলানি পৃথিবীং চ।

তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি সুকর্মীকুর্বন্তি কর্মাণি সচ্ছাস্ত্রীকুর্বন্তি শাস্ত্রাণি।

(নারদভক্তিসূত্র ৬৮-৬৯)

'এরূপ ভক্ত কণ্ঠাবরোধ, রোমাঞ্চিত এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে পরস্পর বার্তালাপ করতে করতে কুল এবং পৃথিবীকে পবিত্র করেন। তিনি তীর্থকে সুতীর্থ এবং কর্মকে সুকর্ম ও শাস্ত্রাদিকে সৎ-শাস্ত্র করে তোলেন, তাঁর ভক্তির আবেশে বায়ুমণ্ডল শুদ্ধ হয়, যার ফলে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছু পবিত্র হয়ে যায় এবং পৃথিবীতে এরূপ পুরুষ নিবাস করায় পৃথিবী পবিত্র হয়ে যায়। তিনি যে তীর্থে থাকেন, সেটিই সুতীর্থ, যে কর্ম করেন, তাই সৎকর্ম এবং যে শাস্ত্রের উপদেশ করেন, সেটিই সৎ-শাস্ত্র হয়ে যায়।'

মোদন্তে পিতরো নৃত্যন্তি দেবতাঃ সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি।

(নারদভক্তিসূত্র ৭১)

'এরূপ ভক্তদের প্রকটিত হতে দেখে তাঁদের পিতৃগণ নিজেদের উদ্ধারের আশায় আহ্লাদিত হন, দেবগণ তাঁদের দর্শন করে নৃত্য করেন এবং পৃথিবী নিজেকে সনাথ বলে মনে করেন।'

পদ্মপুরাণেও এইরূপ বচন আছে—

আস্ফোটয়ন্তি পিতরো নৃত্যন্তি চ পিতামহাঃ।
মদ্বংশে বৈষ্ণবো জাতঃ স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি॥

'পিতৃ-পিতামহেরা তাঁদের বংশ ভগবদ্‌ভক্ত প্রকটিত হয়েছে, সে আমাদের উদ্ধার করবে এরূপ জেনে প্রসন্ন হয়ে নৃত্য করতে থাকেন এবং এরূপ আরও প্রমাণ রয়েছে।' বাস্তবে এমন ব্যক্তির হৃদয় সাক্ষাৎ তীর্থ এবং তাঁর গৃহ তীর্থ হয়ে ওঠে। অতএব সকলের উচিত পরমাত্মার ভক্তির সাধনা করা। এই সাধনায় ভগবানের প্রতি চিন্তায় আত্মমগ্ন হতে হয় এবং নিজ সময় ভগবৎ-সেবায় ব্যাপৃত করার অভ্যাস করতে হয়। সেইজন্য প্রত্যেক গৃহে

ভগবানের মূর্তি বা ছবি—এমন মূর্তি বা ছবি যা নিজের ভালো লাগে এবং প্রত্যক্ষ নিয়ম করে যদি তাঁর পূজা করা হয় তাহলে সময় ও মন— দুই-ই পরমাত্মাতে ব্যাপৃত করার অভ্যাস অনায়াসে হতে পারে।

ভগবানের অনেক মন্দির আছে, মন্দিরে যাওয়া খুব ভালো। কিন্তু সব জায়গায় মন্দির থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, সকলে সেখানে গিয়ে ইচ্ছা অনুযায়ী নিজ হাতে পূজা-অর্চনা করতে পারেন না। তৃতীয়তঃ, সব মন্দিরের ব্যবস্থা এখন প্রায়শঃই ঠিক থাকে না। চতুর্থতঃ, গৃহে সব নারী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ নিয়মিত মন্দিরে যেতে পারেন না। কিন্তু গৃহে কোনো ধাতুর বা প্রস্তরের ভগবানের মূর্তি অথবা ছবি সবাই রাখতে পারেন এবং নিজ নিজ মতানুসারে বা প্রেম-ভক্তি অনুসারে বিধি অনুযায়ী নারী-পুরুষ তার পূজা করতে পারেন। গৃহে নিত্যপূজা হলে তারজন্য পূজার সামগ্রী একত্রিত করা, মালা গাঁথা ইত্যাদি নানা কাজে ভগবৎ চিন্তায় মন নিবিষ্ট থাকে। বালকেরাও এতে আনন্দ পায় এবং তারাও এর থেকে শিক্ষালাভ করে। এরফলে অল্প বয়স থেকেই তাদের মনে ভগবৎ-সম্বন্ধীয় সংস্কার পড়তে থাকে। বৃথা খেলাধুলা ছেড়ে তারা এই সৎকার্যে উৎসাহিত হতে থাকে। শিশুকালের এই সংস্কার পরে খুবই কাজ দেয়। ভক্তিমতী মীরাবাঈ ইত্যাদির এই শিশুবয়সের মূর্তিপূজার সংস্কার থেকেই পরে তাঁর জীবনে পূর্ণভক্তি বিকশিত হয়েছিল। যাঁরা নিজ গৃহে এইরূপ কাজ শুরু করেছেন, তাঁদের ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তাই আমি সবাইকে, বেদ-শাস্ত্র-পুরাণ যাঁরা মানেন না, তাঁদেরও বিনীতভাবে প্রার্থনা জানাচ্ছি যে যদি তাঁরা মনে করেন তবে নিজ নিজ গৃহে শীঘ্রই এই কাজ শুরু করুন। ভগবানের পূজার সঙ্গেই গৃহের সব নারী-পুরুষ-বালক সকলেই ভগবানের নাম করুন। ভগবানের পূজা একজন করলেও পূজার অধিকার সবার থাকে। স্বামী না হলে পত্নীপূজা করুন, পত্নী না পারলে পতি করুন। অর্থাৎ ভগবানের পূজায় প্রতিদিন কিছু খরচ করা উচিত। তাতে গৃহে শ্রদ্ধা-ভক্তির বিকাশ হবে। যাঁরা করতে পারেন, তাঁরা বাহ্য পূজার সঙ্গে

নিজ-নিজ সিদ্ধান্ত অনুসারে বা 'প্রেমভক্তি প্রকাশ'[১] অনুসারে ভগবানের মানসিক পূজাও করবেন। কারণ আন্তরিক পূজার মহত্ত্ব আরও বেশি। আমার প্রার্থনা অনুযায়ী একবার এই পূজা-ভক্তি আরম্ভ করে এর ফল প্রত্যক্ষ করুন। এর থেকে বেশি বিশ্বাস দেবার আমার কাছে আর কোনো উপায় নেই।

~~○~~

(২৩) ধর্ম কী ?

প্রশ্ন—কৃপা করে ধর্মের ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর—সত্যকার ধর্ম ব্যাখ্যা করার মতো পুরুষ এই যুগে পাওয়া কঠিন।

প্রশ্ন—আপনি যেমন বোঝেন, কৃপা করে তেমনই বলুন।

উত্তর—ধর্মের বিষয় অত্যন্ত গভীর, আমার ধর্মগ্রন্থের জ্ঞান অত্যন্ত কম, বেদ তো আমি প্রায় অধ্যয়নই করিনি। আমি একজন সাধারণ মানুষ, এই অবস্থায় ধর্ম-তত্ত্ব বলা এক বালকোচিত কাজ। তাছাড়া আমি যা জানি তাও আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, কারণ যতটুকু জানি, তা আমি কার্যে পরিণত করতে পারি না।

প্রশ্ন—আচ্ছা ! আপনি বলুন আপনি কাকে ধর্ম বলে মনে করেন ?

উত্তর—যা ধারণ করার যোগ্য।

প্রশ্ন—ধারণ করার যোগ্য কী ?

উত্তর— ইহলোক ও পরলোকে কল্যাণকারী হয়, মহাপুরুষগণ প্রদত্ত এরূপ শিক্ষা।

প্রশ্ন—মহাপুরুষ কারা ?

উত্তর—পরমাত্মার তত্ত্ব যথার্থরূপে জানা তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ।

প্রশ্ন—তাঁদের লক্ষণ কী ?

---

[১] 'প্রেমভক্তিপ্রকাশ' নামক লেখাটি এই পুস্তকের অন্যত্র রয়েছে, পৃথকভাবেও এটি 'গীতাপ্রেস' থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

উত্তর—

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

(গীতা অধ্যায় ১২, শ্লোক ১৩-১৪)

'যিনি সর্বভূতে দ্বেষভাবরহিত এবং স্বার্থবর্জিতভাবে সকলের প্রেমী এবং হেতুরহিত দয়ালু, মমত্ববোধ রহিত, অহঙ্কারবর্জিত, সুখ-দুঃখপ্রাপ্তিতে সম ও ক্ষমাশীল অর্থাৎ অপরাধীদেরও অভয় প্রদান করে থাকেন।'

'যে ব্যক্তি ধ্যানযোগে নিবিষ্ট থেকে সর্বদা লাভ-ক্ষতিতে সন্তুষ্ট থাকেন এবং মন-ইন্দ্রিয় ও শরীরকে বশে রেখে আমাতে দৃঢ় নিশ্চয়যুক্ত, সেই আমাতে চিত্ত অর্পণকারী মন-বুদ্ধিসম্পন্ন আমার ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয়।'

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥

(গীতা অধ্যায় ১৪, শ্লোক ২৪-২৫)

'যিনি নিরন্তর আত্মভাবে স্থিত হয়ে দুঃখ ও সুখকে সমভাবে দেখেন এবং মাটি-পাথরও স্বর্ণে একই ভাবযুক্ত, ধৈর্যসম্পন্ন, প্রিয়-অপ্রিয়কে এক বলে মনে করে এবং নিজ নিন্দা-স্তুতিতে যিনি অবিচলভাবে বিরাজ করেন।।'

'যিনি মান-অপমানে সমভাবাপন্ন এবং শত্রু-মিত্রে— উভয় পক্ষে সমভাবাপন্ন, সেই সর্বকর্মের কর্তৃত্ব অভিমান রহিত ব্যক্তিকে গুণাতীত বলা হয়।'

এসবই হল মহাপুরুষদের লক্ষণ।

প্রশ্ন—হিন্দুজাতিতে এরূপ লক্ষণযুক্ত কোনো মহাপুরুষ এখন আপনার দৃষ্টি তে আছেন কী ?

উত্তর—অবশ্যই আছে, কিন্তু আমি বলতে পারব না।

প্রশ্ন—আপনি কাদের হিন্দু বলে মনে করেন ?

উত্তর—যিনি নিজেকে হিন্দু বলে মনে করেন, তিনিই হিন্দু।

প্রশ্ন—হিন্দু শব্দটির অর্থ কী ?

উত্তর—হিন্দুস্তানে (আর্যাবর্তে) জন্ম হওয়া এবং কোনো হিন্দু আচার্যের মতকে মেনে নেওয়া।

প্রশ্ন— সনাতনী, আর্য, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম ইত্যাদি বিভিন্ন মত অনুসরণকারী এবং ভারতের বিভিন্ন জংলী জাতি সকলেই হিন্দু ?

উত্তর—তাঁরা যদি নিজেদের হিন্দু মনে করেন, তাহলে অবশ্যই হিন্দু।

প্রশ্ন—সকল হিন্দু দ্বারা প্রচলিত মতকে কি হিন্দু-ধর্ম মানা যায় ?

উত্তর—অবশ্যই।

প্রশ্ন—এই সব মতের মধ্যে সর্বপ্রধান ও শ্রেয়স্কর বলে কোন্ মতটিকে আপনি মানেন ?

উত্তর— অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য, মন-নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়দমন, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, বীর্য, দয়া, তেজ, সারল্য, স্বার্থত্যাগ, অমানিত্ব, দম্ভহীনতা, অপৈশুনতা, নিষ্কপটতা, বিনয়, ধৃতি, সেবা, সৎসঙ্গ, জপ, ধ্যান, নির্বৈরতা, সমতা, নির্ভয়তা, নিরহঙ্করতা, মৈত্রী, দান, কর্তব্যপরায়ণতা এবং শান্তি এই চল্লিশটি গুণের মধ্যে যে মতে যতো অধিক গুণ থাকে, সেই মতই সবথেকে প্রধান এবং শ্রেয়স্কর মনে করার উপযুক্ত।

প্রশ্ন—কৃপা করে এই চল্লিশটিকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর—উত্তম, শুনুন।

১) **অহিংসা**— কায়-মনো-বাক্যে কারোকে কোনো প্রকারে কষ্ট না দেওয়া।

২) **সত্য**—অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যা স্থির করা হয়েছে সেসবই প্রিয় বাক্যে বলা।

৩) **অস্তেয়**—কোনোভাবে চুরি না করা।

৪) **ব্রহ্মচর্য**—আট রকমের মৈথুন ত্যাগ করা।

৫) **অপিরগ্রহ**—মমত্ব বুদ্ধি দ্বারা সংগ্রহ না করা।

৬) **শৌচ**—বাহির ও অন্তরের পবিত্রতা।

৭) **সন্তোষ**—সর্বতোভাবে তৃষ্ণা না থাকা।

৮) **তপ**—স্বধর্ম-পালনের জন্য কষ্ট সহ্য করা।

৯) **স্বাধ্যায়**—পরমার্থ সম্পর্কিত গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং ভগবানের নাম-গুণ-গান করা।

১০) **ঈশ্বরভক্তি**—ভগবানে শ্রদ্ধা-ভক্তি হওয়া।

১১) **জ্ঞান**—সৎ ও অসৎ পদার্থ সঠিকভাবে জানা।

১২) **বৈরাগ্য**—ইহলোক ও পরলোকে আসক্তির অভাব।

১৩) **মন-নিগ্রহ**—মনকে বশ করা।

১৪) **ইন্দ্রিয়দমন**—সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বশ করা।

১৫) **তিতিক্ষা**—শীত-গ্রীষ্ম ও সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্বে সহ্যশীলতা।

১৬) **শ্রদ্ধা**—বেদ, শাস্ত্র, মহাত্মা, গুরু ও পরমেশ্বরের বচনে প্রত্যক্ষের মতো বিশ্বাস।

১৭) **ক্ষমা**—নিজের প্রতি অপরাধকারীদের কোনোভাবে দণ্ড প্রদানের ইচ্ছা না থাকা।

১৮) **শৌর্য**—বিন্দুমাত্র কাপুরুষতা না থাকা।

১৯) **দয়া**—কোনো প্রাণীর দুঃখ দেখে হৃদয়ে করুণা হওয়া।

২০) **তেজ**—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সেই শক্তির নাম তেজ যার প্রভাবে বিষয়াসক্ত নীচ প্রকৃতির মানুষও প্রায়শঃ পাপকাজ ছেড়ে শ্রেষ্ঠ কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

২১) **সারল্য**—শরীর ও ইন্দ্রিয়সহ অন্তঃকরণের সারল্য।

২২) **স্বার্থত্যাগ**—কোনো কার্যেই ইহলোক বা পরলোকের কোনো স্বার্থ আকাঙ্ক্ষা না করা।

২৩) **অমানিত্ব**—সৎকার, মান ও পূজা ইত্যাদি না চাওয়া।

২৪) **দম্ভহীনতা**—দম্ভ ও লোক দেখানোর প্রয়াস না থাকা।

২৫) **অপৈশুনতা**—কারো নিন্দা না করা।

২৬) **নিষ্কপটতা**—নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য কোনো কিছু না লুকানো।

২৭) **বিনয়**—নম্রভাবে থাকা।

২৮) **ধৃতি**—অত্যন্ত বিপদেও ধৈর্যধারণ করা।

২৯) **সেবা**—(সর্বভূতহিতে থাকা) সর্ব জীবকে সুখী করার জন্য কায়-মনো-বাক্যে সর্বদা নিঃস্বার্থভাবে নিজ সামর্থ্যানুসারে চেষ্টা করা।

৩০) **সৎসঙ্গ**—সাধু-মহাত্মাগণের সঙ্গলাভ করা।

৩১) **জপ**—নিজ ইষ্টদেবের নাম জপ করা।

৩২) **ধ্যান**—নিজ ইষ্টদেবের ধ্যান করা।

৩৩) **নির্বৈরতা**—নিজের সঙ্গে শত্রুতাকারীদের সঙ্গেও শত্রুতার ভাব না রাখা।

৩৪) **নির্ভয়তা**—সর্বতোভাবে ভয়হীন হওয়া।

৩৫) **সমতা**—মাথা, পা ইত্যাদি নিজ অঙ্গের মতো সকলের সঙ্গে বর্ণাশ্রম অনুসারে ব্যবহারে যথাযোগ্য পার্থক্য বজায় রেখে আত্মরূপে সকলকে সমভাবে দেখা।

৩৬) **নিরহঙ্কারিতা**—মন-বুদ্ধি-শরীরে আমিত্ব-ভাব এবং এসবের দ্বারা হওয়া কর্মে অহঙ্কার-বোধের সর্বতোভাবে অভাব।

৩৭) **মৈত্রী**—প্রাণীমাত্রের সঙ্গেই প্রেমভাব।

৩৮) **দান**—যে দেশে, যখন, যার, যেবস্তুর অভাব হয়, প্রত্যুপকার বা ফলের আকাঙ্ক্ষা না রেখে আনন্দের সঙ্গে সেটি তাকে প্রদান করা।

৩৯) **কর্তব্যপরায়ণতা**—নিজ কর্তব্যে তৎপর থাকা।

৪০) **শান্তি**— ইচ্ছা ও বাসনাসমূহ না থাকা এবং অন্তঃকরণে সর্বদা প্রসন্নভাব থাকা।

প্রশ্ন—আপনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম কি মানেন ?

উত্তর—মানি, সেটি পালন করা ভালো বলে মনে করি।

প্রশ্ন—যাঁরা বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন করেন না, আপনি তাঁদের হিন্দু বলে মনে করেন না ?

উত্তর—তাঁরা যখন নিজেদের হিন্দু বলে মানেন, তখন তাঁদের হিন্দু বলে না মানার আমার কী অধিকার ? কিন্তু যাঁরা বর্ণাশ্রম-ধর্ম মান্য করেন না তাদের

শাস্ত্রে নিন্দা করা হয়েছে। সুতরাং বর্ণাশ্রম-ধর্ম অবশ্যই মানা উচিত।

প্রশ্ন—আপনি জন্ম থেকে বর্ণ মানেন না ধর্ম থেকে ?

উত্তর—জন্ম ও কর্ম উভয় থেকেই।

প্রশ্ন—এই দুটির মধ্যে কোনটি প্রধান বলে মানেন ?

উত্তর—নিজ নিজ স্থানে দুটিই প্রধান।

প্রশ্ন—বর্ণ কয় প্রকার ?

উত্তর—চারপ্রকার—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

প্রশ্ন—ব্রাহ্মণের কী কাজ ?

উত্তর—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥

(গীতা অধ্যায় ১৮, শ্লোক ৪২)

'অন্তঃকরণের নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়াদি দমন, বাহ্যাভ্যন্তর শুচি, ধর্মের জন্য কষ্ট সহ্য করা, ক্ষমাভাব, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের সারল্য, আস্তিকবুদ্ধি, শাস্ত্র-জ্ঞান, পরমতত্ত্বের অনুভব —এসবই হল ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম অর্থাৎ ধর্ম।'

এতদ্ব্যতীত যজ্ঞ করা, করানো, দান দেওয়া ও নেওয়া, অধ্যয়ন করা ও করানো এ সবই কর্তব্যকর্ম। এসবের মধ্যে যজ্ঞ করা, দান দেওয়া ও অধ্যয়ন করা— এই তিনটি সাধারণ ধর্ম আর যজ্ঞ করানো, দান গ্রহণ ও অধ্যয়ন করানো—এগুলি জীবিকার বিশেষ ধর্ম।

প্রশ্ন—ব্রাহ্মণের জীবিকার সর্বোত্তম ধর্ম কী ?

উত্তর—কৃষক শস্য নিয়ে যাওয়ার পর ক্ষেতে এবং বিক্রয়স্থলে জমিতে ছড়ানো শস্য সঞ্চয় করে তার দ্বারা শরীর নির্বাহ করা হল সর্বোত্তম। একে বলা হয় ঋৎ এবং সৎ বৃত্তি। কিন্তু বর্তমানে এই প্রণালী নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এইভাবে জীবন-নির্বাহ করা প্রায় অসম্ভব। তাই সাধারণভাবে জীবিকা নির্বাহ করা উচিত।

প্রশ্ন—সাধারণ জীবিকার মধ্যে কোনটি উত্তম ?

উত্তর—না চাইতে যা আপনিই পাওয়া যায়, তাই হল সর্বোত্তম, তাকে

অমৃত বলা হয়। নিয়মিত বেতন নিয়ে বিদ্যাদান করা এবং দান বা দক্ষিণা গ্রহণ নিন্দনীয়। এর মধ্যে আবার দান চেয়ে নেওয়া বিষতুল্য বলে মনে করা হয়।

প্রশ্ন—এই বৃত্তির সাহায্যে যদি সংসার-নির্বাহ না হয় তবে ব্রাহ্মণের কী করা উচিত ?

উত্তর—ক্ষত্রিয়-বৃত্তিতে নির্বাহ করবে, তাতেও না হলে বৈশ্য-বৃত্তি দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করবেন, কিন্তু কোনোভাবেই দাস-বৃত্তি অবলম্বন করবেন না।

প্রশ্ন—ক্ষত্রিয়ের কর্ম কী ?

উত্তর—

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥

(গীতা অধ্যায় ১৮, শ্লোক ৪৩)

‘শৌর্য, তেজ, ধৈর্য, চাতুর্য এবং যুদ্ধের থেকে পলায়ন না করার স্বভাব, দান ও প্রভুত্ব-ভাব—এগুলি হল ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম।’

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥

(মনুস্মৃতি ১।৮৯)

‘প্রজাকে রক্ষা করা, দান করা, যজ্ঞ করা, অধ্যয়ন এবং বিষয়ে আসক্ত না হওয়া—সংক্ষেপে এই হল ক্ষত্রিয়ের কর্ম।’

এই সবের মধ্যে প্রজা পালন, সৈনিক হওয়া, ন্যায়কর্ম করা, কর গ্রহণ ও শাস্ত্রদ্বারা অপরকে রক্ষা করা, এসব হল জীবিকার কর্ম। দান করা, যজ্ঞ করা, অধ্যয়ন করা—এগুলি সাধারণ ধর্ম।

প্রশ্ন— এই সব কর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ না হলে ক্ষত্রিয়ের কী করা উচিত ?

উত্তর—বৈশ্য বৃত্তি দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করবেন, তাতেও না হলে শূদ্র-বৃত্তির সাহায্যে নির্বাহ করবেন।

প্রশ্ন—বৈশ্যের কর্ম কী ?

উত্তর—

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্ পথং কুসীদং চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥

(মনুস্মৃতি ১।৯০)

'পশুদের রক্ষা করা, দান করা, যজ্ঞ করা, অধ্যয়ন করা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাষ-বাস—এসবই হল বৈশ্যদের কর্ম।'

পশুপালন, কৃষি, সৎ ও পবিত্র ব্যাপার—এগুলি হল স্বাভাবিক এবং জীবিকারও কর্ম। সুদগ্রহণও জীবিকার কর্ম, কিন্তু কেবলমাত্র সুদে জীবনযাপন করা নিন্দনীয়। যজ্ঞ, দান এবং অধ্যয়ন হল সাধারণ ধর্ম।

প্রশ্ন—সৎ ও পবিত্র ব্যবসায় কাকে বলে, বলুন।

উত্তর—অন্যের স্ব-এর প্রতি নজর না দিয়ে ; মিথ্যাচার, ছল ত্যাগ করে ন্যায়পূর্বক পবিত্র বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করা হল সৎ-পবিত্র ব্যবসায়[১]।

প্রশ্ন— এর দ্বারা যদি জীবিকা নির্বাহ না হয় তাহলে বৈশ্যের কী করা উচিত ?

উত্তর—শূদ্রবৃত্তি গ্রহণ করবেন, কিন্তু অপবিত্র বস্তু বা ফাটকাবাজী কখনও করবেন না।

প্রশ্ন—কৃপা করে অপবিত্র বস্তু সমূহের ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর—মদ্য, মাংস, চর্ম, শিং, গলা ইত্যাদি ইত্যাদি হল অপবিত্র পদার্থ।

প্রশ্ন—শূদ্রের কাজ কী ?

উত্তর—সেবা এবং কারিগরের কাজই তাঁর স্বাভাবিক এবং জীবিকার কর্ম।

~~○~~

---

[১]জিনিষপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মাপ-জোপ এবং গুণতিতে কম দেওয়া বা বেশি নেওয়া এবং বস্তু বদল করে বা ভালোর সঙ্গে খারাপ বস্তু মিশিয়ে দেওয়া বা ভালো বস্তু নিয়ে নেওয়া এবং লাভ, মজুত, দালালী নির্ধারণ করে বেশি নেওয়া বা কম দেওয়া ; মিথ্যা, কপটাচার বা চুরি, জবরদস্তি বা অন্য কোনোভাবে অন্যের হক ছিনিয়ে নেওয়া ইত্যাদি দোষবর্জিত হয়ে যিনি সত্যতাপূর্বক পবিত্রবস্তুর ব্যবসা করেন, তাঁকে বলা হয় সত্য ব্যবসায়।

(২৪) গীতোক্ত সন্ন্যাস বা সাংখ্যযোগ

জনৈক সজ্জন ব্যক্তি প্রশ্ন করেছেন যে—

'গীতায় বর্ণিত সন্ন্যাসের স্বরূপ কী ?'

গীতার মর্ম জানানো অত্যন্ত কঠিন কাজ। গীতা এমন এক গভীর গ্রন্থ যে এর ওপর আজ পর্যন্ত অনেক বড়-বড় বিদ্বান সাধু-মহাত্মাগণ তাঁদের বুদ্ধি কাজে লাগিয়েছেন এবং তাঁদের বিচার প্রকট করেছেন, তা সত্ত্বেও এই গীতা-শাস্ত্রের মধ্যে গীতা অনুসন্ধানকারীদের নতুন নতুন অমূল্য রত্নের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, এই শাস্ত্রের রহস্য আর কী বলা যায় ? যদিও গীতা-শাস্ত্রের ওপর আলোচনা করা আমার বুদ্ধির বাইরে, তবুও আমি নিজ সাধারণ বুদ্ধি অনুসারে নিজের মনে বুঝে নেওয়া সাধারণ ভাবসমূহ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করছি। কোনো বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায়, মত বা টিকাকারগণের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু নিয়ে আক্ষেপ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। শুধুমাত্র আমার মনের ভাব জানানোই হল আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

গীতার সন্ন্যাসের সম্বন্ধে খুবই মতপার্থক্য রয়েছে—

১) এক পক্ষ বলে থাকেন যে গীতার সন্ন্যাস ও কর্মযোগ নামে দুটি নিষ্ঠার বর্ণনা আছে, যাতে শুধু সন্ন্যাসই মুক্তির প্রধান ও প্রত্যক্ষ হেতু এবং সেই সন্ন্যাস হল 'সম্যক্ জ্ঞানপূর্বক সম্পূর্ণ কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করা' অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করতে হয়।

২) দ্বিতীয় পক্ষ বলেন যে, যদিও শাস্ত্রোক্ত সন্ন্যাসাশ্রম অর্থাৎ জ্ঞানপূর্বক সম্পূর্ণ কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগের দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি লাভ করা সম্ভব হয়, কিন্তু গীতায় তা বলা নেই, যদি বলাও হয়ে থাকে তবে তা নিতান্ত গৌণভাবে। গীতা শুধুমাত্র নিষ্কাম কর্মযোগেরই প্রতিপাদন করে এবং গীতায় উল্লিখিত সন্ন্যাস শব্দের উদ্ধৃতি প্রায়শঃ নিষ্কাম কর্মযোগের বিষয়েই করা হয়েছে।

৩) অন্য এক তৃতীয় পক্ষ আছেন, যাঁরা কর্মকে বাহ্যতঃ ত্যাগ করা শাস্ত্রোক্ত সন্ন্যাস আশ্রমকে মেনেও গীতায় উদ্ধৃত সাংখ্য এবং কর্মযোগ নামক ভিন্ন-ভিন্ন নিষ্ঠাকে ভগবৎ-প্রাপ্তির দুটি সম্পূর্ণ পৃথক সাধন বলে মনে করেন

এবং সাংখ্য বা সন্ন্যাস শব্দ দ্বারা সন্ন্যাস আশ্রম মনে করেন না। কিন্তু সমস্ত কর্মে কর্তৃত্ববোধের অহংভাব রহিত হয়ে সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতে একীভাবে অবস্থান করাকেই সন্ন্যাস বলে মনে করা হয়।

গৌণরূপে আরও অনেক মতামত রয়েছে, কিন্তু এগুলির সবকিছুই প্রায়শঃ উপরিউক্ত তিন পক্ষেরই অন্তর্গত হয়ে থাকে। এবার বিবেচনা করতে হয় যে এগুলির মধ্যে কোন পক্ষ অধিক যুক্তিপূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী। এগুলির ওপর ক্রমশঃ বিচার করা হচ্ছে।

ক) প্রথম পক্ষের সিদ্ধান্তনুসারে যদি সন্ন্যাসকেই মুক্তির একমাত্র হেতু মানা হয়, তাহলে গীতায় যেখানে ভগবান বলেছেন—

'যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।' (৫।৫)

'জ্ঞানযোগীগণ যে স্থান (পদ) প্রাপ্ত করতে পারেন, নিষ্কাম কর্মযোগিগণও সেই স্থান প্রাপ্ত করতে পারেন'—এই বাক্যের কোনো মূল্য থাকে না। এখানে স্পষ্টভাবে ভগবান সাংখ্যযোগের সমানই নিষ্কাম কর্মযোগকেও পৃথক সাধন বলে স্বীকার করেছেন।

এছাড়াও এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ দুটিকে পরম কল্যাণকারী বলেছেন ও কর্মযোগকে সন্ন্যাসের থেকে উত্তম বলে জানিয়েছেন ; এই অবস্থায় একথা কীভাবে মানা যায় যে নিষ্কাম কর্মযোগ মুক্তির পৃথক সাধন নয় ? দুটি সাধনের মধ্যে স্বরূপতঃ (বাহ্যতঃ) অত্যন্ত বেশি পার্থক্য অবশ্যই আছে, দুইয়ের অধিকারীও দুপ্রকারের সাধক হয়ে থাকেন, দুটি সাধন একসঙ্গে পালন করাও যায় না। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একজন সাধক দুটি সাধন প্রয়োগ করতে পারেন, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে দুটি সাধনই মোক্ষের ভিন্ন ভিন্ন পথ , এখন বিচার করতে হবে যে এখানে সন্ন্যাস শব্দ দ্বারা সন্ন্যাস আশ্রম লক্ষ্য করা হয়েছে না অন্য কিছু ?

অর্জুনের এই প্রশ্নে—

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্‌॥

(গীতা অধ্যায় ৫, শ্লোক ১)

'হে কৃষ্ণ ! আপনি কর্মে সন্ন্যাসের ও কর্মযোগেরও প্রশংসা করেছেন তাই এই দুটির মধ্যে যেটি নিশ্চিত কল্যাণদায়ক সাধন, সেটি আমাকে বলুন।' যদি মেনে নেওয়া হয় যে গীতায় সন্ন্যাস শব্দদ্বারা শাস্ত্রোক্ত সন্ন্যাস-আশ্রম বা নিয়ত কর্ম স্বরূপতঃ (বাহ্যতঃ) ত্যাগ করা বলা হয়েছে, তাহলে তা যুক্তিযুক্ত নয় ; কারণ এর আগে ভগবান এমন কোনো আশ্রমবিশেষের বা কর্মকে স্বরূপতঃ ত্যাগ করার জন্য কোথাও বলেননি, যার ভিত্তিতে অর্জুনের প্রশ্নের এরূপ অভিপ্রায় মানা যায়। ভগবান এর আগে নানাস্থানে জ্ঞানের এবং বৈরাগ্যাদি সাত্ত্বিক ভাবের এবং কায়-মনো-বাক্যের দ্বারা হওয়া সমস্ত ক্রিয়া থেকে কর্তৃত্ব অভিমান ত্যাগ করার প্রশংসা করেছেন। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে জ্ঞানীর শরীরদ্বারা নিত্য কর্ম করার প্রয়োজনীয়তাও দেখিয়েছেন (অধ্যায় ৩।২০-২৩, ২৫-২৭, ২৯, ৩৩ ; অধ্যায় ৪।১৫)।

সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা সন্ন্যাস আশ্রমে সহজেই মুক্তি লাভ হয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আমার মনে হয় সেই মুক্তিতে সন্ন্যাস আশ্রম কোনো হেতু নয়, তার হেতু হল সম্যক্ জ্ঞান যা সকল বর্ণ ও আশ্রমে লাভ করা সম্ভব (গীতা ৬।১-২)।

এতদ্ব্যতীত গীতায় এটিও নির্বিবাদে প্রমাণিত যে স্বরূপতঃ সমস্ত কর্ম কখনও করা যায় না।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

(গীতা অধ্যায় ৩, শ্লোক ৫)

যদি কেউ কিছু ত্যাগও করে, গীতায় তাকে তামসী ত্যাগ মনে করা হয়।

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ॥

(গীতা অধ্যায় ১৮, শ্লোক ৭)

এবং শুধুমাত্র সেই বাহ্য কর্ম ত্যাগের দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্তির কথা বলা হয়নি।

ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি। (৩।৪)

উপরন্তু পরবর্তী শ্লোকে বাক্য ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও হটতাপূর্বক কর্ম ত্যাগ

করে মনে মনে বিষয়চিন্তাকে নিন্দা করা হয়েছে এবং তাকে মিথ্যাচার বলা হয়েছে (অধ্যায় ৩।৬)। পরের শ্লোকে ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত করে অনাসক্তভাবে কর্মযোগের আচরণ যাঁরা করেন, তাঁদের শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে (অধ্যায় ৩।৭)।

এই অবস্থায় কর্ম স্বরূপতঃ (বাহ্যভাবে) ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে মেনে নিলে তাতে মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না। আর যদি মুক্তি না হয় তাহলে পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবান যেকথা বলেছেন—

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ। (৫।২)

'কর্মে সন্ন্যাস এবং নিষ্কাম কর্মযোগ এই দুটিই পরম কল্যাণপ্রদ' এই সিদ্ধান্তে বাধা আসে। কারণ শুধুমাত্র বাহ্যকর্ম স্বরূপতঃ যিনি ত্যাগ করেন, উল্লিখিত সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁকে তামস ত্যাগী বলা হয়।

এখানে এই 'নিঃশ্রেয়স' এবং তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকের 'সিদ্ধিম্' শব্দ, দুটিই কল্যাণের বাচক। যদি এই সিদ্ধিকে মুক্তির বাচক না মেনে নিম্ন অবস্থা মানা হয়, তাহলে শুধু কর্মত্যাগের দ্বারা কল্যাণ না হওয়ায় বিষয় আরও দৃঢ় হয় ; কর্মত্যাগের দ্বারা যখন নিম্নশ্রেণীর সিদ্ধিই লাভ হয় না, তখন মোক্ষরূপ পরম সিদ্ধি কী করে পাওয়া সম্ভব ? এই সব বিষয় চিন্তা করলে এটিই প্রতীত হয় যে গীতায় সন্ন্যাস শব্দ জ্ঞানযোগের বাচক এবং এর সম্বন্ধ অন্তঃকরণে ভাবেরই সঙ্গে, কোনো বাহ্যিক অবস্থাবিশেষের সঙ্গে নয়। কোনো বর্ণ বা আশ্রমের সঙ্গে এর সম্বন্ধ প্রমাণিত হয় না, এহল শুধুমাত্র ভগবৎ প্রাপ্তির এক পরম সাধন, যা সকল বর্ণ ও সমস্ত আশ্রমে অনুসরণ করা যেতে পারে।

লোকেদের মনে একটা ধারণা রয়েছে যে সাংখ্য নিষ্ঠার অধিকার শুধুমাত্র সন্ন্যাস-আশ্রমেই থাকে, কিন্তু এই ধারণা ঠিক বলে মনে হয় না। যদি তা হোত তাহলে ভগবানের প্রদত্ত সাংখ্যনিষ্ঠার বিস্তারিত উপদেশ, যা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১তম শ্লোক থেকে ৩০ তম পর্যন্ত বলা হয়েছে, তাতে যুদ্ধ করার জন্য অর্জুনকে উৎসাহিত করা হোত না (গীতা ২।১৮ দ্রষ্টব্য)। আর অষ্টাদশ অধ্যায়ে যখন ত্যাগ ও সন্ন্যাস সম্পর্কে অর্জুন ভগবানকে স্পষ্টভাবে প্রশ্ন করেছেন সেখানে ভগবান প্রথমে ত্যাগের স্বরূপ 'ফলাসক্তি-ত্যাগ' জানিয়ে

(অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৯ থেকে ১১ তম শ্লোক দ্রষ্টব্য) পরে সাংখ্যনিষ্ঠার সিদ্ধান্ত শোনার জন্য অর্জুনকে নির্দেশ দিয়ে পরে স্পষ্ট করে বলেছেন যে পাঁচটি কারণবশতঃ হওয়া প্রাকৃতিক কর্মে যেব্যক্তি অশুদ্ধি বুদ্ধি হেতু শুধু (শুদ্ধ) আত্মাকে কর্তা বলে মানে, সেই দুর্মতি আত্মস্বরূপকে যথার্থভাবে দেখে না অর্থাৎ কর্তৃত্ব অহংকার রাখে সেই ব্যক্তি সাংখ্যযোগী নয়।

সাংখ্যযোগী তাঁকেই বলা হয়—

'যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।' (১৮।১৭)

'যাঁর "আমি কর্তা" এরূপ ভাব থাকে না এবং যাঁর বুদ্ধি সাংসারিক বস্তুতে ও কর্মে কখনও লিপ্ত হয় না' অতএব অহংকার ত্যাগ করাই হল সন্ন্যাস। স্বরূপতঃ কর্ম ত্যাগ করাকে যদি ভগবান সন্ন্যাস বলে মনে করতেন তাহলে মন থেকে ত্যাগ করার কথা বলতেন না (পঞ্চম অধ্যায়ের ১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সাংখ্য অথবা সন্ন্যাস কর্মকে স্বরূপতঃ (বাহ্যতঃ) ত্যাগের নাম নয় এবং সন্ন্যাসের মতোই নিষ্কাম কর্মযোগও মুক্তির প্রত্যক্ষ হেতু হয়ে থাকে।

২) দ্বিতীয় পক্ষ অনুযায়ী যদি মানা যায় যে গীতায় শুধু নিষ্কাম কর্মযোগেরই বর্ণনা আছে এবং সন্ন্যাস শব্দটির সমাবেশও এতেই করা হয়, তবে এটিও ঠিক বলে মনে হয় না ; কারণ অর্জুনের জিজ্ঞাসার উত্তরে ভগবান অধিকারী-ভেদে দুটি নিষ্ঠার পৃথক বর্ণনা করেছেন।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥

(গীতা অধ্যায় ৩, শ্লোক ৩)

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিভাগ সহ এই দুই নিষ্ঠার পৃথক পৃথক বর্ণনা করা হয়েছে। সাংখ্যযোগের বর্ণনা করার পর ভগবান বলেছেন—

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু। (গীতা ২।৩৯)

'তোমার জন্য এই বুদ্ধি জ্ঞানযোগের বিষয়ে বলা হয়েছে এবং এটি (এখন) নিষ্কাম কর্মযোগের ব্যাপারো শোনো।' এছাড়াও আরও অনেক

জায়গায় এরূপ বর্ণনা রয়েছে যার দ্বারা উভয় নিষ্ঠার স্বাতন্ত্র প্রমাণিত হয় (গীতা পঞ্চম অধ্যায়ের ১ থেকে পঞ্চম শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে উভয় নিষ্ঠার ফলরূপে এক পরমাত্মাই প্রাপ্ত হন, কিন্তু দুটির স্বরূপ সর্বতোভাবে পৃথক। উভয় নিষ্ঠার সাধকদের কার্য, বিচারশৈলী, দুইয়ের ভাব ও পথ সর্বতোভাবে ভিন্ন। নিষ্কাম কর্মযোগী সাধন-কালে কর্ম, কর্মফল, পরমাত্মা এবং নিজেকে ভিন্ন-ভিন্ন মনে করে কর্মের ফল ও আসক্তি ত্যাগ করে ঈশ্বরপরায়ণ হয়ে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি দ্বারাই সর্ব কর্ম করেন (গীতা ৩।৩০ ; ৪।২০ ; ৫।১০ ; ৯।২৭-২৮ ; ১২।১১-১২ ; ১৮।৫৬-৫৭ দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু সাংখ্যযোগী মায়া দ্বারা উৎপন্ন সমস্ত গুণই গুণাদিতে প্রবৃত্ত হয়, এরূপ মনে করে কায়-মনো-বাক্যে হওয়া সর্ব কর্মে কর্তৃত্ব-অভিমান রহিত হয়ে শুধু সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপে নিরন্তর অনন্যভাবে অবস্থান করেন (গীতা ৩।২৮ ; ৫।৮-৯, ১৩ ; ৬।৩১ ; ১৩।২৯-৩০ ; ১৪।১৯-২০ ; ১৮।১৭, ৪৯-৫৫)।

নিষ্কাম কর্মযোগী নিজেকে কর্মের কর্তা বলে মনে করেন (৫।১১), সাংখ্যযোগী নিজেকে কর্তা মনে করেন না (৫।৮-৯)। নিষ্কাম কর্মযোগী নিজকৃত কর্মফল ভগবানে অর্পণ করেন (৯।২৭-২৮), সাংখ্যযোগী মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হওয়া ক্রিয়াসমূহকে কর্ম বলেই মনে করেন না (১৮।১৭)। নিষ্কাম কর্মযোগী পরমাত্মাকে নিজের থেকে পৃথক বলে মানেন (১২।৬-৭), সাংখ্যযোগী সর্বদা অভেদ বলে মানেন (৬।২৯-৩১ ; ৭।১৯ ; ১৮।২০)। নিষ্কাম কর্মযোগী প্রকৃতি ও প্রকৃতির পদার্থসমূহের অস্তিত্ব স্বীকার করেন (১৮।৯, ৬১), সাংখ্যযোগী এক ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কারোর অস্তিত্ব মানেন না (১৩।৩০) ; যদি কোথাও কখনও মানতে দেখে যায়, তা শুধু অন্যকে বোঝাবার জন্য, যথার্থ নয় ; তিনি প্রকৃতিকে শুধুই মায়া বলে মানেন, আসলে কিছুই মানেন না। নিষ্কাম কর্মযোগী কর্ম থেকে ফল উৎপন্ন হয়, এরূপ মনে করে নিজেকে ফল ও আসক্তিত্যাগী বলে মনে করেন, ফল এবং কর্মকে পৃথক পৃথক অস্তিত্ব বলে মনে করেন ; সাংখ্যযোগী কর্ম বা ফলের অস্তিত্বই মানেন না এবং তাতে তাঁর কোনো সম্বন্ধ আছে বলেও মনে করেন না। নিষ্কাম

কর্মযোগী কর্ম করেন, সাংখ্যযোগীর অন্তঃকরণ ও শরীরদ্বারা কর্ম স্বভাবতঃই হয়ে থাকে, তিনি নিজে করেন না (৫।১৪)। নিষ্কাম কর্মযোগীর মুক্তির হেতু তাঁর বিশুদ্ধ নিষ্কামভাব, ভগবৎ-শরণাগতি ও ভগবৎ-কৃপা (২।৫১ ; ১৮।৫৬), সাংখ্যযোগীর মুক্তির হেতু এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপে অভিন্নভাবে নিরন্তর গভীর স্থিতি (৫।১৭, ২৪)। তাই ফলে অবিরোধ হলেও উভয় সাধনে অত্যন্ত পার্থক্য থাকে এবং দুটিই সর্বতোভাবে পৃথক। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে শ্রীভগবান অর্জুনকে তাঁর জন্য উপযুক্ত মনে করে ভক্তিযুক্ত নিষ্কাম কর্মযোগের জন্যই নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু গীতায় সাংখ্যনিষ্ঠার বর্ণনাও কিছু কম বিস্তারপূর্বক হয়নি। স্থানে-স্থানে ভগবান সাংখ্যনিষ্ঠার অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন। কর্মযোগের বিশেষত্ব এইজন্য জানিয়েছেন যে এটি সহজ এবং দেহাভিমানী পুরুষও এর সাধন করতে সক্ষম, অপরপক্ষে সাংখ্যযোগ এর থেকে অত্যন্ত কঠিন (গীতা ৫।৬)। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে গীতায় উভয় নিষ্ঠারই বর্ণনা করা হয়েছে ; শুধুই কর্মযোগে বা সাংখ্যযোগে প্রতিপাদন করা হয়নি এবং সন্ন্যাস শব্দের সমাবেশ শুধু কর্মযোগেও হয় না।

এই আলোচনার দ্বারা জানা যায় যে গীতায় উভয় নিষ্ঠারই বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাতে সাংখ্য বা সন্ন্যাসের অর্থ স্বরূপতঃ (বাহ্যতঃ) কর্ম ত্যাগ করা নয়।

৩) এখন তৃতীয় পক্ষের সিদ্ধান্তের ওপর বিচার করলে এই সিদ্ধান্ত অধিক যুক্তিগ্রাহ্য এবং হৃদয়গ্রাহী হয়। বাস্তবে সন্ন্যাস শব্দের অর্থ গীতায় সাংখ্য বা জ্ঞানযোগই মানা হয়ে থাকে। সন্ন্যাস, সাংখ্যযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি শব্দের সাহায্যে একই নিষ্ঠার বর্ণনা করা হয়েছে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৯ থেকে ৫৫ তম শ্লোক পর্যন্ত এই জ্ঞাননিষ্ঠার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। ৪৯তম শ্লোকে **'পরমাং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিম্'** দ্বারা যাঁর প্রাপ্তির কথা সন্ন্যাসের দ্বারা বলা হয়েছে, সেই সন্ন্যাস হল জ্ঞানযোগ। এই শ্লোকসমূহের আলোচনায় জানা যায় যে অভেদরূপে পরব্রহ্ম পরমাত্মার যে ধ্যান করা হয় এবং সেই ধ্যানের যে ফল হয় তাকেই বলা হয় পরা ভক্তি এবং তাই হল এই জ্ঞানযোগের পরা নিষ্ঠা।

জ্ঞানযোগের সাধক এইভাবে সমগ্র জগতের পদার্থ ও কর্ম ত্রিগুণময়ী মায়ারই বিস্তার মনে করে নিজেকে দ্রষ্টা সাক্ষী বলে মনে করেন (১৪।১৯-২০)। তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে নিত্য অভিন্ন হয়ে ব্রহ্মেই বিচরণ করেন (৫।২৬ ; ৬।৩১)। তিনি মায়াতেই সমস্ত কর্মের বিস্তার দর্শন করেন (গীতা ৩।২৭-২৮ দ্রষ্টব্য।) তিনি শরীর-মন ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে হওয়া সমস্ত ক্রিয়াতে কর্তৃত্বের অভাব বোধ করেন। ইন্দ্রিয়াদি নিজ নিজ বিষয়ে বিচরণ করে, আত্মা তার থেকে অতীত এবং ভিন্ন—এই মনে করে তিনি সাধনার সময়েই নিজ কর্তৃত্বভাব দেখেন না, কিন্তু মায়ার স্থানেও তিনি এক ব্রহ্মেরই বিস্তার বলে মনে করেন এবং এই ভাব থাকায় তাঁর দৃষ্টিতে এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোনো বস্তুই থাকে না। সমগ্র জগৎকেই তিনি এক ব্রহ্মেরই কার্যরূপ দেখেন। সাধন-কালে প্রকৃতি এবং তার কার্য আত্মা থেকে ভিন্ন, অনিত্য ও ক্ষণিক দেখে এবং নিজেকে অকর্তা, অভোক্তা মেনে নিয়ে এক আত্মাই সর্বত্র ব্যাপক মনে করে সাধনায় রত থাকেন। যখন শেষকালে একমাত্র ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত অন্য সবকিছুর অত্যন্ত অভাব হয়ে যায়, তখন তিনি সেই অনির্বচনীয় পরম পদ প্রাপ্ত করেন। তাঁর দৃষ্টিতে এক ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। মন, বুদ্ধি, অন্তঃকরণ ইত্যাদিও তখন ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যায়। একমাত্র বাসুদেব ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না (গীতা ৫।১৭ ; ৭।১৯)।

তিনি এই চরাচর জগতের বাইরে-ভিতরে এবং এই চরাচরকে পরব্রহ্ম পরমাত্মার রূপ বলেই মনে করেন (গীতা ১৩।১৫ দ্রষ্টব্য)।

এরূপ ব্যক্তির দ্বারা লোকচক্ষুতে সাধনাকালে ও সিদ্ধাবস্থাতে হলেও, সেই সব কর্মে এবং জগতের সম্পূর্ণ পদার্থে একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত দৃষ্টি না থাকায় এবং কর্তৃত্ববোধের অভাবে তাঁর এই সব কর্মকে কর্ম বলে মনে করা হয় না (গীতা ১৮।১৭ দ্রষ্টব্য)।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে তৃতীয় পক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গীতার সন্ন্যাস, সন্ন্যাস আশ্রম নয়, কিন্তু সমস্ত কর্মে কর্তৃত্ব অভিমান রহিত হয়ে এক সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতে ঐক্যভাবে নিত্য অবস্থিত থাকা হয়ে থাকে। সেইজন্য সেটি সর্ব বর্ণ ও আশ্রমের দ্বারা করা সম্ভব। এরই নাম

জ্ঞানযোগ। একে সাংখ্যযোগও বলা হয় এবং এই হল গীতায় কথিত সন্ন্যাস।

এইসঙ্গে এটিও ঠিক যে গীতায় কর্মযোগ নামে একটি অন্য পৃথক সাধনেরও বিস্তারিত বর্ণনা আছে, যাতে সাধক ফল ও আসক্তি ত্যাগ করে ভগবৎ-নির্দেশানুসারে শুধু সমত্ব-বুদ্ধিদ্বারা ভগবানের নিমিত্ত কর্ম করেন। গীতায় এই কর্মযোগ সমত্বযোগ, বুদ্ধিযোগ, কর্মযোগ, তদর্থকর্ম, মদর্থকর্ম, মৎকর্ম ইত্যাদি নামেও বর্ণিত হয়েছে। এই নিষ্কাম কর্মযোগেও ভক্তিপ্রধান কর্মযোগই প্রধন এবং এর দ্বারাই সাধক শীঘ্র মুক্তি প্রাপ্ত করেন (৬।৪৭)।

এইভাবে দুই নিষ্ঠারই সিদ্ধি হয়। এতে কেউ যেন না মনে করে যে আমি শাস্ত্রোক্ত সন্ন্যাস-আশ্রমের বিরোধিতা করছি অথবা সন্ন্যাস-আশ্রমে স্থিত ব্যক্তির সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি মানি না ; আমার মনে হয় যে গীতার সন্ন্যাস কোনো আশ্রম বিশেষে লক্ষ্য না রেখে কেবল জ্ঞানের ওপরই নির্ভরশীল, সুতরাং সবারই গীতার ওপর অধিকার আছে।

এবং আমি এও মনে করি যে সাংখ্য-নিষ্ঠার সাধকদের সন্ন্যাস-আশ্রমে বেশি সুবিধা হয়ে থাকে।

কিছু ব্যক্তির মত হল গীতার সাংখ্য শব্দ মহর্ষি কপিল প্রণীত সাংখ্য-দর্শনের বাচক, কিন্তু চিন্তা করলে তা ঠিক বলে মনে হয় না। গীতার সাংখ্য কপিলদেবের সাংখ্যদর্শন নয়, এর সম্পর্ক জ্ঞানের সঙ্গে। গীতা ১৩।১৯-২০ তে প্রকৃতি-পুরুষ উল্লিখিত আছে, যা সাংখ্য-দর্শনের এক প্রকারের মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে তা নয়।

সাংখ্যদর্শনে পুরুষ অনেক এবং তাঁদের অস্তিত্ব পৃথক-পৃথক মানা হয়, কিন্তু গীতায় এক পুরুষেরই অনেক রূপ মানা হয় (গীতা ১৩।২২, ১৮।২০ দ্রষ্টব্য)। গীতা অনুসারে প্রাণীদের যে বিভিন্ন ভাব, তা একই পুরুষের ভাব। সাংখ্যদর্শন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে স্বীকার করেন না, কিন্তু গীতা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যে, গীতার সাংখ্য কপিলদেবের সাংখ্য থেকে ভিন্ন।

আর একটি কথাও আছে। গীতার ধ্যানযোগ দুই নিষ্ঠাতেই থাকে। তাই ভগবান ধ্যানযোগকে পৃথক নিষ্ঠারূপে বলেননি। ধ্যানযোগ নিষ্কাম কর্মের সঙ্গে

ভেদরূপে থাকে এবং সাংখ্যযোগের সঙ্গে অভেদরূপে থাকে। সাংখ্যযোগ তো নিরন্তর সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার অনন্যভাবে ধ্যান না করলে সিদ্ধ হয় না।

এই দুই নিষ্ঠা ব্যতীত শুধু ধ্যানযোগের দ্বারাও পরমপদ প্রাপ্তি লাভ করা সম্ভব।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে॥

(গীতা ১৩।২৪)

(এতদ্ব্যতীত ৯।৪-৫, ৬ ; ১২।৮ দ্রষ্টব্য)

কিন্তু এই নিষ্ঠাকে পৃথক ভাবা যায় ; কারণ অভেদরূপের ধ্যান সাংখ্যযোগ ও ভেদরূপের ধ্যান কর্মযোগবিষয়ক বলে মনে করা হয়। ধ্যানযোগের সাধনা পৃথকরূপে জানবার তাৎপর্য হল এটি কর্ম বা কর্ম ত্যাগের অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু উভয়ের সহায়ক হতে পারে। কর্মের আশ্রয় বা ত্যাগ না করেও শুধু ধ্যানযোগের সাহায্যেও মুক্তি হতে পারে।

এই সাধনা পরম উপযোগী এবং পৃথক হয়েও নিষ্ঠারূপে পৃথক মানা হয়নি। তাই সাধকের উচিত তাঁর নিজ অধিকারানুসারে ধ্যানযোগসহ উভয় নিষ্ঠার মধ্যে কোনো একটি সাধন অবলম্বন করে ভগবদপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করা।

~~○~~

(২৫) গীতায় কথিত নিষ্কাম কর্মযোগের স্বরূপ

গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ ভক্তিমিশ্রিত নাকি ভক্তিরহিত ? যদি ভক্তিমিশ্রত হয়, তবে তার স্বরূপ কেমন ?

এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে কর্মের বিভিন্ন স্বরূপের ওপর কিছু চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কর্ম কয়েক প্রকারের হয়, যেগুলি আমরা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করতে পারি। নিষিদ্ধকর্ম, কাম্য এবং কর্তব্য কর্ম।

চুরি, ব্যভিচার, হিংসা, অসত্য, কপট, ছল, জবরদস্তি, অভক্ষ্যভোজন এবং প্রমাদ ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ কর্ম বলা হয়।

স্ত্রী, পুত্র, ধন ইত্যাদি প্রিয় বস্তু প্রাপ্তির জন্য এবং রোগ সঙ্কট ইত্যাদি নিবৃত্তির জন্য যে কর্ম করা হয়, তাকে বলা হয় কাম্য কর্ম।

ঈশ্বর-ভক্তি, দেবতাদের পূজা, যজ্ঞ, দান, তপ, মাতা-পিতা-গুরুজনদের সেবা, বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম এবং শরীর-সম্বন্ধীয় খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি কর্মকে বলা হয় কর্তব্যকর্ম।

'কর্তব্যকর্ম' কামনাযুক্ত হলেও কাম্যকর্মের অন্তর্গত বলে মনে করা হয়, কিন্তু তার মধ্যে বর্ণাশ্রমের স্বাভাবিক ধর্ম এবং জীবিকার কর্মও সম্মিলিত থাকে, তাই সেগুলি পালন করার জন্য মানুষের ওপর বিশেষ দায়িত্ব থাকে। কোনো বিশেষ বস্তু প্রাপ্তি র জন্য শাস্ত্রোক্ত কর্ম করা বা না করা নিজের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে, তাই তার পৃথক পৃথক ভাগ আছে।

এই তিন প্রকার কর্মের মধ্যে নিষিদ্ধ কর্ম সকলের জন্যই সর্বতোভাবে ত্যজনীয়। মোক্ষ আকাঙ্ক্ষাকারীদের জন্য কর্তব্যকর্মের কোনো প্রয়োজন নেই। বাকী রইল 'কর্তব্যকর্ম' যা ভাবের ভিন্নতায় সকাম ও নিষ্কাম দুই-ই হয়ে থাকে। যখন—

সকাম কর্ম

সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা যখন হয়, তখন থেকে শুরু করে কর্মের সমাপ্তির পর মনে সর্বদা শুধু ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে। এরূপ করে সংলগ্ন ব্যক্তির চিত্তবৃত্তি পদে পদে নিজের লক্ষ্যফলের ওপরেই থাকে। যদি অর্থের জন্ম কর্ম করা হয়, তাহলে প্রতিক্ষণ তাঁর অর্থের স্মৃতি হতে থাকে। তাঁর চিত্ত ধনাকার হয়ে থাকে। কর্ম সিদ্ধিতে যখন তাঁর অর্থ প্রাপ্তি হয়, তখন তিনি আনন্দিত হন, আর অসিদ্ধিতে অর্থাৎ যখন অর্থপ্রাপ্তি হয় না বা বাধা আসে, তখন তাঁর অত্যন্ত কষ্ট হয়। তাঁর চিত্ত ফলাকাঙ্ক্ষী হওয়ায় তিনি সর্বদা ব্যথিত ও অশান্ত থাকেন। এরূপ বিষয়াসক্ত ব্যক্তির চিত্ত কোনো কোনো সময়ে তাঁকে নিষিদ্ধ কর্মে প্রবৃত্ত করতে পারে। যদিও শাস্ত্র-নির্দেশানুসারে কর্ম আচরণকারী সকামী ব্যক্তি নিষিদ্ধ কর্মের আচরণ করতে চান না ; তবুও বিষয় লোভ থাকায়

তাঁর পতন হবার সম্ভাবনা থেকেই যায়। কখনও কোনো কর্মে যদি ভুল হয়ে যায়, তাহলে সাফল্য তো হয়ই না ; পরিবর্তে প্রায়শ্চিত্ত বা দুঃখের ভাগী হতে হয়। কিন্তু—

নিষ্কাম কর্ম

নিষ্কাম কর্ম আচরণকারী ব্যক্তির স্থিতি সকামী ব্যক্তির থেকে অত্যন্ত বিশিষ্ট হয়। তাঁর মনে কোনোপ্রকার সাংসারিক কামনা থাকে না, তিনি যে কর্ম করেন, সেসব ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে আসক্তিরহিত হয়ে করেন। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে 'তাঁর যদি ফলের ইচ্ছা না থাকে, তাহলে কর্ম করেনই বা কেন ? জগতে সাধারণ মানুষ কোনো কারণ ব্যতীত কর্ম করতেই পারেন না এবং কোনো-না কোনো ফলের লক্ষ্য থাকেই। এমতাবস্থায় ফলাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত কর্ম হওয়া সিদ্ধ হয় না।' একথা ঠিক। সাধারণ মানুষের কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য কোনো হেতু থাকা অনিবার্য, কিন্তু হেতুর স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন হয়। সকামভাবে কর্ম করা ব্যক্তি বিভিন্ন ফলের কামনা নানাপ্রকার কর্ম করে, তার কর্মের হেতু হল 'বিষয়-কামনা'। তাই তিনি আসক্ত হয়ে কর্ম করেন, তাঁর বুদ্ধি কামনায় আবৃত থাকে (গীতা ২।৪২, ৪৩, ৪৪ ; ৯।২০, ২১ দ্রষ্টব্য)। তাই তিনি কর্মের সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সুখী-দুঃখী হন। কিন্তু নিষ্কামভাবে কর্মকারী পুরুষের কর্মের হেতু হল একমাত্র 'পরমাত্মাপ্রাপ্তি'।[১] তাই তিনি নতুন উৎসাহে আলস্যরহিত হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হন, সাংসারিক কামনা না থাকায় তিনি আসক্ত হন না এবং কর্মের সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে হর্ষ বা শোকগ্রস্ত হন না। কারণ তাঁর লক্ষ্য থাকে বহু উচ্চে, তিনি কর্মের বাহ্যিক ফলের দিকে নজর দেন না ; তাঁর দৃষ্টিতে জাগতিক সব পদার্থ পরমাত্মার তুলনায় অত্যন্ত তুচ্ছ, মলিন ও ক্ষুদ্র বলে মনে হয়। তিনি সেই মহানের থেকেও মহান পরমাত্মা প্রাপ্তির শুভ আকাঙ্ক্ষায় জগতের সমস্ত পদার্থকেই তুচ্ছ বলে মনে করেন (গীতা ২।৪৯)।

---

[১]নিষ্কাম কর্মযোগীর পরমাত্মাপ্রাপ্তির কামনা পরিণামে পরম কল্যাণের হেতু হওয়ায় কামনা বলে মান্য করা হয় না। ভগবৎ প্রাপ্তির কামনাকারী পুরুষকে নিষ্কাম বলেই মনে করা হয়।

সেইজন্যই জাগতিক বিষয়রূপফলের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে তাঁর হর্ষ বা শোক হয় না। সকাম ব্যক্তির ন্যায় তাঁর দ্বারা নিষিদ্ধকর্ম সংঘটিত হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে না। নিষিদ্ধকর্মের কারণ হল 'আসক্তি বা লোভ'। নিষ্কাম পুরুষ জগতের সমস্ত পদার্থের লোভ ত্যাগ করে তার থেকে অনাসক্ত হয়ে থাকতে চান, একমাত্র পরমাত্মাই তাঁর পরম লোভের বস্তু। তাতেই তাঁর মন আসক্ত হয়ে থাকে। সুতরাং তাঁর প্রাপ্তির অনুকূল যত কার্য থাকে, অতি উৎসাহের সঙ্গে তিনি তা করে থাকে। একথা নির্বিবাদে বলা যায় যে পরমাত্মার অনুকূল সেই সমস্ত কর্মই হতে পারে যার জন্য ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন, যা শাস্ত্রসম্মত, যা কোনোভাবে কারোরও অনিষ্টকারক নয়। এরূপ কর্মে কোনোভাবেই কোনও নিষিদ্ধ কর্ম থাকতে পারে না। সেইজন্য নিষ্কাম পুরুষ সকাম পুরুষের থেকে সর্বতোভাবে বিশিষ্ট হয়ে থাকেন।

সকাম ব্যক্তি জগতের পদার্থকে রমণীয়, সুখপ্রদ, প্রীতিকর মনে করে সেগুলির প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায়, সাফল্যে সুখ, বিফলতায় দুঃখ পাবার চিন্তায় মমতাযুক্ত মনে আসক্তিসহ কাজ করেন এবং নিষ্কাম পুরুষ সব কিছু পরমাত্মার মনে করে সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমত্বভাব মনে রেখে আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে ভগবানের নির্দেশানুসারে ভগবানের জন্যই সব কর্ম করে থাকেন। সকাম ও নিষ্কাম কর্মে এই হল পার্থক্য।

গীতায় নিষ্কাম কর্মের আরম্ভ—

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯তম শ্লোক থেকে আরম্ভ হয়েছে। ১১ থেকে ৩০তম শ্লোক পর্যন্ত সাংখ্যযোগের প্রতিপাদন করার পর ৩১তম শ্লোক থেকে ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম করার জন্য অর্জুনকে উৎসাহিত করে ৩৮তম শ্লোকে ভগবান বলেছেন—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥

মোহবশতঃ পাপভয়ে ভীত অর্জুনকে সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয় এবং লাভ-ক্ষতি রূপ সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাব থাকলে কোনো পাপ না হওয়ায় বুদ্ধি (যুক্তি) সাংখ্যের সিদ্ধান্ত জানিয়ে ভগবান পরবর্তী শ্লোক থেকে নিষ্কাম

কর্মযোগের প্রতিপাদন শুরু করেছেন—

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥

(গীতা অধ্যায় ২, শ্লোক ৩৯)

'হে পার্থ! তোমাকে এই বুদ্ধি জ্ঞানযোগের বিষয়ে জানানো হল, এবার নিষ্কাম কর্মযোগের বিষয়ে তা শোনো। এরূপ বুদ্ধিযুক্ত হয়ে কর্ম করলে তুমি কর্ম-বন্ধানকে বিনাশ করতে পারবে।'

এর পরের শ্লোকে নিষ্কাম কর্মযোগের প্রশংসা করে ভগবান যৎকিঞ্চিৎ নিষ্কাম কর্মযোগরূপ ধর্ম, মহানভয় থেকে রক্ষা করে বলে জানিয়েছেন। পরবর্তী ৪৭তম শ্লোকে কর্মের অধিকার এবং ফলের অনধিকার বর্ণনা করে ৪৮তম শ্লোকে ভগবান, যে কর্ম করা হয়, তা পূর্ণ হওয়া বা না হওয়ায় এবং তার ফলে সমভাব থাকাকেই 'সমত্ব' বলে জানিয়েছেন। এই সমত্বভাব কর্মের সঙ্গে যোগ হলেই তা কর্মযোগ হয়, এই কথা বলে অর্জুনকে আসক্তি ত্যাগ করে সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে কর্ম করার নির্দেশ প্রদান করেছেন, পরে তার ফল জানিয়েছেন 'জন্ম-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অনাময় অমৃতময় পরমপদ পরমাত্মাকে লাভ করা' (গীতা ২।৫১)।

ভগবান এইভাবে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৭ থেকে ৫১তম শ্লোকে কর্মযোগের আলোচনা করেছেন, যদিও সেই আলোচনায় স্পষ্টভাবে ভক্তির নাম কোথাও উল্লিখিত হয়নি, কিন্তু তাতে কর্মযোগ যে ভক্তিবর্জিত একথা মনে করা উচিত নয়। আমার মনে হয় গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ সর্বতোভাবে ভক্তিমিশ্রিত। অবশ্য কোনো কোনো স্থানে এর ভাব প্রধানভাবে ভালোমত ব্যক্ত হয়েছে আবার কোথাও গৌণ হয়ে অব্যক্তরূপে নিহিত রয়েছে। পরমাত্মার অস্তিত্ব এবং তাঁকে প্রাপ্ত করার শুভচিন্তা সাধারণভাবে কর্মযোগের প্রত্যেক উপদেশেই বজায় থাকে। নিষ্কাম কর্মের প্রারম্ভও তখনই হতে পারে যখন সাধক নিজ মনে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার শুভ ও দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জাগতিক ভোগের প্রাপ্তি - অপ্রাপ্তি র আনন্দ-দুঃখের চিন্তা ত্যাগ করে ফলাসক্তি ত্যাগ করতে ইচ্ছুক হন।

যে কর্ম ভগবানের প্রীতি বা প্রাপ্তির জন্য করা হয় না, তাকে কর্মযোগ বলা

হয় না। কর্মযোগ নাম তখনই সার্থক হয় যখন কর্মের যোগ (সম্বন্ধ) পরমাত্মার সঙ্গে করে দেওয়া হয়। গীতায় কর্মযোগের বর্ণনাশৈলী দুই প্রকারের। কোনো কোনো শ্লোকে ভক্তি প্রধানরূপে স্পষ্টতঃ বর্ণিত এবং কোনো কোনো শ্লোকে তা রয়েছে সুপ্তরূপে।

যেখানে ভক্তির কথা প্রধানভাবে আছে সেখানে 'আমাকে অর্পণ করে', 'পরমাত্মাকে অর্পণ করে', 'আমাকে স্মরণ করে কর্ম করো', সব কিছু আমাকে অর্পণ করো, 'মদর্থ কর্ম করো', 'স্বাভাবিক কর্মদ্বারা পরমেশ্বরের পূজা করো', 'আমার আশ্রয় নিয়ে কর্ম করো', 'আমার পরায়ণ হও' ইত্যাদি বাক্য এসেছে (গীতা ৩।৩০ ; ৫।১০ ; ৮।৭ ; ৯।২৭-২৮ ; ১২।৬, ১০, ১১ ; ১৮।৪৬, ৫৬, ৫৭ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। যেখানে ভক্তির কথা সাধারণভাবে আলোচিত হয়েছে সেখানে এরূপ শব্দ পাওয়া যায় না (গীতা ২।৪৭-৪৮, ৪৯-৫০-৫১ ; ৩।৭, ১৯ ; ৪।১৪ ; ৬।১ ; ১৮।৬, ৯ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে দুই বর্ণনাতেই ভগবদ্-ভাবনা রয়েছে এবং সেইজন্য ভগবদ-নাম, ভগবৎ-শরণ এবং ভগবদর্থ ইত্যাদি ভাবের পর্যায়বাচী শব্দ যেসব শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়নি তাহলেও সেই অনুসারে আচরণ করলে জীব ভগবৎপ্রাপ্তি করতে পারেন। কারণ তাঁদের উদ্দেশ্যই হল ভগবদ্ প্রাপ্তি করা। কর্মযোগের সঙ্গে স্মরণ-কীর্তন ইত্যাদি ভক্তি সংযুক্ত হলে ভগবৎ-প্রাপ্তি যে অতি সত্বর হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং সমস্ত কর্মযোগীদের মধ্যে এরূপ যোগীই উত্তমপুরুষ বলে মনে করা হয়। ভগবান বলেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

(গীতা অধ্যায় ৬, শ্লোক ৪৭)

'সমস্ত কর্মযোগীদের মধ্যেও যে শ্রদ্ধাবান যোগী আমাতে ব্যাপৃত অন্তরাত্মার সঙ্গে আমাকে সর্বদা ভজনা করেন, তাঁকেই আমি পরম শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি।'

যিনি এই রূপ স্পষ্টভাবে ভক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হন না, তিনিও

কর্মযোগের দ্বারা ভগবদ্‌-প্রাপ্তি করেন কিন্তু তাতে অত্যন্ত বিলম্ব হয় (গীতা ৪।৩৮ ; ৬।৪৫) দ্রষ্টব্য।

গীতায় নিষ্কাম কর্মযোগের বর্ণনা 'সমত্বযোগ', 'বুদ্ধিযোগ', 'কর্মযোগ', 'তদর্থকর্ম', 'মদর্থকর্ম', 'মদর্পণ', 'মৎকর্ম' এবং সাত্ত্বিক ত্যাগ ইত্যাদি অনেক নামে বলা হয়েছে। এই সবের ফল এক হলেও এর সাধন ক্রিয়ায় পার্থক্য আছে। উদাহরণরূপে—

মদর্পণ এবং মদর্থের পার্থক্য—

—কিছু অংশে বলা হচ্ছে। মদর্পণ বা ভগবদর্পণ একই এবং মদর্থ, তদর্থ বা ভগবদর্থ এক। এরমধ্যে মদর্পণ কর্মের স্বরূপ হল, যেমন এক ব্যক্তি কোনো এক অন্য উদ্দেশ্যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছে এবং তার কাছে আগে থেকেই কিছু অর্থ সংগৃহীত আছে। সে যখনই ইচ্ছা করবে তখনই তার অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্য পরিবর্তন করতে পারে এবং সংগৃহীত অর্থ কারোকে দান করতে পারে। কর্ম আরম্ভের পরে মধ্যবর্তী সময়ে বা কর্ম পূর্ণ করার পরও দান করতে পারে। ভক্তপ্রবর শ্রীধ্রুব রাজ্যলাভের জন্য তপোরূপ কর্ম আরম্ভ করেছিলেন ; কিন্তু তারমধ্যেই তাঁর চিন্তার পরিবর্তন হয়, তাঁর সেই তপোরূপ কর্ম ভগবদর্পণ হয়ে ওঠে, যার ফলে তাঁর ভগবদ্‌-প্রাপ্তি হয়।

সেই সঙ্গে প্রারম্ভের ইচ্ছানুসারে তাঁর রাজ্যও প্রাপ্তি হয়, কিন্তু সেই রাজ্য সাধারণ মানুষের মতো বন্ধনকারী হয়নি। একে ভগবদর্পণের মহিমা বলে জানতে হবে। তাই প্রারম্ভে অন্য উদ্দেশ্য থাকলেও যে কর্ম মধ্যভাগে ও পরে ভগবানকে অর্পণ করা হয়, তা ভগবদর্পণই হয়ে ওঠে।

মদর্থ বা ভগবদর্থ কর্মে তা হয় না। তা আরম্ভেই ভগবানের জন্য করা হয়। কোনো দেবতার উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য প্রস্তুত করা, ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য আহার সংগ্রহ করা, যেমন শুরু থেকেই এক নিশ্চিত উদ্দেশ্যে করা হয়, তেমনই ভগবদর্থ কর্মকারী সাধকের প্রত্যেক কর্ম শুরু থেকেই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। অবশ্য ভগবদর্থ কর্মেরও কয়েকপ্রকার ভেদ আছে। যেমন ভগবদ্‌প্রাপ্তির প্রয়োজনে কর্ম করা, ভগবানের নির্দেশ মেনে কর্ম করা, ভগবৎ সেবা স্বরূপ কর্মে নিযুক্ত হওয়া এবং ভগবদ্‌-প্রাপ্তির

জন্য কর্মে ব্যাপৃত হওয়া ইত্যাদি।

এ হল ভক্তিপ্রধান কর্মযোগের কথা। এছাড়া সমত্বযোগ, কর্মযোগ এবং সাত্ত্বিকত্যাগ ইত্যাদি সব কম-বেশি একই অর্থ বহন করে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৭ থেকে ৫১ তম শ্লোক পর্যন্ত যাকে কর্মযোগ ইত্যাদি নামে বলা হয়েছে সেটিই অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬ এবং ৯ শ্লোকে ত্যাগের নামে বর্ণিত আছে। বাস্তবে সবকিছুতেই ফল ও আসক্তি ত্যাগের কথা বলা আছে। ভক্তিপ্রধান বা কর্মপ্রধান—দুই প্রকার বর্ণনাই হচ্ছে নিষ্কাম কর্মযোগের জন্যই। এর দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয় যে দুই প্রকার বর্ণনাই হচ্ছে নিষ্কাম কর্মযোগের জন্যই। এর দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয় যে—

'ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য করা কর্মই হল নিষ্কাম কর্মযোগ' ।

নিষ্কাম কর্মযোগীর পরমাত্মাপ্রাপ্তি র জন্য কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করে নির্জন স্থানে ভজন-ধ্যান করার প্রয়োজন থাকে না। কেউ যদি করেন তাতে কোনো আপত্তি নেই। ভজন-ধ্যান করা সর্বদাই শ্রেষ্ঠ কাজ। কিন্তু নির্জনে ভজন-ধ্যান না করেও ভগবদ্চিন্তাসহ শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম সর্বদা পালন করেও সেই সাধকের পরমাত্মার শরণ ও তাঁর কৃপায় পরমগতি লাভ হয়।

ভগবান বলেছেন—

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎ প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥
চেতসা সর্বকর্মাণি ময় সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥

(গীতা অধ্যায় ১৮, শ্লোক ৫৬-৫৭)

'আমার পরায়ণ নিষ্কাম কর্মযোগী সর্বদা সর্ব কর্ম করেও আমার কৃপায় সনাতন অবিনাশী পরমপদ প্রাপ্ত হন, তাই সর্বকর্ম মনে মনে অর্পণ করে আমার পরায়ণ হয়ে সমত্ববুদ্ধিরূপ নিষ্কাম কর্মযোগ অবলম্বন করে নিরন্তর আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করো।'

বাস্তবে কর্মের ক্রিয়া (কর্ম) মানুষকে আবদ্ধ করে না ; ফলাকাঙ্ক্ষা এবং তার আসক্তির দ্বারাই মানুষের বন্ধন হয়। ফল ও আসক্তি না থাকলে কোনো কর্মই মানুষকে আবদ্ধ করতে পারে না। ভগবান স্পষ্টই বলেছেন যে নিজ বর্ণ

ধর্ম অনুসারে কর্মে ব্যাপৃত মানুষ অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করেন, অবশ্য কর্ম করার সময় তার লক্ষ্য পরমাত্মার প্রতি থাকা উচিত।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

(গীতা অধ্যায় ১৮, শ্লোক ৪৬)

'যে পরমাত্মা হতে সর্বপ্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে এবং যে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা থেকে এই সমগ্র জগৎ জলে বরফের মতো ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, সেই পরমাত্মাকে নিজ স্বাভাবিক কর্ম দ্বারা পূজা করে মানুষ পরম সিদ্ধি লাভ করে।'

পতিব্রতা স্ত্রী যেভাবে নিজ স্বামীকে নিজের সর্বস্ব মনে করে তাঁরই চিন্তা করেন, তাঁর ইচ্ছানুসারে, তাঁরই জন্য কায়-মনো-বাক্যে (নিজ দায়িত্বের) সংসারে সমস্ত কর্ম করে পতির প্রসন্নতা প্রাপ্ত করেন, তেমনই নিষ্কাম কর্মযোগী এক পরমাত্মাকেই নিজ সর্বস্ব মনে করে তাঁরই চিন্তা করে তাঁর নির্দেশানুসারে কায়-মনো-বাক্যে সেই পরমাত্মার জন্যই নিজ কর্তব্যকর্ম করে পরমাত্মার প্রসন্নতা এবং তাঁকে প্রাপ্ত করেন।

সমগ্র জগৎ-সংসারে— সমগ্র প্রাণী জগতে— পরমাত্মা ব্যাপক রূপে আছেন, সকলকে পরমাত্মার স্বরূপ মনে করে নিজ কর্মের সাহায্যে নিষ্কাম কর্মযোগী ভক্ত ভগবানের পূজা করেন। একজন মহান সম্রাটের প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্য তাঁর সকল কর্মচারীর এক প্রকারেরই কর্ম করার প্রয়োজনীয়তা নেই। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী যার জন্য যে কাজ মহারাজ নির্দেশ করেছেন, তার সেই কাজই ভালোভাবে সম্পন্ন করে মহারাজকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা উচিত। অন্যের ভালো-মন্দ কর্মের দিকে নজর না দিয়ে নিজের কাজ প্রভুর প্রসন্নতার জন্য কুশলতার সঙ্গে করা উচিত। রাজদরবারের একজন বিদ্বান পণ্ডিত বেদগান শুনিয়ে রাজাকে যতো প্রসন্ন করতে পারেন, মহলের একজন ঝাড়ুদার, রাজার বেতনভুক কর্মচারীও ভালোভাবে তাঁর কাজ করে রাজাকে তেমনই প্রসন্ন রাখতে পারেন। কারোরই নিজ কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই ; প্রয়োজন শুধু প্রভুকে প্রসন্ন রাখা, তার জন্য স্বার্থত্যাগ করে নিজ কর্তব্য কর্ম প্রভুকে অর্পণ করতে হয়। এই হল নিজ কর্মের দ্বারা পরমাত্মার

পূজা এবং এর দ্বারাই পরমাত্মা প্রাপ্তি লাভ হয়।

নিষ্কাম কর্মযোগীর একমাত্র লক্ষ্য থাকে পরমাত্মা, যেমন ধনলোভী মানুষ তাঁর প্রত্যেক কর্মে ধনলাভের উপায় ভাবে। কীভাবে ধনলাভ করা যায় সর্বদা এই চিন্তা তাঁর মনে থাকে। যে কাজে অর্থব্যয় হয় বা অর্থ উপার্জন হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তিনি সেই কাজে ব্যাপৃত হতে চান না। তিনি শুধু সেই সব কর্মই করেন, যা অর্থপ্রাপ্তির সহায়ক হয়। তেমনই নিষ্কাম কর্মযোগও 'অষ্টপ্রহর চব্বিশ ঘণ্টা' কায়-মনো-বাক্যে সেই সব কর্মেই নিযুক্ত থাকেন যা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে। তিনি ভ্রমবশতঃ পরমাত্মার প্রাপ্তির অন্তরায়স্বরূপ চুরি-ছল-কপট-মাদকসেবন-অভক্ষ্যভোজন বা নিষিদ্ধ কর্ম করে বৃথা সময় নষ্ট করেন না। এসব কাজ করা তো দূরের কথা, এই সব কাজ তাঁকে কোনোভাবে প্ররোচিতও করে না। তিনি সর্বদা সেইসব ন্যায়সম্পন্ন ও শাস্ত্রবিহিত কর্ম করতে প্রবৃত্ত থাকেন, যা তাঁর চরম লক্ষ্য পরমাত্মপ্রাপ্তির অনুকূল ও সহায়ক। তিনি অন্যের প্ররোচনায় মান-মর্যাদাকারী কর্মের জন্য লোলুপ হয়ে থাকেন না। নিঃশব্দে, স্বাভাবিকভাবে নিজের কর্তব্য কর্ম করেন। তিনি কখনও এই কাজ ছোট-ঐ কাজ বড় বলে মনে করেন না ; কারণ তিনি জানেন পরমাত্মাকে পাওয়ার জন্য কর্মের স্বরূপ (বাহ্যরূপ) কোনো কারণ নয়, কারণ হল অন্তঃকরণের ভাব। এইভাবের জন্যই মানুষের উত্থান ও পতন হয়। তাই তিনি অন্যের দেখাদেখি অর্থাৎ নকল করে এমন কোনো কর্ম করেন না যা তাঁর পক্ষে করা অনুচিত। তিনি এ-ও দেখেন না যে আমার কর্মে এই দোষ আছে, অপরের ঐ কর্ম নির্দোষ। তিনি মনে করেন যে, অন্যের গুণযুক্ত উত্তম ধর্মের থেকে নিজগুণরহিত ধর্মই নিজের জন্য শ্রেষ্ঠ এবং আচরণযোগ্য। স্বধর্মপালনে মানুষের কোনো দোষ হয় না (গীতা ১৮।৪৭ দ্রষ্টব্য)। আজকাল এই নিষ্কাম কর্ম-রহস্য না বুঝেই মানুষ সবকিছু একাকার করার বৃথা চেষ্টা করে।

শ্রীভগবান বলেছেন—

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥

(গীতা অধ্যায় ১৮, শ্লোক ৪৮)

'কর্তব্যকর্ম দোষযুক্ত হলেও তা ত্যাগ করা উচিত নয়, কারণ ধূমে আবৃত অগ্নির ন্যায় সকল কর্ম কোনো না কোনো দোষে আবৃত।'

যে ব্যক্তি যে বর্ণে জন্মেছেন, তার স্বাভাবিক কর্মই তাঁর স্বধর্ম। ভারতবর্ষের বর্ণব্যবস্থা তার পরম আদর্শ। যাঁরা এই বর্ণব্যবস্থা অস্বীকার করেন, তাঁরা অত্যন্ত ভুল করেন। জগতে পার্থক্য তো কখনও দূর হতে পারে না, সুব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা অবশ্য সৃষ্টি করা যেতে পারে, যা আরওই দুঃখদায়ক হয়।

মানুষ যে জাতি বা সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করে, যে মাতা-পিতার রক্ত-বীর্যে তার শরীর তৈরি হয়, জন্ম থেকে তার বুদ্ধি পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত যে সংস্কারে সে লালিত-পালিত হয়, সাধারণতঃ সেই সব কর্মেই তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও উৎসাহ থাকে। তাই সেটিই তার স্বভাব বা প্রকৃতি বলে মনে করা হয়। তাইজন্য এই স্বভাব বা প্রকৃতির অনুকূল বিহিত কর্মসমূহকেই গীতায় স্বধর্ম, সহজকর্ম, স্বকর্ম, নিত্যকর্ম, স্বভাবজকর্ম ও স্বভাবনির্দিষ্ট কর্ম ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। সাধক ব্যক্তির জন্ম যদি সুব্যবস্থিত বর্ণে হয় তাহলে তাঁর নিজকর্ম বুঝে নেওয়া অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়, তা না হলে উপরোক্ত হেতুর দ্বারা তাঁর প্রকৃতি অনুসারে স্বধর্ম নিশ্চিত করে নিতে হয়।

এই স্বধর্ম অনুসারে আসক্তি ও স্বার্থরহিত হয়ে সমগ্র জগতে পরমাত্মা ব্যাপকভাবে বিরাজমান মনে করে, সকলের প্রতি সেবার মনোভাব নিয়ে মানুষের নিজ নিজ কর্তব্য-কর্ম করা উচিত।

মনে করুন, একজন বৈশ্য, দোকানদারী করা তাঁর কর্তব্যকর্ম। কিন্তু সেই কর্তব্যকর্মে নিষ্কাম কর্মযোগ তখনই হতে পারে যখন সেটি স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা না হয়ে শুধুমাত্র পরমাত্মার সেবার নির্মলভাবে করা হয়। দোকানের কাজ ছেড়ে তাঁর জঙ্গলে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু মনের ভাব পরিবর্তন করার। স্বার্থ ও কামনার কলঙ্ক মুছে ফেলা। যে দিন জাগতিক স্বার্থের স্থানে মনে পরমাত্মা স্থান করে নেন, সেই দিন তাঁর সকল কর্ম, যা বন্ধনের কারণ, স্বরূপতঃ তা এক মনে হলেও সেটি পরমাত্মা প্রাপ্তির কারণ হয়ে ওঠে।

পারদ ইত্যাদি পদার্থ অমৃততুল্য কাজ করতে পারে যদি তা কোনো উৎকৃষ্ট

চিকিৎসকের দ্বারা শোধন করা হয়। যে পারদের প্রয়োগে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে, তার বিষঅংশ বার করে নিলে সেটি অমৃততুল্য হয়ে ওঠে। তেমনই যে কর্মে স্বার্থ ও আসক্তি থাকে, তা বন্ধন অর্থাৎ মৃত্যুদায়ক হয়। যখন স্বার্থ ও আসক্তি ত্যাগ করে কর্মকে শুদ্ধ করে নেওয়া হয়, তখন সেই কর্ম অমৃতরূপ ধারণ করে মানুষকে পরমাত্মার অমর পদ প্রদান করে। তাই কোনো কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করার প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন শুধুমাত্র বুদ্ধিকে শুদ্ধ করা। একজন ব্যক্তি সকামভাবে যজ্ঞ, দান, তপস্যা করেন আর অন্য একজন শুধু নিজ বর্ণের কর্মভিক্ষা, যুদ্ধ, ব্যবসা বা সেবা করেন এবং সেসবই করেন পরমাত্মা সর্বত্র অধিষ্ঠিত মনে করে, সকলকে সুখী করার জন্য, সকলকে সেবা করার পবিত্রভাবে, সুতরাং তাঁর কাজ যিনি সকামভাবে যজ্ঞ-দান-তপস্যা করেন, তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ। কারণ তাঁর কামনা না থাকায় তিনি সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাব থাকেন এবং নিরন্তর পরমাত্মার চিন্তা ও তাঁর নির্দেশ লক্ষ্যে থাকায় তাঁর দ্বারা কোনো পাপ ও নিষিদ্ধকর্ম হওয়া সম্ভবপরই নয়।

এখানে আমার বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, যজ্ঞ-দান-তপ করা উচিত নয়, বা এসব ক্ষুদ্র সাধন। এসবই সর্বতোভাবে উত্তম সাধন এবং অন্তরের শুদ্ধিতে বা পরমাত্মা প্রাপ্তির অত্যন্ত সহায়ক, কিন্তু তা সম্ভব হয় নিষ্কামভাবে কর্ম করলেই। সুতরাং এখানে যা বলা হয়েছে, তা নিষ্কামকর্মযোগের সত্যকার মহিমা জানানোর জন্যই।

উপরোক্ত প্রকরণে এটিও প্রমাণিত যে নিষ্কাম কর্মযোগীর দ্বারা জেনে-বুঝে কোনো পাপ-কর্ম হয় না, কিন্তু যদি কখনও ভ্রমক্রমে বা অজ্ঞানতাবশতঃ কোনো পাপকাজ হয়ে যায়, তবে তা তাঁকে স্পর্শ করে না ; কারণ সেই কর্মের সঙ্গে তাঁর কোনো স্বার্থ জড়িত নেই। স্বার্থরহিত কর্মের অনুষ্ঠান কর্তাকে বন্ধন করে না (গীতা ৪।১৪ ; ৫।১০ দ্রষ্টব্য)। পক্ষান্তরে তাঁর প্রতিটি কর্ম ভগবদর্পণ হওয়ায় তিনি সর্বতোভাবে পরমাত্মার কৃপাপাত্র হয়ে থাকেন।

রাজার অনেক কর্মচারী থাকেন, যোগ্যতানুসারে তাঁরা বেতন পান। তাঁদের সকলের ওপরেই রাজার কোন-না-কোন কাজের দায়িত্ব থাকে। প্রত্যেক বেতনভুক কর্মচারী রাজার নিয়মে আবদ্ধ থাকেন। ভুলবশতঃ বা

অজ্ঞানতাবশতঃ যদি কেউ সেই নিয়ম ভঙ্গ করেন, তাহলে নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে দণ্ডভোগ করতে হয়। কিন্তু এমন এক ব্যক্তি, যিনি কোনো সময়, কোনো প্রকারে রাজ্য বা রাজার থেকে কোনো স্বার্থ সিদ্ধ না করে শুধু অহৈতুকী রাজভক্তিতে রাজসেবা করেন, রাজা তাঁর নিঃস্বার্থ সেবায় মুগ্ধ থাকেন। কোনো সময়ে তাঁর দ্বারা যদি কোনো ভুল হয়ে যায়, তবুও রাজা তাঁর ওপর রাগ করেন না। রাজা জানেন যে সেই ব্যক্তি রাজ্যের নিঃস্বার্থ সেবক, সেই সেবক যদি তাঁর ভুলের জন্য সাজা চান, তখন রাজা বলেন, 'ভাই! আমি তোমার উপকার পেয়ে অভিভূত, তোমার একটি ভুলের কী সাজা দেব ?' শুধু তাই নয় রাজা তাঁর উপকার গ্রহণ করে নিজেকে ঋণী মনে করে, সর্বভাবে তাঁর হিতসাধন করতে সচেষ্ট হন। তেমনই যে ব্যক্তি পরমাত্মার নিঃস্বার্থ সেবক, যিনি তাঁর প্রতিটি কর্ম পরমাত্মার প্রীতির জন্য তাঁর চরণে উৎসর্গ করেন, তাতে যদি কোনো ভুল হয়, তাহলে সুহৃদ্ পরমাত্মা তাতে দৃষ্টিপাত করেন না। এটি অনিয়ম নয় কিন্তু স্বার্থরহিত সেবকের জন্য এটিই নিয়ম।

এইভাবে পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য কর্তব্যকর্ম আচরণকারী সাধক অবশেষে পরমাত্মাপ্রাপ্তি করেন। কিন্তু এরূপ পরমাত্মা প্রাপ্তকারী জীবন্মুক্তের দ্বারাও লোকশিক্ষার জন্য রাজা জনকের মতো আজীবন কর্ম সম্পাদিত হতে পারে (গীতা ৩।২০ দ্রষ্টব্য)। যদিও তাঁর জন্য কোনো কর্ম বাকী থাকে না (গীতা ৩।১৭)। কিন্তু যতক্ষণ মন ও ইন্দ্রিয় জাগ্রত থাকে ততক্ষণ তাঁর কর্মত্যাগের কোনো কারণ থাকে না। কিন্তু কর্মযোগ সিদ্ধিপ্রাপ্ত জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ সাধারণ ব্যক্তির থেকে বিশিষ্ট হয় (গীতা ২।৫৫-৫৮ ; ১২।১৩-১৯ দ্রষ্টব্য)।

এরূপ ভগবদ্প্রাপ্ত মহাপুরুষের কর্ম গীতা তৃতীয় অধ্যায়ের ২৫তম শ্লোকানুসারে শুধু লোকসংগ্রহের জন্যই হয়, তাঁর কর্ম কামনা ও সঙ্কল্পশূন্য হওয়ায় স্বরূপতঃ হলেও বাস্তবে তাকে কর্ম মনে করা হয় না (গীতা ৪।১৯-২০ দ্রষ্টব্য)।

নিষ্কাম কর্মযোগের সাধক এভাবে পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য কর্মকে পরমাত্মাতে অর্পণ করায় শেষকালে পরমাত্মার কৃপায় পরমাত্মা প্রাপ্ত হন, যে

কর্মে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরমাত্মার এতো নিত্য ও অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, সেই কর্ম কদাচ ভক্তিরহিত হতে পারে না। সুতরাং গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ সর্বতোভাবে ভক্তিমিশ্রিত।

এবং

'ফল ও আসক্তি ত্যাগ করে ভগবানের নির্দেশানুসারে শুধু ভগবদর্থ সমত্ব বুদ্ধিদ্বারা শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্ম করাই হল তার স্বরূপ।'

~~○~~

(২৬) ব্যবসা-বাণিজ্যে সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা

ভারতবর্ষের ব্যবসাও ব্যবসায়ীদের এখন অত্যন্ত খারাপ অবস্থা। ব্যবসায়ের এই খারাপ অবস্থার জন্য বিদেশী শাসন হল এক বড় কারণ, কিন্তু প্রধান কারণ হল ব্যবসায়ী সমাজের নৈতিক পতন। ব্যবসায়ের উন্নতির প্রধান কারণ ভুলে গিয়ে লোকে ব্যবসাতে মিথ্যা, কপটাচার, ছল ইত্যাদিকে স্থান দিয়ে তাকে ঘৃণ্য করে তুলেছে। লোভের প্রবৃত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় যে কোনোভাবে অর্থ বৃদ্ধির চেষ্টাকেই ব্যবসার নামে মেনে নিয়েছে। অনেকেই ব্যবসায়ে ছল-কপট-মিথ্যাচার থাকা আবশ্যিক ও স্বাভাবিক বলে মনে করেন এবং তাঁরা বলে থাকেন যে এছাড়া ব্যবসা হয় না। কিন্তু বাস্তবে একথা অত্যন্ত ভুল। ছল-কপট দ্বারা আর্থিক লাভ হওয়া তো দূরের কথা বস্তুতঃ এতে ক্ষতিই হয়। ধর্মের হানি তো স্পষ্টই হয়। আজকাল ব্যবসাজগতে ইংরেজ-জাতিকে অন্যের তুলনায় বেশি বিশ্বাস করা হয়। ব্যবসায়ীরা ইংরেজদের সঙ্গে বাণিজ্য করতে ততো ভয় পান না, যতো ভয় পান নিজ জাতিদের সঙ্গে ব্যবসাতে। দেখা যায় যে এখানকার ব্যবসায়ীরা ইংরাজদের কিছু কম দামেও জিনিস বিক্রী করেন, জিনিস কেনা-বেচার সময় প্রথমে ইংরেজদেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়, তার কারণ হল যে তাঁদের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা বেশি। তাই লোকে তাঁদের ওপর বেশি নির্ভর করে। এই কথার মানে এই নয় যে সব ইংরেজ ব্যক্তিই

বিশ্বাসী এবং ভারতীয়মাত্রেই অবিশ্বাসী। এর অর্থ হল যে ব্যবসা কাজে আমাদের থেকে তাঁদের বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকটাই বেশি। সেটা অবশ্য কোনো ধর্মের দৃষ্টিতে নয়, বরং সেটি হয় ব্যবসায়ে উন্নতি এবং মিথ্যা-ঝামেলা থেকে রেহাই পাবার দৃষ্টিতে।

বিশ্বাসযোগ্য ব্যবহারের জন্য যে ইংরেজ এবং ভারতীয় কোম্পানীর ওপর লোকের বিশ্বাস থাকে, লোকেরা কিছু বেশি দাম দিয়েও তাদের বস্তু কিনতে পিছপা হয় না এবং তা যদি বাজার-দরে পাওয়া যায় তাহলে তো খোসামোদ করে তাদের মালপত্র কিনতে চায়।

ব্যবসায়ে কেনা-বেচা হয়, কেনা-বেচার নানাপ্রকার ধরন আছে, কোনো বস্তু ওজন করে বিক্রী হয়, কোনোটি মেপে আবার কোনোটি গুণতি হিসাবে। নমুনা দেখা বা দেখানোরও নানাধরণ আছে। যাঁরা অপরের জন্য বা অপর থেকে জিনিষপত্র ক্রয় বা বিক্রয় করেন তাঁদের আড়তদার বলা হয়, আর যাঁরা অন্যে থেকে অন্যকে ঠিক দামে কারও প্রতি পক্ষপাত না করে ন্যায্য দালালিতে জিনিস দেন, তাঁদের দালাল বলা হয়। এইভাবে ব্যবসা হয়ে থাকে। জিনিষপত্র কেনা-বেচায়, মাপ-জোপ বা গুণতিতে কম-বেশি দেওয়া, জিনিষ বদল করে বা একটি জিনিষে অন্য (খারাপ) বস্তু মিশিয়ে দেওয়া বা ভুল বুঝিয়ে ভালো জিনিষ নিয়ে নেওয়া, ভালো জিনিষ দেখিয়ে খারাপ জিনিষ দেওয়া, ভুল বুঝিয়ে ভালো জিনিষ নেওয়া, লাভ, আড়ত, দালালি নির্ধারণ করে বেশি নেওয়া, বা কম দেওয়া, চুরি, মিথ্যাকথা বা জোর করে কোনোভাবে অন্যের হক আত্মসাৎ করা, এসবই হল ব্যবসার দোষ। আজকাল ব্যবসাতে এইসব দোষ খুব বেশি এসে পড়েছে। কোনো দোষ-অন্যায়ের প্রতি কিছু মাত্র খেয়াল না করে যেকোনো ভাবে ধন সংগ্রহকারীকে এখন বুদ্ধিমান ও চালাক বলা হয়। সমাজে তিনিই প্রতিষ্ঠালাভ করেন। অর্থ প্রতিষ্ঠা পাওয়ায় তাঁর সমস্ত অন্যায় কাজ সমাজ ও পরিবার সহ্য করে। তাইজন্যই মিথ্যাচারের প্রবৃত্তি দিন দিন বেড়ে চলেছে। ব্যবসাতে ছল-চাতুরী করা উচিত নয় বা এছাড়াও অর্থ রোজকার করা সম্ভব, এই ধারণা প্রায় লোপ পেতে চলেছে। তাই যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেদিকেই গোলমাল চোখে পড়ে।

অধিকাংশ ভারতীয় কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায়ীদের এই ভয় থাকে যে এই তেজী বাজারে আমরা ঠিক মতো জিনিষ পাব না বা সময়মত মাল পাব না। কাপড়ের মিলে যেসব কাজের ধারা শোনা যায়, তা যদি বাস্তব সত্য হয় তাহলে আমাদের ব্যবসার জগতে ভবিষ্যতে খুবই ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। সুতো বা তুলো কিনতে আধিকারিকেরা নানা গোলমাল করে থাকেন।

তুলোর বাজারে দাম খুব ওঠা-নামা করে। তুলো কেনার সময় দাম বাড়লে এজেন্ট নিজের ভাগে তা রেখে দেন আর যদি দাম কমে যায় তাহলে নিজের ভাগে কেনা তুলো সুযোগ বুঝে মিলের নামে লিখে দেন। ওজন বাড়ানোর জন্য কাপড়ে মাড় লাগানোতে আহমেদাবাদের খুবই বদনাম রয়েছে। তুলোর দাম বাড়লে সুতো কম করা হয়। নানা বাহানা করে কন্ট্রাক্টরকে ঠিক সময়ে মাল দেওয়া হয় না। কাপড়ের লম্বা-চওড়া সাইজে কমিয়ে দেওয়া হয়। নিম্ন মানের সুতো ব্যবহার করা হয়। এইসব নানা কারণে বহু মিলের ব্যবসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। অপর পক্ষে বিলাতী বস্ত্র-ব্যবসা ভারতের জন্য মহাক্ষতিকর হলেও শর্তপালনে উদার মনোভাব ও সৎ থাকায় বহু ব্যবসায়ী তাদের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী থাকে। ভারতে মালের দাম বেশি থাকার একটি কারণ হল অত্যধিক মুনাফা লাভের মনোভাব।

শস্য ইত্যাদি খাদ্যবস্তুতে খারাপ জিনিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়। জিরে, ধনে, সরষে, তিল ইত্যাদি শস্যদ্রব্যে মাটি ইত্যাদি নানাবস্তু মেশানো হয়। কৃষকেরা তো শুধু মাটি মেশায়, কিন্তু ব্যবসায়ীরা সেই রংয়ের বস্তু কিনে তাতে মেশায়। ওজন বেশি করার জন্য বর্ষাকালে মাল ভিজে জায়গায় রাখে, ফলে অন্য কিছু পচে যায়, যাঁরা তা ব্যবহার করেন তাঁদের অসুখ হলেও তাতে ব্যবসায়ীদের কী আসে-যায়, তাদের তো অর্থ নিয়ে চিন্তা! খারাপ মালের ওপর ভালো মাল রেখে, তাই দেখিয়ে, খারাপ-ভালো মিশিয়ে বিক্রী করা হয়, ওজনেরও তেমনই অবস্থা। কেনা-বেচার বাটও দুরকম হয়।

পাটের ব্যবসাতেও চুরি কম হয় না। ওজন বৃদ্ধি করার জন্য জল মেশানো হয়। মিল থেকে মাল বার করার জন্য বাবুদের কিছু উৎকোচ দিয়ে ভালো জিনিষের বদলে খারাপ মাল সাপ্লাই করা হয়। ওজনেও চুরি করা হয়। এইভাবে

তুলোতে জল এবং ধুলো মেশানো হয়। পাটের মতো এর মধ্যেও লুকিয়ে খারাপ জিনিষ ভরে দেওয়া হয়।

কৃষকদের থেকে জিনিস কেনার সময় সবকিছুতেই দাম, ওজন, খারাপ জিনিষের পরিবর্তে ভালো জিনিষের জন্য ফাঁকি দিয়ে লুট করার চেষ্টা থাকে। বিক্রীর সময় ঠিক এর বিপরীত কাজ করার চেষ্টা থাকে।

খাদ্য-পদার্থেও বিশুদ্ধ ঘি, তেল, আটা পাওয়া মুস্কিল হয়েছে। এমন কোনো কাজ নেই যা ব্যবসায়ীরা লোভবশতঃ না করে। ঘিতে চর্বি, তেল, রেপসীড ওয়েল ইত্যাদি অন্যান্য তেল মেশানো হয়। তেলেও নানা কিছু মেশায়। সরষের সঙ্গে তিসি ইত্যাদিতো মেশায়ই, বড় বড় মিলে আবার কুসুমের বীজ মেশায়। যার ফলে বদহজম, কলেরা, কোষ্ঠ্য কাঠিন্য ইত্যাদি নানা অসুখ ছড়ায়। মানুষ কষ্ট পায়, মারাও যায়। কিন্তু লোভী ব্যবসায়ীরা তা গ্রাহ্য করে না। এই তেলের খোল গোরুকেও খাওয়ায়, যাতে গোরুর নানাপ্রকার অসুখ হয়। গোভক্ত এবং গোসেবক বলে চিহ্নিত লোকেদের এমনই সব কাজ ! এইসব মিলে যখন সরকারী আধিকারিকরা পরীক্ষার জন্য আসেন, তখন তাঁদের ভুল বুঝিয়ে বা কিছু উৎকোচ দিয়ে বিদায় করা হয়। সাইনবোর্ডে অন্য কিছু লিখে শাস্তি থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা করা হয়।

নারকেল, তিল, সরষে এইসব তেলে নানাপ্রকার বিলাতী তেল মেশানো হয়, যা খেলে নানাপ্রকার অসুখের সৃষ্টি হয়।

আজকাল দেশে দেশে যে এতো অসুখ হচ্ছে, এর প্রধান কারণ ব্যবসায়ীরা লোভবশতঃ খাদ্য-সামগ্রীতে অখাদ্য বস্তু মেশায়।

কাপড়ের ব্যবসাতেও ছোট-বড় সব জায়গাতেই চুরি হয়। মুম্বাই, কলকাতা ইত্যাদি বড় শহরের দোকানে বড় চুরি হয়। ছোট শহরের দোকানেও কিছু কম হয় না। যেখানে নির্দিষ্ট মুনাফায় মাল বিক্রীর নিয়ম আছে, সেখানে গ্রাহককে ঠকাবার জন্য মিথ্যা ভাঁওতা দিয়ে বোঝানো হয়।

সুতোর ব্যবসায়ী সুতোর বাণ্ডিলে নানা কারচুপি করে। এইসব কাজের জন্য কলকাতায় অনেক কারখানা হয়েছে যাতে খরিদ্দার ঠকানোর জন্য নানা প্রক্রিয়া করা হয়। এতে খরিদ্দার ঠকে যায়, তার খরচ বেড়ে যায়,

সুতো নষ্ট হয়ে যায়।

কোনো কোনো স্থানে চিনির এমন কারখানা আছে যাতে বিদেশী চিনিতে গুড় মিশিয়ে তার রং বদল করে বেনারসী বা দেশী চিনির নামে বিক্রী করা হয়।

আড়তদারী, দালালী, কমিশনেও নানাপ্রকার চুরি করা হয়। প্রকৃতপক্ষে আড়তদারের উচিত হল মহাজনের সঙ্গে নির্দিষ্ট করা আড়ত এক পয়সাও গোলমাল করে লুকিয়ে নেওয়াকে পাপ মনে করা। মহাজনকে জানানো হয় যে ১/২% কিংবা ৩/৪% আড়ত নেওয়া হবে কিন্তু ছল, কপট করে বেশি মাত্রায় আদায় করা হয়ে থাকে এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২%, ৩% কিংবা ৪% আদায় করেও তৃপ্তি হয় না। চট, বস্তু, মজুরি ইত্যাদির আড়ালে মহাজনের কাছ থেকে লুকিয়ে কিংবা মালের উপর অধিক মূল্য চাপিয়ে দালালী কিংবা রিবেট তাকে না দেওয়া, অথবা গোপন করে নিজের মালকে বাজার থেকে খরিদ করা হয়েছে এরূপ দেখিয়ে এবং অন্য বিভিন্ন অসৎ উপায়ে মহাজনকে ঠকানো হয়।

কমিশনের কাজেও বড় বড় চুরি হয়ে থাকে। বাজার দর পড়ে গেলে পূর্বের অধিকতর দরের বিক্রিত বস্তুকে বর্তমানের কম দরের বিক্রি বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। বাজার দর বেড়ে গেলে অন্যের সঙ্গে সাঁঠগাঠ করে বাস্তবে বিক্রি না হলেও পূর্বের তারিখে বহু মালের খরিদ দেখিয়ে বর্তমান দরে মিথ্যে বিক্রি দেখানো হয়। নির্ধারিত দরের চাইতেও বেশি বা কম দরে মাল বিক্রি করা হয়।

দালালির কাজে নিজের সামান্য মুনাফার জন্য খরিদদারের যথেষ্ট ক্ষতি করা হয়। দালালের কর্তব্য হল, যার মাল যাকে দেখানো হয়, উভয়ের প্রতিই তার যেন সমান হিতের ভাব থাকে। লোভবশে অধিক অর্থ উপার্জনের উপরে দৃষ্টি রেখে উভয়কে ভুল বুঝিয়ে খরিদদারকে দর বাড়াবার এবং বিক্রেতাকে দর কমে যাওয়ার কথা বুঝিয়ে কাজ হাসিল করা খুবই অন্যায়। সততার সঙ্গে নিজের মত স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া উচিত। উভয়পক্ষকেই নিজের স্পষ্ট ধারণা এবং বাজারের প্রকৃত পরিস্থিতি জানানো উচিত।

এ বিষয়ে আর কত বলা যাবে ! ব্যবসার নামে চুরি, ডাকাতি প্রতারণা

সবই হয়ে থাকে। ঈশ্বর, প্রারব্ধ, ন্যায়, সত্য প্রভৃতি কোনো কিছুতেই বিশ্বাস নেই। আসলে ব্যবসায়ে দক্ষতাও নেই। দক্ষ ব্যবসায়ী সৎ হয়ে থাকে, সে কাউকে বঞ্চনা করে না। সততার সঙ্গে ব্যবসা করে সে সকলের বিশ্বাস অর্জন করে, যত বিশ্বাস বাড়ে, ব্যবসায়ে ঝামেলা তত কমে আসে এবং ব্যবসাতেও ক্রমান্বয়ে উন্নতি হতে থাকে। যারা দরদাম করে বিক্রি করে, গ্রাহকদের সঙ্গে তাদের যথেষ্ট মানসিক পরিশ্রম করতে হয়। একবার বিশ্বাস জমে গেলে যে একদামে মাল বিক্রি করে, মাল বেচতে তাঁর কোনো আয়াস হয় না ; গ্রাহক গরজ করে, দাম জিজ্ঞাসা না করেই তাঁর মাল খরিদ করে থাকে, সেখানে তাদের ঠকে যাবার কোনো ভয় থাকে না। কিন্তু আজকাল তো প্রায় সকলেই দোকান খোলার সময় এরূপ প্রার্থনা করে থাকে যে, হে, ভগবান, এমন কোন খরিদদার পাঠাও যার পকেট টাকায় ভর্তি কিন্তু আক্কেল নেই। অর্থাৎ ভগবান যেন এমন গ্রাহক পাঠান যাকে আমরা ঠকাতে পারি, মূর্খতাবশে নির্বিবাদে যে আমাদের কাছে তাঁর সর্বস্ব খোয়াতে পারে। এতে প্রমাণিত হয় যে কোনও গ্রাহক নিজের বুদ্ধি এবং সাবধানতার ফলে যদি নিজেকে রক্ষা করতে না পারে তাহলে দোকানদার তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করতে সর্বদাই প্রস্তুত।

সামান্য জীবনের জন্য ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করে পাপ সংগ্রহ করা অত্যন্ত মূর্খের কাজ। লাভ তো ততটাই হবে যত হওয়ার আছে, অযথা পাপের ভাগী হতে হয়। পাপের অর্থ থাকে না, তা যেমন আসে, তেমনই চলে যায়। যেটুকু থাকার তা ঠিকই থাকে। লোকেরা মনে মনে অর্থ আসতে দেখলে মুগ্ধ হয়। পাপ থেকে অর্থ হওয়ার ধারণা অত্যন্ত ভ্রম-মূলক। এর থেকে অর্থ হয়ই না, উপরন্তু আত্মার পতন অবশ্যম্ভাবী হয়। ইহলোক-পরলোক দুইই নষ্ট হয়ে যায়। যে ব্যক্তি অন্যায় করে অর্থবান হয়ে সামান্য দানের দ্বারা ধর্মাত্মা হতে চায়, সে অত্যন্ত ভুল করে। ভগবানের কাছে এসব চালাকি চলে না, সেখানে সবই সূক্ষ্মভাবে দেখা হয়।

সুতরাং পরমাত্মাকে বিশ্বাস করে ব্যবসাতে মিথ্যাচার সর্বদা ত্যাগ করা উচিত। কোনো পদার্থে অন্য কিছু মেশানো উচিত নয়। ওজন বৃদ্ধি করার জন্য জল বা অন্য কিছু মেশানো ঠিক নয়। খাদ্য-বস্তুতে কোনো কিছু মিশিয়ে স্বাস্থ্য

বা ধর্মের হানি করা উচিত নয়। ওজন, মাপ বা গোনাতে কম বা বেশি দেওয়া - নেওয়া করা উচিত নয়। নমুনা অনুযায়ীই মাল কেনা-বেচা করা উচিত।

আড়তদারী (কমিশন) নির্ধারণ করে মহাজনের থেকে এক পয়সা বেশি নেওয়াও অত্যন্ত অন্যায়। এর থেকে দূরে থাকা উচিত। এইভাবে কমিশনের কাজে ভুল বুঝিয়ে কাজ করা উচিত নয়। দালালদেরও উচিত ঠিক দাম বলে, খরিদ্দারকে ভুল না বুঝিয়ে নিজের দালালী এবং পারিশ্রমিক গ্রহণ করা।

আমরা নিজের প্রতি যে ব্যবহার আশা করি অন্যের সঙ্গেও সেইভাবেই ব্যবহার করব। আমরা নিজেদের স্বার্থ ও হিতের জন্য যতটা খেয়াল রাখি, অপরের স্বার্থ ও হিতের জন্য ততটাই নজর রাখা উচিত। সর্বাপেক্ষা উত্তম তিনি, যিনি নিজ স্বার্থত্যাগ করে অন্যের স্বার্থের কথা চিন্তা করেন। ব্যবসায়ী হলেও এমন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সাধুই।

আজকাল ফাটকা, সাট্টাবাজীর প্রবৃত্তি দেশে অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এর জন্য জীবন, অর্থ, ধর্ম, কত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের তার বিচার করে শীঘ্রই এর রোধ করা উচিত। আগে বোম্বাইতে কোথায় বর্ষা কেমন হবে এই নিয়ে সাট্টাবাজী হত। কিন্তু এখন এটি সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। কিছুকাল আগেও ব্যবসায়ীরা এইসব লোকেদের সঙ্গে মিশতে ঘৃণাবোধ করতেন, কিন্তু এখন তেমন ব্যবসায়ী খুবই কম দেখা যায় যারা এসব না করে । যে কাজে মালের প্রকৃত লেনদেন না হয়ে শুধুমাত্র বিভিন্ন সময়ে দরের কম-বেশি দ্বারা লাভ-লোকসানের লেনদেন হয়ে থাকে তাকে সাট্টা বলে। পাট-তুলো ইত্যাদি প্রায় সর্বপ্রকার ব্যবসার বস্তুতেই সাট্টা হয়। সাট্টাবাজরা লাভেতেও সুখী হয় না, ক্ষতিতেও নয়, তাদের হৃদয় সর্বদাই অশান্ত থাকে। তাদের খরচও নানাভাবে বেড়ে যায়। এঁরা পদে পদে লাখটাকার স্বপ্ন দেখেন। সাট্টার সঙ্গী হল মিথ্যা ও কপটাচার। সাট্টাবাজদের চিরকালীন সম্মান-প্রতিপত্তি একপলেই নষ্ট হয়ে যায়। এসব কারণেই বড় শহরগুলিতে প্রতিবছরেই দুএকটি আত্মহত্যার খবর পাওয়া যায়। আত্মহত্যা করার চিন্তা তো অনেকেই করে থাকেন। এদের আত্মার সুখ পাওয়া তো দূরের কথা, তাঁরা গৃহস্থের সুখ থেকেও বঞ্চিত থাকেন। কিছু মানুষ সাট্টাতে এতোটই মগ্ন থাকেন

যে তাঁদের খাওয়া-দাওয়া, ক্ষিদে-তেষ্টার ইচ্ছাও থাকে না। অসুস্থ হয়ে যান, চিন্তায় সব গোলমাল করে ফেলেন আর ঘুমোলেই সাট্টার স্বপ্ন দেখেন। ধর্ম, দেশ, মাতা-পিতা কথা ভাবা তো দূরের কথা, নিজ স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকেও দেখার সময় পান না। গৃহে পুত্র-পরিবার অসুস্থ, জুয়াড়ী তাঁর সাট্টার খবর নিতে ব্যস্ত। এক ভদ্রলোক তাঁর নিজের দেখা ঘটনা বিবৃত করছিলেন ! দুঃখের কথা হল যে এই সাট্টাখেলাকে লোকে ব্যবসা বলে থাকে, যার সঙ্গে ঘরের, শরীরের ও জগতের কোনোই সম্পর্ক নেই। আমার মনে হয় এই একাত্মতার সামান্য অংশও যদি পরমাত্মার চিন্তায় লাগানো যায়, তবে তাতে অকল্পনীয় উন্নতি হয়। এই সাট্টার প্রবৃত্তিতে মজুরী-কর্ম নষ্ট হয়ে যায়, তার বুদ্ধি, বিদ্যা সব কিছু বরবাদ হয়ে যায়। তাই এই সাট্টা খেলা যথাসাধ্য বন্ধ করা উচিত।

সাট্টা ছাড়াও আর একপ্রকার জুয়া হল ঘোড়ার রেস, যাতে বহু ধনী-মানী-ব্যক্তি অনেক টাকা দিয়ে অংশগ্রহণ করেন। মনু মহারাজ জীবের জুয়া সবথেকে পাপকারী বলে জানিয়েছেন। সুতরাং এই সব জুয়া সর্বভাবে ত্যজনীয়। কোনো ব্যক্তি যদি লোভবশতঃ বা মনের জোর কম থাকায় জুয়া খেলা ছাড়তে না পারেন, তাহলে তিনি যেন ঘোরদৌড়ের জুয়া অন্ততঃ ত্যাগ করেন। সাট্টা-ফাটকা তে বস্তু ছাড়াই (ব্লেঙ্ক সেল) যেন কখনো না করা হয়। এভাবে যে মাল বিক্রি করে তার সঙ্গে কারবার করা উচিত নয়। যিনি জুয়া খেলা ক্ষতিকারক জেনেও তা ত্যাগ করেন না, তিনি নিজের ক্ষতি তো করেনই, অন্যেরও যথেষ্ট ক্ষতি করেন। যাঁরা জিনিষ মজুত করে দাম অত্যন্ত বাড়িয়ে বেশি দামে বিক্রী করেন, তাঁরাও খুব পাপ করেন, সুতরাং সেই কাজ করা উচিত নয়, তাতে গরীবের দীর্ঘশ্বাস ও শাপ সহ্য করতে হয়।

এমন কিছু ব্যবসা আছে, যাতে হিংসা করা হয়ে থাকে, যেমন লাক্ষা, রেশম ও চামড়া ইত্যাদি।

লাক্ষা কীট থেকে জন্মায়। গাছ থেকে লাল রংয়ের গদের মতো গাঢ় পদার্থ নির্গত হয়, তাতে দুরকম জীব থাকে। যে জীব লম্বা লম্বা কীটের মতো হয়, এগুলিকে লাক্ষার বীজ বলা হয়। এই অসংখ্য জীবদের প্রতি ঘোর ক্রূরতার প্রয়োগ করা হয়। প্রথমতঃ লাক্ষা ধোওয়ার সময় অসংখ্য প্রাণী মরে

যায়, পরে থলিতে জ্বলন্ত আগুনে তাদের তপ্ত করে চাপড়া তৈরি করা হয়। তপ্ত করার সময় তাতে চটপট করে শব্দ হয় ও দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, জল দূষিত হয়, রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এসকল কাজ বেশিরভাগ করেন বৈশ্য জাতি।[১]

রেশম তৈরি করতেও এইরূপ খুব নৃশংস কাজ করা হয়। রেশমসহ কীটদের গরম জলে ফেলা হয়, কীটগুলি ঝলসে যায়, পরে তাদের থেকে রেশম তোলা হয়।

চামড়ার জন্য যে কত গো হত্যা করা হয়, তার হিসাব নেই। সুতরাং লাক্ষা, রেশম ও চামড়ার ব্যবসা ও ব্যবহার প্রত্যেক ধর্মপ্রেমিক ব্যক্তির ত্যাগ করা উচিত।

কিছু ব্যক্তি সুদের ব্যবসা করেন। যদিও সুদের পেশা নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু ব্যবসার সঙ্গে টাকার সুদ উপার্জন উত্তম। ব্যবসায় লগ্নি থেকে সুদে টাকা উপার্জনকারী ব্যক্তি কখনও অকর্মণ্য, অলস বা কৃপণ হন না। তারমধ্যে ব্যবসা করার যোগ্যতা তৈরি হয়। ছেলে-মেয়েরা কাজ শেখে। কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাই শুধুমাত্র সুদকেই পেশা করা উচিত নয়, কিন্তু যদি কেউ তা না করতে পারেন, তাহলে লোভ-পরবশ হয়ে গরীবকে ঠকানো ছেড়ে দেওয়া উচিত। সুদের কারবারীরা গরীবদের ওপর অত্যন্ত অত্যাচার করেন। কম টাকায় অনেক দস্তাবেজ লেখান। সামান্য কারণে তাদের বিরক্ত করেন। সুদে ঋণ নেওয়া ব্যক্তিদের সমস্ত রোজগার সুদ মেটাতেই চলে যায়। শুধু রোজগারের টাকাই নয়, পত্নীর গহনা, পশু, ধন-সম্পদ, ঘর-দ্বার সবই সেই সুদ মেটাতে চলে যায়। সুদের কারবারীরা নির্দয়ভাবে তাদের বাড়ি-জমি নিলাম করে গরীব

---

[১]অত্যন্ত দুঃখের কথা যে মাড়য়ারী সমাজে লাক্ষার চুড়ি সোহাগের চিহ্ন মনে করে নারীরা পরেন, এই চুড়ি মুসলমান কারীগর তৈরী করেন। অনেক দাম নেন। যে লাক্ষায় এতো হিংসা করা হয়, যা এতো অপবিত্র, সেই চুড়ি অবশ্যই ত্যাগ করা উচিত। এর পরিবর্তে কাঁচের চুড়ি প্রচার করার চেষ্টা করা উচিত। কলকাতায় গোবিন্দ ভবন কার্যালয়, ১৫১ মহাত্মা গান্ধী রোড, এখানে চিঠি লিখলে কাঁচের মজবুত সস্তা লাক্ষার মতো পাত লাগানো চুড়ি পাওয়া যায়। প্রত্যেক ধর্মপ্রেমিক ব্যক্তির এর প্রচার করা উচিত।—সম্পাদক

ব্যক্তির স্ত্রী-পুত্রকে রাস্তার ভিখারী করে দেন। লোভের জন্যই এই সব পাপ হয়। এই পাপের অধিক বৃদ্ধি প্রায়শঃ সুদের কারবারীদের অতি লোভের জন্যই হয়। তাই সুদের কারবারীদের লোভবশতঃ এই অন্যায় কাজ করা উচিত নয়।

বিদেশী বস্ত্র ও বিদেশী বস্তুর ব্যবসায় যথাসাধ্য ত্যাগ করা উচিত।

সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ কথা হল যে, মিথ্যা, কপটাচার, ছল ইত্যাদি পরিত্যাগ করে, অন্যের কোনোপ্রকার ক্ষতি না করে ন্যায় ও সততার সঙ্গে ব্যবসা করা উচিত। এভাবে ব্যবসায়-শুদ্ধির কথা সংক্ষেপে জানানো হল। এই কাজ অবশ্যই করা কর্তব্য। আর যদি বর্ণ ধর্ম মেনে নিষ্কামভাবে কাজের দ্বারা পরমাত্মার পূজা করা যায়, তবে তার সাহায্যে পরমপদ প্রাপ্তি করা সম্ভব।

~~O~~

(২৭) ব্যবসায় দ্বারা মুক্তি

অসত্য, কপটতা, লোভ ইত্যাদি ত্যাগ করে যদি ভগবানের প্রীতির জন্য ন্যায় সংবলিত ব্যবসা করা যায় তাহলে সেটি মুক্তির সাধন হতে পারে। মুক্তির প্রধান কারণ হল ভাব, ক্রিয়া নয়। শাস্ত্রবিধি অনুসারে সকামভাবে যজ্ঞ-দান-তপস্যা ইত্যাদি উত্তম কর্মকারী মুক্তিপ্রাপ্ত করেন না। সকাম বুদ্ধির জন্য তিনি হয় সেই সিদ্ধিলাভ করেন, যার জন্য তিনি এই সৎকার্য করেছেন অথবা নির্দিষ্ট কালের জন্য স্বর্গলাভ করেন। অপরপক্ষে নিষ্কামভাবে করা সামান্য কর্মও মুক্তির হেতু হতে পারে। তাই সকাম যজ্ঞ কর্ম করা অনেক ভালো এবং তারজন্য উৎসাহিত করা উচিত। কিন্তু যতক্ষণ সকাম ভাব থাকে, এই কর্ম স্ত্রী-পুত্র, মান-মর্যাদা, স্বর্গের অতিরিক্ত পরমপদ প্রাপ্ত করতে সমর্থ নয়। তাই গীতায় ভগবান সকাম কর্মকে নিষ্কামের থেকে নিম্ন শ্রেণীর বলে জানিয়েছেন। (গীতা অধ্যায় ২।৪২, ৪৩, ৪৪ ; ৭।২০, ২১, ২২ ; ৯।২০, ২১ দ্রষ্টব্য)। অপরপক্ষে নিষ্কাম কর্মের প্রশংসা করে ভগবান বলেছেন—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥

(গীতা অধ্যায় ২, শ্লোক ৪০)

'এই নিষ্কাম কর্মযোগে আরম্ভের অর্থাৎ বীজের বিনাশ নেই এবং বিপরীত ফলরূপ দোষও হয় না। তাই এই নিষ্কাম কর্মযোগরূপ ধর্মের সামান্য সাধন জন্ম-মৃত্যুরূপ মহাভয় থেকে উদ্ধার করায়।' তাই মুক্তিকামী ব্যক্তিদের নিষ্কাম কর্মের আচরণ করা উচিত। মুক্তির জন্য প্রয়োজন জ্ঞানের, অন্য কোনো বাহ্য উপকরণের নয়। এতেই সকলে মুক্তির অধিকার লাভ করে। ব্যবসাকারীদের ব্যবসা ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। তাঁরা ইচ্ছা করলে ব্যবসাকেই মুক্তির সাধন করতে পারেন। ভগবান বর্ণ-ধর্মের বর্ণনা করে বলেছেন—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

(গীতা অধ্যায় ১৮, শ্লোক ৪৬)

'যে পরমাত্মা থেকে সর্বভূতের উৎপত্তি, যাঁর থেকে এই সমগ্র জগৎ (জলের দ্বারা বরফের ন্যায়) ব্যাপ্ত, সেই পরমেশ্বরকে নিজ স্বাভাবিক কর্মদ্বারা পূজা করে মানুষ পরম সিদ্ধিলাভ করেন।'

এই মন্ত্র অনুসারে বৈশ্য তাঁর বর্ণোচিত কর্ম-ব্যবসার সাহায্যেই ভগবানের পূজা করে পরমসিদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়। এই ভাবনাদ্বারা ব্যবসাকারীগণ সরলতা ও সুগমতার সঙ্গে সব কাজ সুচারুরূপে করেও মানব-জীবনের চরম-ধ্যেয়কে লাভ করতে সক্ষম হন। লোভ বা অর্থের আকাঙ্ক্ষায় নয়, কর্তব্য বুদ্ধি দ্বারা কাজ করা উচিত। কর্তব্যবুদ্ধির দ্বারা করা কর্মে পাপ থাকতে পারে না। লোভ এবং আসক্তিই হল পাপের কারণ। কর্তব্যবুদ্ধিতে তার স্থান নেই। কর্তব্যবুদ্ধিতে অন্তঃকরণের শুদ্ধি ও ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ হয়। শুদ্ধ অন্তঃকরণে তত্ত্বজ্ঞানের স্ফুরণ হয় এবং তার ফলে ভগবৎকৃপার দ্বারা সহজেই পরমপদ প্রাপ্তি হয়। পরমপদ প্রাপ্তির ইচ্ছা না করে শুধুমাত্র ভগবানের প্রীতির জন্য কর্ম (ব্যবসায়) যিনি করেন,

তিনি আরও উত্তম ও প্রশংসনীয়।

গীতার উপরিউক্ত মন্ত্র অনুসারে যখন এই বিবেক-বোধ জাগ্রত হয় যে সমগ্র জগৎ ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন এবং সেই ঈশ্বরই সমস্ত জগতে স্থিত। তাহলে তাঁকে কখনই বিস্মরণ করা যায় না। পরমাত্মার এই চেতন ও বিজ্ঞানস্বরূপ নিত্য জাগ্রত থাকায় মায়া বা অন্ধকারের কার্যরূপ কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ ইত্যাদি শত্রু কখনও তাঁর কাছে আসতে পারে না। আলোকিত স্থানে অন্ধকারের জায়গা কোথায় ? ব্যবসাতে মিথ্যা, ছল, কপট ইত্যাদি করার প্রবৃত্তি কাম-লোভ ইত্যাদি দোষের জন্যই হয়। যখন এইসব দোষ থাকে না তখন সবকাজ স্বতঃই পবিত্র হয়ে ওঠে। এখন বিচার্য বিষয় হল সেই কাজের দ্বারা ঈশ্বর-পূজা কীভাবে করা যায়। পূজার জন্য শুদ্ধ বস্তু চাই। পাপরহিত কর্ম তো শুদ্ধ হয়, কিন্তু লোভের পূজা কী করে হবে ? পূজা এইভাবে করবেন যে লোভের স্থানে ঈশ্বরপ্রীতির ভাবনা করা। পতিব্রতা নারীর মতো সর্বকার্য ঈশ্বরের প্রীতির জন্য, ঈশ্বরের নির্দেশানুসারে করা হোক। এরূপ ব্যবসায়-কর্মে কোনো দোষের স্থান থাকে না এবং যদি ভ্রমবশতঃ বা অজ্ঞতাজনিত কারণে দোষ হয়েও যায়, তবে তাকে দোষ মনে করা হয় না। কারণ তাতে সকাম ভাব নেই। যদি কোনো ব্যক্তি, স্বার্থ, মান-মর্যাদা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে লোকসেবা কর্মে নিযুক্ত হন এবং কখনও দেবকর্মে তাঁর কোনো ভুল হয়, তাহলেও তাঁকে কেউ দোষ দেয় না এবং তাঁর কোনো দোষও হয় না। স্বার্থত্যাগ ও নিষ্কামভাবের এই হল মহত্ত্ব। যদি কেউ বলেন যে স্বার্থব্যতীত কর্মে প্রবৃত্তিই হয় না, যখন কোনো স্বার্থ নেই তখন কেন কর্ম করবে ? তার উত্তরে বলা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে স্বার্থ খোঁজার দৃষ্টি থাকলে দেখা যাবে যে, এতেই অনেক বড় স্বার্থ লুকিয়ে আছে। অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া এবং তার থেকে পরমাত্মপ্রাপ্তি করা কী কম স্বার্থ ? এতো পরম স্বার্থ। কিন্তু এই স্বার্থবুদ্ধি যতো অধিক ত্যাগ করা যায়, ততো শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হয়। স্বার্থবুদ্ধি না থাকলে মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারে না, তাই এখানে এই স্বার্থের কথা বলা হয়েছে, নতুবা স্বার্থের জন্য কোনো কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া উত্তম বিষয় নয়।

যদি এমন আশঙ্কা থাকে যে লোভের আকাঙ্ক্ষা না থাকলে ব্যবসাতে

লোকসানই হবে, লাভ হওয়া সম্ভব নয়। তেমন হলে শুধু অর্থবান মানুষই ব্যবসা করতে পারবে, সাধারণ মানুষের দ্বারা ব্যবসা করা সম্ভব নয়। কিন্তু তা নয়। একজন বিশ্বস্ত কর্মী মালিকের নির্দেশানুসারে অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে আলস্য ত্যাগ করে কাজ করেন, মালিকের নিজের উন্নতি চাওয়া ছাড়া দোকানের কোনো কাজে তাঁর অন্য কোনো স্বার্থ থাকে না, কোথাও তাঁর কোনো স্বার্থভাব নেই। এভাবে কাজে উন্নতিতে কোথাও বাধা আসে না। এইরূপ ভক্ত তাঁর ভগবানের প্রীতিরূপ স্বার্থের আশ্রয় নিয়ে সবকিছুই ভগবানের মনে করে তাঁর নির্দেশানুসারে যদি সমস্ত কাজ করেন, তাহলে তাঁর উন্নতিতে কোনো বাধা আসতে পারে না। এবার অর্থের কথা, অর্থবান ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে পারেন, গরীব ব্যক্তি পারেন না, একথা ঠিক নয়। এর বিপরীত দৃষ্টান্তই দেখা যায়। অর্থই নিঃস্বার্থভাবের প্রতিবন্ধক হয়। যিনি সর্বতোভাবে স্বার্থবুদ্ধি মুক্ত তাঁর কথা পৃথক, নাহলে অর্থ থেকে অহঙ্কার, মমতা, লোভ ও প্রমাদ উৎপন্ন হয়ে থাকে। ন্যায়সম্মত নিঃস্বার্থ কর্মের জন্য বেশি পুঁজিরও প্রয়োজন থাকে না। বাস্তবে এতে বেশি কম অর্থের প্রশ্ন নয়, সব কিছু নির্ভর করে কর্তার বুদ্ধির ওপর। একজন অর্থবান ব্যক্তি নিঃস্বার্থ বুদ্ধি না হওয়ায় বিশাল পুঁজি নিয়োগ করেও কোনো গরীবের সেবা করেন না, কিন্তু গরীব দোকানদার, যিনি তেল, নুন ইত্যাদি বিক্রী করেন, নিঃস্বার্থবুদ্ধি হওয়ার ফলে সমাজের সেবা করতে সমর্থ হন। ধনী-ব্যবসায়ীকে নরকে যেতে হতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্র পান-সুপারী বিক্রয়কারী নিঃস্বার্থ ভক্ত গরীব জনতারূপী পরমাত্মার সেবা করে পরমপদ প্রাপ্ত করতে সক্ষম হন।

দোকানদারের এই চিন্তা থাকা উচিত যে তাঁর দোকানে যে গ্রাহকেরা আসেন, তাঁরা সাক্ষাৎ পরমাত্মার স্বরূপ। লোভী দোকানদার যেমন মিথ্যা ব্যবহারে, আদর-আপ্যায়ন করে গ্রাহককে বাজে জিনিস দিয়ে ঠকায়, তেমনই তাঁর উচিত সহজ সরল ব্যবহারে গ্রাহককে ঠিকভাবে বুঝিয়ে যাতে গ্রাহকের ভালো হয় তাই করা। লোভীর দোকানে গ্রাহক বারবার আসেন না, কারণ দোকানি তাঁকে ঠকানোই নিজ কর্তব্য মনে করেন। আজকাল এমন দোকানদারকেই চালাক ও কর্মঠ মনে করে নেওয়া হয়। তদনুরূপভাবে যদি

এরূপ চিন্তা পোষণ করা হয় যে, পরমাত্মারূপী গ্রাহক রোজ রোজ আসেন না ; আমার দ্বারা যদি তাঁর যৎকিঞ্চিৎ সেবা হয়, খুবই ভালো কথা — এরূপে পূর্ণভাবে তাঁর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে সততাপূর্বক ব্যবহার করা উচিত।

জগৎ-সংসারের সবকিছু পরমাত্মার, আমরা সব তাঁর প্রজা। পরমাত্মা যোগ্যতানুসারে সকলকে সেই ভাণ্ডারের দায়িত্ব দিয়ে তার সংরক্ষণ এবং যথাযথভাবে ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন।

সুতরাং কোনো কাজই ছোট বা বড় নয়। যাঁর অর্থ বেশি থাকে এবং কাজের ভার বেশি তিনি বড়, আর যাঁর ছোট তিনি ছোট, তেমন নয়। ছোট-বড় সকলকেই সব কিছু ছেড়ে তাঁর কাছে যেতে হবে। যিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে মালিকের কাজ করে চলে যান, তিনি সুখের সঙ্গে যান, তাঁর উন্নতি হয়। মালিকের মন পেলে মালিকের চিরকালের অংশীদারও হতে পারেন, আর যিনি বেইমানি করে মালিকের জিনিস নিজের মনে করে কর্তব্য ভুলে মিথ্যাচার করেন, তিনি দণ্ড ও অবনতির পাত্র হন।

একজন পিতার কয়েকজন পুত্র, দোকানে সকলেরই সমান ভাগ, সকলেই সব কাজ পৃথক পৃথকভাবে করেন। একজন দোকানদারী করেন, একজন টাকা-পয়সার হিসাব রাখেন, একজন ঘরের কাজ করেন, একজন টাকা আদায়ের কাজ করেন। পিতা যেমন কাজের ভাগ করেছেন, পুত্রেরা তেমনই কাজ করেন। এতে অংশের ব্যাপারে ছোট-বড় নেই। কিন্তু এঁরা যদি পৃথকভাবে কাজ না করে সকলেই এককাজ করতে চাইতেন, তাহলে সমস্ত বিষয়ই খারাপ হয়ে যেতো। তেমনই পরমপিতা পরমাত্মার সব সন্তান ভিন্ন ভিন্ন কাজ করেন। যিনি তাঁর সেবক হয়ে নিঃস্বার্থভাবে তাঁর নির্দেশানুসারে সব কাজ করেন, তিনিই তাঁর অধিক প্রিয়।

নাটকে নাটকের কর্তা যদি নিজে এক সাধারণ পরিচারকের অভিনয় করেন, তাহলে তিনি মোটেই ছোট হয়ে যান না। যাঁর জন্য যে কাজ থাকে, তাঁকে সেই কাজই করতে হয়। যাঁর কাজ সুন্দর ও স্বার্থবর্জিত হয় প্রভু তাঁর ওপরই প্রসন্ন হন।

সুতরাং প্রাণীমাত্রেরই পরমাত্মার স্বরূপ এবং তাঁকে পূজনীয় মনে করে

মিথ্যাচার ত্যাগ করে, স্বার্থবুদ্ধিরহিত হয়ে নিজ কার্যদ্বারা সর্বব্যাপী পরমাত্মার পূজা করা উচিত। মনে সর্বদা এই ভাবনা রাখা উচিত যে আমি কীভাবে আমার সম্মুখে প্রত্যক্ষরূপে পরমাত্মার সেবা বেশি করে করতে পারি ! এই চিন্তার দ্বারা ব্যবসা আপনা-আপনিই সংশোধিত হয় এবং এর সাহায্যে ব্যবসায়ী দোকানে থেকে সরলতার সঙ্গে ব্যবসা করে পরমাত্মার সেবা করে তাঁকে প্রসন্ন করতে পারেন। ব্যবসায়ী, ডাক্তার, উকিল, দালাল, জমিদার, কৃষক সকলেই নিজ নিজ জীবিকার সাহায্যে এই চিন্তা-ভাবনা রেখে পরমাত্মার সেবা করতে সক্ষম।

সমস্ত বিষয় নির্ভর করে মনোভাবনার উপর। মালিকের অর্থ ঠিক থাকুক, আগন্তুক মহাজনদের সর্বপ্রকারে সেবা হোক, এইভাবে সকলের সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। নিজ নিজ কর্ম দ্বারা গ্রাহকদের সারল্যের সঙ্গে নিঃস্বার্থভাবে সুখী করাই হল স্বকর্মের দ্বারা পরমাত্মার পূজা করা। এই পূজারূপ ভক্তিতেই পরমাত্মা প্রাপ্তি সম্ভব। এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই ভাব জাগ্রত করার জন্য ভগবানের নাম জপ করার প্রয়োজন আছে। যেমন বাঁশীর আওয়াজে সিপাহী সতর্ক থাকে, তেমনই নাম-জপের বাঁশী বাজালে মন-ইন্দ্রিয় সর্বদা সাবধানে থাকা উচিত এবং শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় ১৮।৪৬ মন্ত্র বারংবার মনন ও চিন্তা করে সেই অনুসারে নিজেকে তৈরি করার চেষ্টা করা উচিত। এরূপ হলে অনায়াসে 'ব্যবসার দ্বারা মুক্তি' হতে পারে।

~~○~~

(২৮) গীতা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

জনৈক সজ্জন ব্যক্তির প্রশ্ন হল—

প্রশ্ন—গীতা বেদকে মান্য করে কি না ? যদি মান্য করে কীভাবে ? অধ্যায় দ্বিতীয়তে শ্লোক সংখ্যা ৪২, ৪৫, ৪৬, ৫৩ তে বেদ সম্বন্ধে হেয় মনোভাব ব্যক্ত করা কারণ কী ?

উত্তর—গীতা বেদকে মান্য করে এবং অত্যন্ত উচ্চভাব পোষণ করে দ্বিতীয় অধ্যায়ের উপরোক্ত শ্লোকগুলিতে বেদের নিন্দা করা হয়নি, শুধুমাত্র ভোগ-ঐশ্বর্য বা স্বর্গাদিরূপ ক্ষণভঙ্গুর এবং বিনাশশীল ফলপ্রদানকারী সকাম কর্ম থেকে পৃথক হয়ে আত্মপরায়ণ হতে বলা হয়েছে। ভোগেই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে, তাতে যদি 'এই কর্ম করলে অধিক ধন প্রাপ্তি হবে।' 'ঐ কর্ম করলে মনবাঞ্ছিত স্ত্রী-পুত্র লাভ হবে।' 'ঐ কর্মের দ্বারা স্বর্গাদি প্রাপ্তি হবে।' ইত্যাদি সুখদায়ক কথা শোনা যায়, তাহলে অনিবার্যভাবে মন সেদিকে ন্যস্ত হবে। ভোগাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বুদ্ধি বিভ্রম হবে। বহু শাখাবিশিষ্ট বুদ্ধির সাহায্যে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি হয় না এবং তা না হলে দুঃখ থেকে চিরকালের মতো মুক্তিলাভ হয় না। তাই পরে নবম অধ্যায়ে পুনরায় বলা হয়েছে—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্দিবি দেবভোগান্॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥

(গীতা অধ্যায় ৯, শ্লোক ২০, ২১)

'তিন বেদে বিধান করা সকাম কর্মকারী, সোমরসপায়ী, পাপ থেকে পবিত্র হওয়া যে ব্যক্তি আমাকে যজ্ঞদ্বারা পূজা করে স্বর্গপ্রাপ্তি কামনা করেন, তিনি নিজ পুণ্য ফলরূপ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত করে স্বর্গে দিব্য দেবভোগ ভোগ করেন এবং সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করে পুণ্য ক্ষীণ হলে আবার মৃত্যু লোক প্রাপ্ত হন। এইভাবে (স্বর্গের সাধনরূপ) তিন বেদে (ঋক্, সাম, যজুঃ) কথিত সকাম কর্মের শরণাগত ভোগকামনা করা ব্যক্তিগণ মর্ত্যলোকে ফিরে ফিরে আসেন।'

তাৎপর্য হল যে সকাম কর্মে ব্যাপৃত পুরুষদের বারংবার জগতে আসা-যাওয়া করতে হয়, তাঁরা জন্মরূপ কর্মফলই প্রাপ্ত হন। জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে তাঁরা মুক্তি পান না। এই বিচারে একথা বলা যায় যে উল্লিখিত স্থলে বাস্তবে বেদের নিন্দা করা হয়নি। সকাম কর্ম, পরম শ্রেয়প্রাপ্তি কারক না হওয়ায় তাকে নিষ্কাম কর্ম ও নিষ্কাম উপাসনার থেকে নিম্নশ্রেণীর বলা হয়েছে। সেগুলিকে

মন্দ বলা হয়নি, একথাও কোথাও বলা হয়নি যে, বৈদিক সকামকর্মকারী পুরুষ **'মোহজালসমাবৃতাঃ'**, আসুরী সম্পত্তিপ্রাপ্ত পুরুষদের মতো **'পতন্তি নরকেঽশুচৌ'** অপবিত্র নরকে পতন হয় অথবা **'আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥'** (১৬।২০)। হে কৌন্তেয় ! এই মূঢ় ব্যক্তিগণ জন্ম-জন্মে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয়ে আমাকে প্রাপ্ত না করে তার থেকেও অতি নীচগতি প্রাপ্ত হয়। বরং বলা হয়েছে যে এই পূত পাপ (দেব-ঋণ রূপ পাপ মুক্ত হয়ে) স্বর্গপ্রাপ্তির ইচ্ছায় যজ্ঞদ্বারা ভগবৎ-পূজাকারী হওয়ায় তাঁরা স্বর্গের দিব্য ও বিশাল ভোগাদি উপভোগ করেন।

পক্ষান্তরে বেদের মহত্ত্ব প্রকটকারী নানা বচন গীতায় পাওয়া যায়—**'কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্'** (৩।১৫)। 'কর্ম বেদ থেকে এবং বেদ অক্ষর পরমাত্মা হতে উৎপন্ন বলে জানবে।' **'ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥'** (১৭।২৩)। ওঁ, তৎ, সৎ, ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নাম বলা হয়েছে, সৃষ্টির আদিতে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ ইত্যাদি তার থেকেই রচিত হয়েছিল।' এই উক্তির দ্বারা বেদের উৎপত্তির পরমাত্মা থেকেই হয়েছে বলা হয়েছে। **'এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে। কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥'** (৪।৩২)। 'এরূপ বহুপ্রকার যজ্ঞ বেদবাণীতে বলা হয়েছে, সে সবই শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াদ্বারা উৎপন্ন বলে জেনো। এইভাবে তত্ত্বতঃ জেনে নিলে নিষ্কাম কর্মযোগের সাহায্যে সংসার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করবে।' এখানে বৈদিক কর্মের তত্ত্ব জেনে তার নিষ্কাম আচরণদ্বারা সাক্ষাৎ মোক্ষ লাভের কথা বলা হয়েছে। **'যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি।'** (৮।১১)। বেদজ্ঞ ব্যক্তি যে পরমাত্মাকে অক্ষর (ওঁকার নামে) উল্লেখ করেন। এতে স্পষ্টভাবে বেদের প্রশংসা করা আছে। ঠিক এইপ্রকার বাক্যই কঠোপনিষদের নিম্নলিখিত মন্ত্রে আছে—

সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাঁ্সি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদঁ্সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥

(১।২।১৫)

'পবিত্রমোঙ্কার ঋকসাম যজুরেব চ .....' 'পবিত্র ওঁকার এবং ঋক্, সাম এবং যজুর্বেদও আমিই।' (৯।১৭) এই বাক্যদ্বারা গীতারচয়িতা ভগবান বেদকেই তাঁর স্বরূপ মেনেছেন। **'ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্'** (১৩।৪)। বিবিধ বেদমন্ত্র দ্বারা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব) বিভাগপূর্বক জানিয়ে নিজের উক্তির স্বপক্ষে বেদের প্রমাণ দিয়েছেন **'বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্‌বেদবিদেব চাহম্॥'** (১৫।১৫)। 'সমস্ত বেদ দ্বারা জানার উপযুক্ত এক আমিই এবং বেদান্তের কর্তা এবং বেদবিদও আমিই।' এই বাক্যের দ্বারা ভগবান নিজেকে বেদের দ্বারা বেদ্য এবং বেদের জ্ঞাতা বলে বেদের মহান প্রতিষ্ঠা স্পষ্ট স্বীকার করেছেন। এছাড়া এমন আরও অনেক স্থান আছে যেখানে বেদের প্রশংসা করা হয়েছে।

এর থেকে জানা যায় যে গীতা বেদকে নীচুভাবে দেখে না। গীতায় শুধু সকাম কর্মকে নিষ্কাম কর্মের থেকে নীচু বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইহলোক ও পরলোকের ভোগপদার্থ মোক্ষের থেকে সর্বদাই নিম্নশ্রেণীর। স্বয়ং বেদও এই সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন করেন। যজুর্বেদের চল্লিশতম অধ্যায়ে এর উদাহরণ আছে। কঠোপনিষদের যম-নচিকেতা-সংবাদে প্রেয়-শ্রেয়র আলোচনা করার সময় যমরাজ ভোগ-ঐশ্বর্যে অনাসক্ত হওয়ার জন্য নচিকেতার অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন (কঠ. ২।১, ২,৩)। গীতায়ও এরূপ উক্তি আছে। নিষ্কাম কর্ম, নিষ্কাম উপাসনা এবং আত্মতত্ত্বের প্রশংসা নানাস্থানে করে গীতায় প্রকারান্তরে বেদকেই সমর্থন করা হয়েছে।

প্রশ্ন—গীতায় কী বর্ণাশ্রম ধর্ম মানা হয় ? যদি মানা হয়, তাহলে কীভাবে ? আর যদি মানা না হয় তাহলে বর্ণাশ্রম-ধর্ম কেন সমর্থন করে ? যদি মানা হয় তবে সব ধর্ম ত্যাগ করে অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৬তম শ্লোকের অর্থ কী ?

উত্তর—গীতা বর্ণাশ্রমকে মানে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারবর্ণ যদি নিজ নিজ স্বাভাবিক বর্ণ-ধর্মকে স্বার্থরহিত হয়ে নিষ্কামভাবে ভগবৎ-প্রীত্যার্থে আচরণ করেন তবে তাঁদের মুক্তিলাভ হওয়া গীতা সর্বতোভাবে মেনে

নিয়েছে। গীতা অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪১ থেকে ৪৪ শ্লোক পর্যন্ত চার বর্ণের স্বাভাবিক কর্ম জানিয়ে ৪৫ থেকে ৪৬ শ্লোকে সেই স্বাভাবিক কর্মে তাঁদের পরম সিদ্ধি প্রাপ্তির কথা জানিয়েছেন এবং ৪৭ ও ৪৮ শ্লোকে বর্ণ-ধর্ম পালন করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

গীতায় জন্ম ও কর্ম দুয়েতেই বর্ণকে মানা হয়। **'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ'** (৪।১৩)। 'গুণ ও কর্মের বিভাগদ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আমার দ্বারা রচিত হয়েছে।' এই উক্তির দ্বারা মানুষের পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ গুণ-কর্মানুসারে সৃষ্ট করা প্রমাণিত হয়, জন্ম হওয়ার পরে নয়। তাই গীতা বর্ণ-ধর্মকে 'স্বভাবজ' এবং 'সহজ' (জন্মের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হওয়া) কর্ম বলেছে। পরমেশ্বরের শরণ নিয়ে যে কেউই নিজ স্বাভাবিক কর্মের সাহায্যে নিষ্কামভাবে তাঁর উপাসনা করে মুক্ত হতে পারেন। বর্ণ অনুসারে কর্মের ভেদ মানলেও মুক্তির বিষয়ে গীতায় সকলের সমান অধিকার বলা হয়েছে। গীতার ঘোষণা হল—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

(গীতা অধ্যায় ১৮, শ্লোক ৪৬)

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥

(গীতা অধ্যায় ৯, শ্লোক ৩২-৩৩)

'যে পরমাত্মা হতে সমস্ত ভূত প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে, যাঁর দ্বারা সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত, সেই পরমেশ্বরকে নিজ স্বাভাবিক কর্মদ্বারা পূজা করে মানুষ পরম সিদ্ধিলাভ করে।'

'হে অর্জুন! স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র এবং পাপযোনিসম্ভূত সকলেই আমার শরণ

গ্রহণ করে পরমগতি প্রাপ্ত হন, অতএব পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ এবং রাজর্ষি ভক্তদের তো কথাই নেই ! সুতরাং তুমি সুখরহিত এবং ক্ষণস্থায়ী এই মানবদেহ প্রাপ্ত হয়ে নিরন্তর আমারই ভজনা করো।'

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেষট্টিতম শ্লোকে **'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য'** কথাটির অর্থ হল সমস্ত ধর্ম স্বরূপতঃ (বাহ্যতঃ) ত্যাগ করা নয় ; কারণ আগে ষোড়শ অধ্যায়ের ২৩-২৪তম শ্লোকে শাস্ত্রবিধির ত্যাগ করলে সিদ্ধি, সুখ ও পরমগতি হয় না জানিয়ে শাস্ত্রবিধি দ্বারা নিত্য ধর্মপালন করা কর্তব্য বলে জানিয়েছেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৭-৪৮তম শ্লোকেও স্বধর্ম-পালনের ওপর অত্যন্ত জোর দিয়েছেন। সেখানে এরূপ প্রতিপাদন করে এইখানে সর্ব ধর্ম স্বরূপতঃ (বাহ্যতঃ) ত্যাগ করার নির্দেশ প্রদান করা সম্ভব নয়। যদি কিছুক্ষণের জন্য মেনে নেওয়াও হয় যে নিজ উক্তির বিরুদ্ধে ভগবান এখানে স্বরূপতঃ ধর্মত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন তাহলে অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৭৩তম শ্লোকে **'করিষ্যে বচনং তব'** 'আপনার আদেশানুযায়ী করব।' বলে অর্জুনের যুদ্ধরূপ বর্ণধর্মের আচরণ এর বিরুদ্ধ হয়ে যায়। ভগবান সর্বধর্ম ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন এবং অর্জুন তা মেনে নিয়ে তার বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ কীভাবে করতে পারেন ? এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে ভগবান সর্ব ধর্ম ত্যাগের নির্দেশ দেননি। এখানে **'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য'** দ্বারা তাঁর বলার অর্থ হল যে মানুষের সর্ব ধর্মের 'আশ্রয়' ত্যাগ করে শুধুমাত্র এক পরমাত্মারই আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। স্বরূপতঃ ধর্ম (কর্তব্য-কর্ম) ত্যাগের কথা নয়। বলার তাৎপর্য হল শুধু আশ্রয় (শরণ) ত্যাগেরই। এ হল বর্ণ-ধর্মের কথা। বর্ণের মতো গীতায় আশ্রম-ধর্মের স্পষ্ট ও বিস্তৃত বর্ণনা নেই। গৌণভাবে গীতায় আশ্রমকে স্বীকার করা হয়েছে **'ব্রহ্মচর্যং চরন্তি'**, **'যতয়ো বীতরাগাঃ'** (৮।১১), **'তপস্বিভ্যঃ'** (৬।৪৬), 'ব্রহ্মচর্যের আচরণ করেন' 'আসক্তিরহিত সন্ন্যাসী', 'তপস্বী থেকে' ইত্যাদি শব্দদ্বারা ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস এবং বাণপ্রস্থের নির্দেশ করা হয়েছে। গৃহস্থের বর্ণনা তো স্পষ্টভাবেই করা আছে।

প্রশ্ন—গীতা কর্মকে মানে নাকি জ্ঞানকে অথবা উভয়কেই ? যদি শুধু কর্মকে মেনে নেয় তাহলে জ্ঞান তো নিষ্ফল আর যদি জ্ঞানকে মানে তবে কর্ম নিষ্ফল হয়। যদি জ্ঞান জানানো লক্ষ্য হয় তাহলে কর্মের আগ্রহ কেন ?

উত্তর—গীতা অধিকারীর পার্থক্যে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ উভয় নিষ্ঠাকে মুক্তির দুটি স্বতন্ত্র সাধন মনে করে। দুটি নিষ্ঠার ফল একই অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্তি হলেও উভয় সাধকদের কার্যপদ্ধতি, তার ভাব ও পথ সর্বতোভাবে ভিন্ন ভিন্ন হয়। দুটি নিষ্ঠার পালন একই সময়ে একই পুরুষের দ্বারা সম্ভব হয় না।

নিষ্কাম কর্মযোগী সাধনকালে কর্ম, কর্মফল, পরমাত্মা এবং নিজেকে ভিন্ন ভিন্ন মেনে নিয়ে কর্মফল এবং আসক্তি ত্যাগ করে ঈশ্বরপরায়ণ হন, তিনি ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিদ্বারাই সমস্ত কর্ম করেন এবং জ্ঞানযোগী মায়ার গুণই গুণেতে আবর্তিত হয়, এই মনে করে দেহ-ইন্দ্রিয়দ্বারা হওয়া সমস্ত কর্মে কর্তৃত্বের অহঙ্কার না রেখে কেবল সর্বব্যাপী পরমাত্মার স্বরূপে ঐক্যভাবে স্থিত থাকেন।

দুইয়ের মধ্যে কোনো নিষ্ঠাতে স্বরূপতঃ কর্মত্যাগের প্রয়োজন নেই। দুটিতেই উপাসনার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা 'গীতোক্ত সন্ন্যাস' এবং 'গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মযোগের স্বরূপ' শীর্ষক লেখায় করা হয়েছে।[১]

প্রশ্ন—গীতা কি মূর্তিপূজাকে মানে ? যদি না মানে তাহলে নবম অধ্যায়ের ছাব্বিশতম শ্লোকের অর্থ কী ? যদি মানে তবে তা নিরাকার না সাকারের ?

উত্তর—গীতা মূর্তিপূজা মানে, নবম অধ্যায়ের ছাব্বিশ এবং চৌত্রিশতম শ্লোকে এটি প্রমাণিত হয়। এবার হল স্বরূপের কথা, গীতায় ভগবানের সাকার ও নিরাকার উভয় স্বরূপই মানা হয়।

উদাহরণের জন্য কিছু শ্লোক উদ্ধৃত করা হচ্ছে—

---

[১]'গীতোক্ত সাংখ্যযোগ' এবং 'নিষ্কাম কর্মযোগ' লেখা বর্তমান পুস্তকে অন্যত্র রয়েছে এবং তা পুস্তকাকারে আলাদাভাবে ছাপাও হয়েছে। গীতা প্রেস থেকে এই সকল পুস্তক পাওয়া যেতে পারে।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥

(গীতা ৪, শ্লোক ৬-৯)

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরমং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রয়তাত্মনঃ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥

(গীতা ৯, শ্লোক ১১, ২৬, ৩৪)

ভগবান বলেছেন—'আমি অবিনাশীস্বরূপ অজ হলেও এবং সর্ব ভূতপ্রাণীর ঈশ্বর হলেও নিজ প্রকৃতিকে অধীন করে যোগমায়ার দ্বারা প্রকাশমান হই। হে ভারত! যখন যখন ধর্মের হানি হয় এবং অধর্ম বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন তখনই আমি নিজ রূপকে প্রকটিত করি। সাধু ব্যক্তিদের উদ্ধারের জন্য এবং দুষ্কর্মকারীদের বিনাশ করার জন্য যুগে যুগে আমি প্রকটিত হই। হে অর্জুন! আমার এই জন্ম ও কর্ম দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক, যে ব্যক্তি তত্ত্বতঃ এটি জানেন, তিনি শরীর ত্যাগের পর আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত করেন।'

সম্পূর্ণ প্রাণীর মহা ঈশ্বররূপ আমার পরমভাবকে যে মূঢ় মানুষ জানেন

না, তারা শরীর ধারণকারী আমাকে, এই পরমাত্মাকে তুচ্ছ বলে মনে করেন অর্থাৎ নিজ যোগমায়ার সাহায্যে জগতের উদ্ধারের জন্য মনুষ্যরূপে বিচরণকারী আমাকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করেন। পত্র, পুষ্প, ফল, জল ইত্যাদি কোনো ভক্ত যদি আমাকে প্রেম সহকারে অর্পণ করেন, সেই শুদ্ধ-বুদ্ধি, নিষ্কাম প্রেমিক ভক্তের অর্পণ করা সেই পত্র-পুষ্পাদি আমি (সগুণ রূপে প্রকটিত হয়ে প্রেমপূর্বক) গ্রহণ করি। (তুমি) আমাতেই মনোনিবেশ করো, আমারই ভক্ত হও, আমাকেই পূজা করো, এই বাসুদেব আমাকে প্রণাম করো, এইভাবে আমার শরণ নিলে তুমি আত্মাকে আমাতে একীভাব করে আমাকেই প্রাপ্ত করবে।'

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে॥

(গীতা ১০।১২-১৩ ; ১১।১৭, ৪৬)

অর্জুন বলেছেন—'আপনি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র ; কারণ আপনাকে সমস্ত ঋষি, সনাতন দিব্য পুরুষ, দেবতাদেরও আদিদেব, অজ এবং সর্বব্যাপী বলে থাকেন ; তেমনই দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল ঋষি, মহর্ষি ব্যাস এবং আপনি নিজেও আমাকে বলেন।' 'আমি আপনাকে মুকুট পরিহিত, গদা সমন্বিত এবং চক্রযুক্ত ও সর্বদিকে প্রকাশমান তেজপুঞ্জ, প্রজ্বলিত অগ্নিও সূর্যের ন্যায় জ্যোতিযুক্ত, অতি গহন রূপে প্রকাশিত আর সর্বদিকে অপ্রমেয়রূপ ভাবে দেখছি।' 'আমি আপনাকে মুকুটধারণকারী ও

গদা-চক্র হস্তে দেখতে চাই, অতএব হে বিশ্বস্বরূপ ! হে সহস্রবাহো ! আপনি চতুর্ভুজরূপযুক্ত হোন অর্থ চতুর্ভুজ রূপ প্রদর্শন করুন।'

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

(গীতা ১২, শ্লোক ২)

ভগবান বলেছেন—'আমাতে মন একাগ্র করে যে ভক্ত নিরন্তর আমার ভজন-ধ্যানে ব্যাপৃত হয়ে পরিপূর্ণভাবে মনোনিবেশ করে শ্রদ্ধাযুক্তভাবে, এই সগুণরূপ পরমেশ্বর আমাকে ভজনা করেন, তিনি আমার ধ্যানেমগ্ন যোগীদের মধ্যে অতি উত্তম যোগী বলে বিবেচিত হন, অর্থাৎ আমি তাঁকে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ বলে মানি।'

রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় বলেছেন—

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥

(গীতা ১৮, শ্লোক ৭৭)

'হে রাজন্ ! শ্রীহরির সেই অতি অদ্ভুত রূপ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে আমি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি এবং বারংবার হর্ষান্বিত হচ্ছি।

উপরিউক্ত শ্লোক সাকার স্বরূপের প্রতিপাদক। নীচে নিরাকারের প্রতিপাদক শ্লোকের উল্লেখ করা হচ্ছে।

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥

(গীতা ৬, শ্লোক ৩১)

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

(গীতা ৭, শ্লোক ১৯)

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

(গীতা ৮, শ্লোক ২১)

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥

(গীতা ৯, শ্লোক ৪-৫)

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥

(গীতা ১২, শ্লোক ৩-৪)

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥
সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎ স্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবেমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥

(গীতা ১৩, শ্লোক ১৫, ২৭, ৩০)

ভগবান বলেছেন—

'যে ব্যক্তি একীভাবে স্থিত হয়ে সমস্ত ভূত প্রাণীতে আত্মরূপে অবস্থিত আমাকে—সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেবকে ভজনা করেন, সেই যোগী সর্ব প্রকারে ব্যবহার করেও আমাতেই প্রবৃত্ত হন। কারণ তাঁর অনুভূতিতে আমি ব্যতীত অন্য কিছুই নেই। অনেক জন্মের পরে শেষ জন্মে তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্ত জ্ঞানী, 'সব কিছুই বাসুদেব', এইভাবে আমার ভজনা করেন, সেই মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

(যাকে) অব্যক্ত অক্ষর বলা হয়, সেই অক্ষর নামক অব্যক্ত ভাবকে পরমগতি বলা হয় এবং যে সনাতন অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হলে মানুষে পুনরায় ফিরে আসে না, সেটিই আমার পরমধাম। আমি, সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ (জলেতে বরফের মতো), সমস্ত প্রাণী আমার অন্তর্গত সঙ্কল্পের আধারে স্থিত (তাই বাস্তবে) আমি তাতে স্থিত নই এবং (এই) সর্বভূত আমাতে স্থিত নয়। (কিন্তু) আমার যোগমায়া ও প্রভাবকে দেখ (যে) ভূতপ্রাণীর ধারণ-পোষণকারী এবং ভূতাদির উৎপন্নকারী আমার আত্মা (প্রকৃতপক্ষে) ভূতাদিতে অবস্থিত নয়। যে ব্যক্তি সর্বইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে মন-বুদ্ধির অতীত সর্বব্যাপী, বাক্যাতীত-স্বরূপ, সর্বদা একরসে স্থিত, নিত্য, অচল, নিরাকার, অবিনাশী সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মকে সর্বদা একীভাবে ধ্যান করতে করতে উপাসনা করেন, সেই সম্পূর্ণ প্রাণীর হিতে রত, সর্বত্র সমভাবসম্পন্ন যোগী আমাকেই প্রাপ্ত হন। (পরমাত্মা) চরাচরের সর্বপ্রাণীর অন্তর ও বাইরে পরিপূর্ণ, চর-অচররূপও তিনিই, তিনি সূক্ষ্ম হওয়ায় অবিবেজ্ঞয় এবং অত্যন্ত নিকটে ও অসীম দূরত্বেও তিনি অবস্থিত। যে ব্যক্তি বিনাশশীল সর্ব চরাচর প্রাণীর মধ্যে নাশরহিত পরমেশ্বরকে সমভাবে স্থিতরূপে দেখেন, তিনিই ঠিক দেখেন। যখন ভূতাদির নানাপ্রকার ভাবকে এক পরমাত্মার সঙ্কল্পের আধারে স্থিতরূপে দেখেন এবং সেই পরমাত্মার সঙ্কল্পদ্বারাই সমস্ত প্রাণীর বিস্তার অনুভব করেন, তখন (তিনি) সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মকে লাভ করেন।'

প্রশ্ন—গীতায় বলা হয়েছে যে শিষ্য না তৈরি করে তাকে জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া উচিত নয়। অর্জুন কি শিষ্য ছিলেন ? অর্জুনকে উপদেশ দেওয়ায় তাঁর কি জ্ঞান হয়েছিল ? তিনি কী পরমপদ লাভ করেছিলেন ?

উত্তর—গীতায় এমন কথা কোথাও বলা নেই যে শিষ্য না করলে তাকে জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া যাবে না। তবুও অর্জুন তো নিজেকে ভগবানের শিষ্যই মনে করতেন। '**শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্**' (২।৭), 'আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণাগত, আমাকে শিক্ষাপ্রদান করুন।' বলে অর্জুন শিষ্যত্ব

স্বীকার করেছিলেন এবং ভগবান তার বিরোধ না করে স্থানে স্থানে অর্জুনকে নিজ ইষ্ট, প্রিয় এবং পরম ভক্ত মেনে নিয়ে প্রকারান্তরে তাঁর শিষ্যত্ব মেনে নিয়েছিলেন। অর্জুন পরমপদ প্রাপ্ত করেছিলেন, এর উল্লেখ মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বের চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে।

প্রশ্ন—গীতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজ শ্রীমুখে বর্ণনা করেছেন নাকি (এর) রচয়িতা অন্য কোনো পুরুষ ?

উত্তর — গীতা ভগবানেরই শ্রীমুখের বচনামৃত। গীতায় যতো বাক্য **'শ্রীভগবানুবাচ'** নামে আছে, তার কিছু শ্রুতির উক্তি, যা সম্পূর্ণভাবে একই আছে যা অর্জুনকে শ্লোকরূপে বলা হয়েছিল এবং শেষ সংবাদ কথাবার্তার ভাষায় হয়েছিল, যেগুলি ভগবান শ্রীব্যাসদেব শ্লোকের রূপ প্রদান করেছেন।

~~○~~

(২৯) মৃত্যুকালীন উপচার

হিন্দু জাতির মধ্যে মৃত্যুর সময়ে গৃহের মানুষেরা তাঁর পরলোক ভালো করার জন্য এমন কিছু কাজ করে থাকেন যাতে মৃত্যুপথগামী ব্যক্তি অত্যন্ত কষ্ট পান। সুতরাং নিম্নলিখিত বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত—

১) রোগী যদি দু, তিন তলার ওপরে থাকেন, তবে এই অবস্থায় তাঁকে নীচে নামিয়ে আনার কোনো প্রয়োজন নেই।

২) খাটের ওপর শায়িত থাকলে সেখানেই রেখে দিতে হবে।

৩) যদি খাটের ওপর মারা গেলে মনে কোনো খট্‌কা থাকে এবং নীচে শোয়ানোর প্রয়োজনীয়তা থাকে তাহলে মৃত্যুর ২-৪ দিন আগে অনুমান করে নীচে বালি বিছিয়ে খাট থেকে নামিয়ে শোয়াতে হবে। বালি নরম হওয়া চাই যাতে তাঁর কষ্ট না হয়। চিকিৎসকের কাছে জিজ্ঞাসা করে ২-৪ দিন বা ২-৪

প্রহর জেনে, রোগীর লক্ষণ দেখে আন্দাজ করতে হবে। রোগী ভালো হয়ে গেলে তাকে আবার খাটে শোওয়াতে কোনো বাধা নেই। আন্দাজ করার আগে যদি তাঁর মৃত্যু হয়, তাহলেও কোনো ক্ষতি নেই, বরং মৃত্যুকালে নীচে নামিয়ে শোওয়াতে যে কষ্ট হয়, তার থেকে তিনি রক্ষা পান। রোগী নিজে যদি আগে বুঝে যান, তবে তাঁরই বলা উচিত যে আমাকে নীচে শুইয়ে দাও।

৪) সেই অবস্থায় মৃত্যুর আগে তাঁকে স্নান করাবার কোনো প্রয়োজন নেই, তাতে বৃথাই তাঁর কষ্ট বাড়ে। মল পরিষ্কারের দরকার হলে ভিজে কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

৫) এই সময়ে গঙ্গাজল, তুলসী দেওয়া খুব ভালো, কিন্তু তুলসী পাতা গিলতে কষ্ট হলে, তা পিষে গঙ্গাজল দিয়ে খাওয়াতে হবে। এক এক বারে অল্প অল্প করে দিতে হয়। দশ-পাঁচ মিনিট পর পুনরায় দেওয়া যেতে পারে। গঙ্গা জল বহুদিনের পুরনো যেন না হয়, আগে নিজে খেয়ে দেখতে হয় বিস্বাদ কিনা। যা দুর্গন্ধ হয়ে গেছে বা বিস্বাদ, তা দেওয়া উচিত নয়। টাটকা গঙ্গাজল এনে রাখতে হবে। গঙ্গাজলে শুদ্ধি-অশুদ্ধি বা স্পর্শাস্পর্শের কোনো নিয়ম নেই। রোগী মুখবন্ধ করে থাকলে তাঁকে কিছু দেওয়া উচিত নয়।

৬) রোগীর কাছে বসে সাংসারিক কান্নাকাটি করা উচিত নয় এবং সংসারের কথা তাঁকে মনে করাতে নেই। মাতা-স্ত্রী-পতি-পুত্র বা আর কারোরই তাঁর কাছে বসে নিজের দুঃখের কথা বলা বা কান্নাকাটি করা উচিত নয়। তাঁকে মনের মতো নানাভাবে কল্যাণময়ী সেবা করা উচিত।

৭) অ্যালোপেথী বা অপবিত্র বস্তুর ওষুধ দেওয়া উচিত নয়।

৮) যতক্ষণ চৈতন্য থাকে গীতা পাঠ করে তার অর্থ শোনানো উচিত। চৈতন্য না থাকলে ভগবানের নাম শোনানো উচিত তিনি যদি গীতাপাঠি না হন ভগবৎ-নাম শোনাবেন।

৯) রোগী যদি ভগবানের সাকার বা নিরাকার কোনো রূপের ভক্ত হন, তাহলে সাকাররূপের ভক্তকে ভগবানের ছবি বা মূর্তি দেখানো উচিত ও তাঁর

রূপ ও প্রভাব বর্ণনা করা উচিত। নিরাকারের ভক্তকে নিরাকার ব্রহ্মের শুদ্ধ, বোধস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, সৎ-চিৎ-ঘন-নিত্য-অজ, অবিনাশী ইত্যাদি বিশেষণের সঙ্গে আনন্দ শব্দ যোগ করে তাঁকে শোনাতে হবে।

১০) যদি কাশী বা কোনো তীর্থস্থানে নিয়ে যেতে হয়, তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। যদি তাঁর ইচ্ছা থাকে এবং সেই পর্যন্ত যাওয়ার অবস্থা থাকে, ডাক্তারের অনুমতি থাকে, অর্থের সামর্থ্য থাকে, তবেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া উচিত।

১১) প্রাণ চলে গেলেও ১৫-২০ মিনিট কাউকে খবর দেবে না। ভগবৎ-নাম কীর্তন করবে, যাতে পরিবেশ সাত্ত্বিক থাকে। কান্নাকাটি করবে না, কারণ সে-সময় কান্না প্রাণীর জন্য ভালো নয়।

১২) ঘরের ধীসম্পন্ন লোকেদের কাঁদা উচিত নয়। অন্য কারোরই রোগীর কাছে এসে সহানুভূতির কথা বলে তাঁকে কাঁদানো ঠিক নয়।

১৩) বারোদিন পর্যন্তই শোক চিহ্ন ধারণ করতে হয়।

১৪) বারো বছরের কম বয়সের বালক-বালিকার জন্য মৃত্যু শোক পালন করবে না।

১৫) মৃত্যুপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য শোকসভা না করে নিজ সাবধানতার জন্য সভা করা উচিত। একথা মনে রাখা উচিত যে এক দিন আমারও মৃত্যু হবে।

১৬) জীবন্মুক্ত ব্যক্তির জন্য শোক করবে না, তাতে তাঁকে অপমান করা হয়।

~~○~~

॥ শ্রীহরি ॥

গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেস দ্বারা এযাবৎ প্রকাশিত বাংলা বই-এর সূচীপত্র

কোড নং

(১) 1118 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (তত্ত্ব-বিবেচনী) বৃহৎ আকারে**
লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা
গীতা-বিষয়ক ২৫১৫টি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সমগ্র গীতা-গ্রন্থের বিষদ্ ব্যাখ্যা

(২) 763 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (সাধক-সঞ্জীবনী)**
লেখক—স্বামী রামসুখদাস
প্রতিটি শ্লোকের পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ ব্যাখ্যাসহ সুবৃহৎ টীকা। সাধকগণের আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশের এক অনুপম গ্রন্থ।

(৩) 1577 **শ্রীমদ্ভাগবত (প্রথম খণ্ড)**

(৪) 1744 **শ্রীমদ্ভাগবত (দ্বিতীয় খণ্ড)**

(৫) 1574 **সংক্ষিপ্ত মহাভারত (প্রথম খণ্ড)**

(৬) 1660 **সংক্ষিপ্ত মহাভারত (দ্বিতীয় খণ্ড)**

(৭) 1662 **শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত**

(৮) 556 **গীতা-দর্পণ**
লেখক—স্বামী রামসুখদাস
শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় উল্লিখিত ১০৮টি বিষয়ের সামগ্রিক দর্শন-ভিত্তিক অভিনব আলোচনা। গীতার গভীরে প্রবেশে ইচ্ছুক জিজ্ঞাসুদের পক্ষে বইটি খুবই উপযোগী।

(৯) 13 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা**
অন্বয়, পদচ্ছেদসহ প্রতিটি শ্লোকের ভাবার্থসহ সরল অনুবাদ।

(১০) 496 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা**
মূল শ্লোকসহ সরল অনুবাদ

(১১) 1736 **গীতা প্রবোধনি** (লেখক—স্বামী রামসুখদাস)

(১২) 1393 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা** (বোর্ড বাইন্ডিং)

(১৩) 1444 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা**
অতি ক্ষুদ্র আকারে সমগ্র মূল শ্লোকের অভিনব সংস্করণ।

কোড নং

(১৪) 395 গীতা-মাধুর্য

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

প্রতিটি শ্লোকের পৃষ্ঠভূমিতে প্রশ্নোত্তররূপে উপস্থাপিত এই বইটি নবীন এবং প্রবীণ সকলকেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম।

(১৫) 1851 গীতা রসামৃত

(১৬) 1901 সাধন-সমর বা দেবী মাহাত্ম্য

(১৭) 1937 শিবপুরাণ

(১৮) 1455 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (লঘু আকারে)

(১৯) 1883 শ্রীরামচরিতমানস (তুলসীদাসী রামায়ণ)

গোস্বামী তুলসীদাস বিরচিত, অখণ্ড সংস্করণ, সম্পূর্ণ নূতনরূপে অনূদিত।

(২০) 275 মানুষ কর্ম করায় স্বাধীন, নাকি পরাধীন ?

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

সাধন পথের গূঢ় তত্ত্বের সহজ আলোচনা।

(২১) 1456 ভগবৎপ্রাপ্তির পথ ও পাথেয়

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

ঈশ্বরলাভের সাধনায় রত সাধকদের পক্ষে একটি অপরিহার্য পুস্তক।

(২২) 1469 সর্বসাধনার সারকথা

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

(২৩) 1119 ঈশ্বর এবং ধর্ম কেন ?

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বইটি খুবই উপযোগী।

(২৪) 1305 প্রশ্নোত্তর মণিমালা

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক ৫০০টি প্রশ্নের মূল্যবান সমাধান সূত্র।

(২৫) 1102 অমৃত-বিন্দু

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

সূত্ররূপে উপস্থাপিত এক সহস্র অমৃত বাণীর অভূতপূর্ব সংকলন।

(২৬) 1115 তত্ত্বজ্ঞান কী করে হবে ?

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

তত্ত্বজ্ঞান লাভের একটি সরল মার্গ-দর্শিকা।

(২৭) 1925 ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও মহত্ত্ব

(২৮) 1936 ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস

কোড নং

(২৯) 1358 **কর্ম রহস্য**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

ভগবান গীতায় বলেছেন **'গহনা কর্মণো গতিঃ'**—সেই কর্ম-তত্ত্বের অনুপম বর্ণনা।

(৩০) 1122 **মুক্তিলাভের জন্য গুরুকরণ কি অপরিহার্য ?**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

গুরু বিষয়ক বিভিন্ন শঙ্কা-সমাধানের উদ্দেশ্যে লিখিত এই পুস্তিকাটি বর্তমানে প্রতিটি লোকেরই একবার অবশ্যই পড়া কর্তব্য।

(৩১) 276 **পরমার্থ পত্রাবলী**

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

সাধকগণের উদ্দেশ্যে লিখিত ৫১টি আধ্যাত্মিক পত্রের দুর্লভ সংকলন।

(৩২) 816 **কল্যাণকারী প্রবচন**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

সাধকগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ১৯টি অমূল্য প্রবচনের সংস্করণ।

(৩৩) 1460 **বিবেক চূড়ামণি** (মূলসহ সরল টীকা)

শ্রীমৎ শংকরাচার্য বিরচিত জ্ঞানমার্গের সুপরিচিত গ্রন্থ।

(৩৪) 1454 **স্তোত্ররত্নাবলী**

প্রাচীন বিভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ স্তোত্রের মূলসহ সরল অনুবাদ।

(৩৫) 1603 উপনিষদ্

(৩৬) 1604 **পাতঞ্জলযোগ**

(৩৭) 903 **সহজ সাধনা**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

সাধন পথের সহজতম দিক্-দর্শন।

(৩৮) 312 **আদর্শ নারী সুশীলা**

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে বর্ণিত ২৬টি দৈবীগুণকে কেন্দ্র করে একটি মহিলার জীবন-চরিত্র।

(৩৯) 1415 **অমৃত-বাণী**

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

(৪০) 1541 **সাধনার দুটি প্রধান সূত্র**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

(৪১) 1478 **মানব কল্যাণের শাশ্বত পথ**

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

বিভিন্ন সাধন-মার্গের নির্বাচিত ২০টি প্রবচনের এক অমূল্য সংগ্রহ।

কোড নং

(৪২) 1651 **হে মহাজীবন ! হে মহামরণ !!**
স্বামী রামসুখদাস মহারাজের স্বপ্রসঙ্গের নির্দেশাবলী।

(৪৩) 1306 **কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি**
লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

(৪৪) 955 **তাত্ত্বিক-প্রবচন**
লেখক—স্বামী রামসুখদাস

(৪৫) 428 **আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন**
লেখক— স্বামী রামসুখদাস

(৪৬) 296 **সৎসঙ্গের কয়েকটি সার কথা**

(৪৭) 1359 **পরমাত্মার স্বরূপ এবং প্রাপ্তি**

(৪৮) 1884 **ঈশ্বর লাভের বিবিধ উপায়**

(৪৯) 1303 **সাধকদের প্রতি**

(৫০) 1579 **সাধনার মনোভূমি**

(৫১) 1580 **অধ্যাত্ম সাধনায় কর্মহীনতা নয়**

(৫২) 1581 **গীতার সারাৎসার**

(৫৩) 1452 **আদর্শ গল্প সংকলন**

(৫৪) 1453 **শিক্ষামূলক কাহিনী**

(৫৫) 1513 **মূল্যবান কাহিনী**

(৫৬) 625 **দেশের বর্তমান অবস্থা এবং তার পরিণাম**

(৫৭) 956 **সাধন এবং সাধ্য**

(৫৮) 1996 **স্তুতি**

(৫৯) 1293 **আত্মোন্নতি এবং সনাতন (হিন্দু) ধর্ম রক্ষার্থে কয়েকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য**

(৬০) 450 **ঈশ্বরকে মানব কেন ? নামজপের মহিমা এবং আহার শুদ্ধি**

(৬১) 449 **দুর্গতি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং গুরুতত্ত্ব**

(৬২) 451 **মহাপাপ থেকে রক্ষা পাওয়া**

(৬৩) 443 **সন্তানের কর্তব্য**

(৬৪) 469 **মূর্তিপূজা**

(৬৫) 849 **মাতৃশক্তির চরম অপমান**

(৬৬) 1319 **কল্যাণের তিনটি সহজ পন্থা**

(৬৭) 1742 **শরণাগতি**

(৬৮) 762 **গর্ভপাতের পরিণাম ? একবার ভেবে দেখুন**

(৬৯) 1075 **ওঁ নমঃ শিবায়**

(৭০) 1043 **নবদুর্গা**

(৭১) 1096 **কানাই**

	কোড নং	
(৭২)	1097	গোপাল
(৭৩)	1098	মোহন
(৭৪)	1123	শ্রীকৃষ্ণ
(৭৫)	1292	দশাবতার
(৭৬)	1439	দশমহাবিদ্যা
(৭৭)	1652	নবগ্রহ
(৭৮)	1787	মহাবীর হনুমান
(৭৯)	1495	ছবিতে চৈতন্যলীলা
(৮০)	1888	জয় শিব শংকর
(৮১)	1889	স্বনামধন্য ঋষি-মুনি
(৮২)	1891	রামলালা
(৮৩)	1892	সীতাপতি রাম
(৮৪)	1893	রাজা রাম
(৮৫)	1977	ভগবান সূর্য
(৮৬)	330	ভক্তিসূত্র (নারদ ও শাণ্ডিল্য)
(৮৭)	1496	পরলোক ও পুনর্জন্মের সত্য ঘটনা
(৮৮)	1659	শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম
(৮৯)	1881	হনুমানচালীসা (মূলপাঠ, অর্থসহ)
(৯০)	1880	হনুমানচালীসা (মূলপাঠ)
(৯১)	1852	রামরক্ষাস্তোত্র
(৯২)	1356	সুন্দরকাণ্ড
(৯৩)	1322	শ্রীশ্রীচণ্ডী
(৯৪)	1743	শ্রীশিবচালীসা
(৯৫)	1785	ভাগবতের মণিমুক্তা
(৯৬)	1786	মূল শ্রীমদ্‌বাল্মীকীয়রামায়ণম্‌
(৯৭)	1795	মনকে বশ করার কয়েকটি উপায় ও আনন্দের তরঙ্গ
(৯৮)	1784	প্রেমভক্তিপ্রকাশ, ধ্যানাবস্থায় প্রভুর সঙ্গে বার্তালাপ
(৯৯)	1797	স্তবমালা
(১০০)	1835	সত্যনিষ্ঠ সাহসী বালক-বালিকাদের কথা
(১০১)	1834	শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (মূল) ও শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম
(১০২)	1839	কৃত্তিবাসী রামায়ণ
(১০৩)	1838	জীবন যাপনের শৈলী
(১০৪)	1853	আমাদের লক্ষ্য ও কর্তব্য
(১০৬)	1854	ভাগবত রত্নাবলী
(১০৬)	1920	আহার নিরামিষ না আমিষ ? সিদ্ধান্ত নিজেই নিন
(১০৭)	1946	রামায়ণ মহাভারতের কতিপয় আদর্শ চরিত্র
(১০৮)	1948	এর নাম কি উন্নতি, না ধ্বংস ?—একটু ভেবে দেখুন
(১০৯)	1978	ভগবানের পাঁচটি নিবাসস্থল